ওঁ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

ব্রহ্মতত্ত্ব

ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় ভাগ, ১৩০৪।

কলিকাতা

৭৩।১ বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, ব্রহ্মতত্ত্ব কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযশোদালাল চৌধুরীকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় ভাগের সূচিপত্র।

(বাঙ্গালা প্রবন্ধ।)

(ইংরেজি প্রবন্ধ।)

ব্রহ্মতত্ত্ব।

উপনিষদুক্ত সাধনতত্ত্ব।

(১)

সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশের পূর্ব্বে সাধ্য স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। উপনিষদের সাধ্য কি ? সাধ্য শ্রেয়। কঠোপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লীতে শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রভেদ স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নচিকেতা মৃত্যুর নিকট আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইলে মৃত্যু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য অনেক সুখকর দ্রব্যের প্রলোভন দেখান। নচিকেতা এই সকল প্রলোভনে বিচলিত না হইয়া আত্মজিজ্ঞাসায় অটলতা প্রদর্শন করিলেন। তদুপলক্ষে মৃত্যু বলিতেছেন,—

অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

অর্থাৎ শ্রেয় ও প্রেয় পরস্পর বিভিন্ন। এই ভিন্ন-প্রয়োজন দুই বস্তু পুরুষকে আবদ্ধ করে। যে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদিগের বিষয় সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণ) অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে।

তৎপর মৃত্যু নচিকেতাকে সুখকর কাম্যবস্তুসমূহ পরিত্যাগ করাতে অভিনন্দন করিলেন এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুটী পথ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বিদ্যাভিলাষী বলিয়া প্রশংসা করিলেন। যথা,

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোহত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতে জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ ॥

অর্থাৎ—হে নচিকেতা, তুমি রমণীয় ও আপাত-রমণীয় কাম্য বস্তুসমূহের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষ চিন্তা করিয়া তৎসমস্তকে পরিত্যাগ করিয়াছ, এবং এই বিত্তময় পথ, যাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হইতেছে, তাহা অবলম্বন কর নাই। অবিদ্যা আর বিদ্যা বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধা, ইহারা পরস্পর অতি বিপরীত এবং ভিন্নগতি। হে নচিকেতা, আমি তোমাকে বিদ্যার প্রার্থী বলিয়া মনে করি, যেহেতু তোমাকে অনেক কাম্য বস্তুও প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।

উপনিষদের মতে সাধ্য বস্তু সুখ নহে, সুখ হইতে স্পষ্টতঃ বিভিন্ন শ্রেয়ই সাধ্য, ইহা বুঝা গেল। সেই শ্রেয় যদি সুখকর বস্তু হয়,—উপনিষদের মত তাহাই,—তাহাতে উপনিষদকে সুখবাদিনী বলা যাইতে পারে না, কারণ, শ্রেয় শ্রেয় বলিয়াই ইহার অনুসরণীয়, সুখকর বলিয়া নহে। তার পর, শ্রেয় কিরূপে নির্ণীত হইবে তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া গেল, কারণ ঋষি শ্রেয়ের পথকে বিদ্যার পথ বলিতেছেন, আর কাম্য বস্তুসমূহের অনুসরণকে অবিদ্যার পথ বলিতেছেন। অর্থাৎ ঋষির অভিপ্রায় এই, জ্ঞানদ্বারা যাহা সার সত্য বস্তু বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাই অনুসরণীয়। কাম্য বস্তুসমূহ যে সত্য বা সার বস্তু নহে, তাহাও তিনি এস্থলে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এই বিষয়ে উক্ত উপনিষদ্ই অন্যত্র বলিতেছেন—

পরাচঃ কামাননুয়ন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বাধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কাম্য বস্তুর অনুসরণ করে, এই জন্যই তাহারা সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানীরা নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

এস্থলে শ্রেয় আরো কিঞ্চিৎ স্পষ্টীকৃত হইল। অস্থির অনিত্য বস্তুসমূহ শ্রেয় নহে, অমৃতত্বই শ্রেয়। মুণ্ডকোপনিষদে, যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল সুখকর ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া ঋষি এরূপ সকাম কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিন্দা করিতেছেন। যথা,

উপনিষদের সাধনপ্রণালী অপর এক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিবার অভিলাষ রহিল।

অদ্বৈতবাদ ও উপাসনা।

উপনিষদের ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদাত্মক অথচ উপাসনা-প্রতিপাদক। উপনিষদ্ এক দিকে বলিতেছেন, "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", আবার অপর দিকে বলিতেছেন "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত", "তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্" ইত্যাদি। এমন কি ভক্তিভরে পাপনাশনের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,

"যাতে রুদ্র তনূরঘোরাপাপকাশিনী।
তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥"

"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্" ইত্যাদি। আপাততঃ এই দুই শ্রেণীর শ্রুতিতে বিরোধ দৃষ্ট হয়, এবং শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদ স্ববিরোধী ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন শ্রেণীর ব্রহ্মবাদী উপাসনা ও ভক্তিধর্ম্মের বিপক্ষে বলিয়াছেন, উপাসনা ও ভক্তিকে অজ্ঞানতা-প্রসূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'যত দিন অজ্ঞানতা, ততদিনই উপাসনা, অতঃপর উপাসনা নাই, কেবল জ্ঞান'—এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে অদ্বৈতবাদও উপাসনার আপাত-বিরোধ আরও স্পষ্টতর হইয়াছে। এই বিরোধ ভঞ্জনের উপায় আছে কি না দেখা যাক্।

অদ্বৈতবাদের অর্থ যদি এই হয় যে অসীম ও সসীমে কোন প্রভেদ নাই, দেশকালগত জগৎ ও দেশকালাতীত ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই,—অজ্ঞান, দুর্ব্বল ও পাপী জীব এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, ধর্ম্মাবহ, পাপনুদ পরমেশ্বরে কোন প্রভেদ নাই,—তবে শ্রুতি অদ্বৈতবাদিনী নহেন, কারণ উল্লিখিত ভেদসমূহ শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হইয়াছে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের অভিপ্রায় এরূপ ভেদবিলয় নহে। এরূপ অসম্ভব ভেদবিলয় উন্মাদ-

গ্রন্থের পক্ষেও সম্ভব কি না সন্দেহ। আধ্যাত্মিক চক্ষুতে যখন জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের একতা দৃষ্ট হয়, তখন সসীম ও অসীমের একতারূপ অসম্ভব ব্যাপার দৃষ্ট হয় না, তখন অসীমের সহিতই অসীমের একতা দৃষ্ট হয়,—যেস্থানে, যে বস্তুতে, যে সসীমে পূর্ব্বে অসীমকে দেখা হয় নাই, যে সসীমকে পূর্ব্বে অসীম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই সসীমের ভিতর অসীমকে দেখা হয়, সেই সসীম অসীমের অঙ্গীভূত, অসীমের সহিত একীভূত বলিয়া দৃষ্ট হয়; এই অভিজ্ঞতাই অদ্বৈতবাদব্যঞ্জক ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই অভিজ্ঞতায় অসীম সসীমের ভেদ দূর হয় না, অথচ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিবিহীন প্রাকৃত বুদ্ধির কৃত ভেদও থাকে না।

দৃষ্টান্তে আসা যাক্। প্রাকৃত উপাসক, যোগদৃষ্টিবিহীন উপাসক, নিজের কথা ভাবিতে গিয়া শরীরকে ভাবেন, অথবা শরীরের অভ্যন্তরস্থিত বায়ু বা ইথারবৎ কোন সূক্ষ্ম সচেতন পদার্থ ভাবেন। আর উপাস্য ভাবিতে গিয়া এই কল্পিত সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত, অথবা ইহার সহিত স্থূল সূক্ষ্মের মিশ্রণের ন্যায় ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ অপর একটী বৃহত্তর সচেতন বস্তু ভাবেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধীয় এই ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এমন কি দেখা যায় যে উপাস্য উপাসকে এরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকিলে উপাসনারূপ গভীর যোগ আদতেই সম্ভব নহে। যে দুই বস্তু পরস্পর পৃথক্ অথবা যাহাদের সম্বন্ধ অনির্ণীত, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান, চিন্তা ও ভাবের বিনিময় সম্ভব নহে। সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞানে দেখা যায় একটী অখণ্ড জ্ঞানালোকই জীব ও জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, একটী অদ্বিতীয় সচেতন বস্তুই জীব ও জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। আমরা প্রত্যেকে যাহাকে নিজ 'জ্ঞান' বা 'আত্মা' বলি, সেই জ্ঞান বা আত্মাকেই বিষয়জগতের জ্ঞাতা, অবভাসক ও আধাররূপে দেখি, এবং বিষয়জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে গিয়া অবশ্যম্ভাবিরূপেই নিজ আত্মাকে জগতের জ্ঞাতা, অবভাসক ও আধার বলিয়া বিশ্বাস করি। এই অভিজ্ঞতাই অদ্বৈতবাদের ভিত্তি, এবং জ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনা করিতে গেলে এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই উপাসনা করিতে হইবে। নিজ আত্মা ভিন্ন অন্য কোন আত্মা জানিও না, ভাবিতেও পারি না। আর, অন্তর্যামী, হৃদয়সাক্ষী, মনের নিয়ন্তা যদি কেহ থাকে, তবে সে এই আত্মা। কিন্তু এই আত্মাকে কিরূপে

উপাসনা করি? এ যে আমি, এ যে উপাসক, এ যে সসীম, ব্যক্তিগত, ঘটে ঘটে ভিন্ন।

এস্থলে সূক্ষ্ম বিবেক-বিচার আবশ্যক। অভেদ না দেখিলে উপাসনার ভিত্তি নাই, ভেদ না দেখিলেও নাই। ভাবিয়া দেখুন, এই যে আত্মা প্রত্যেকের ভিতর প্রকাশিত, এই আত্মা মূলে এক ও অনন্ত। প্রত্যেকে আমরা নিজ আত্মাকে সর্ব্বাধার, এক ও অসীম বলিয়া জানিতেছি। সর্ব্ব, বহু ও সীমা ভাবিতে গিয়া অবশ্যম্ভাবিরূপেই আশ্রয়রূপী আত্মাকে সর্ব্বাধার, এক ও অসীম বলিয়া ভাবিতেছি। সুতরাং মূল বস্তু একই, এবং তাহা অসীম। সুতরাং আত্মাকে উপাসনা করিতে গিয়া যে সসীমের উপাসনা করিতে হয়, তাহা সত্য নহে। কিন্তু আত্মা যদি অসীমই হইল, উপাস্যই হইল, তবে উপাসক কোথায়? উপাস্যে কি উপাসক বিলীন হইয়া গেল না? আপাততঃ তাহাই বোধ হয়, এবং এই বোধ হইতেই অনেক অদ্বৈতবাদী উপাসনাকে অজ্ঞানমূলক বলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, আত্মার মৌলিক একত্বে যেমন বিষয়ের ভেদ যায় না, ঘট বাটি হইয়া যায় না, স্বর্ণ রৌপ্য হইয়া যায় না, চন্দ্র সূর্য্য হইয়া যায় না, বিষয় বিষয়ীর ভেদও দূর হয় না, দেশকালগত বস্তু এবং দেশ কালের আশ্রয়রূপী আত্মার ভেদ দূর হয় না, তেমনি তাহাতে সসীম জীব এবং অসীম ব্রহ্মের ভেদও দূর হয় না। আমরা বলি 'ব্রহ্ম প্রত্যেকের আত্মা'। এই "প্রত্যেক" পদবাচ্য বস্তুর সহিত তবে ব্রহ্মের কিছু ভেদ আছে। এই ভেদ কোথায় দেখা যাক্। ব্রহ্ম সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের আধার, তিনি দেশাতীত ও কালাতীত বস্তু। তাঁহার জ্ঞান দেশে আবদ্ধ নহে, এবং তাহাতে কালের অনিত্যতা নাই। এই অসীম সর্ব্বদেশব্যাপী সর্ব্বকালদর্শী দেশকালাতীত পরমাত্মাই যে আমার আত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অর্থে "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" বাক্যসমূহ ঠিক। কিন্তু ইহাতে আমার ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হইতেছে না। এই যে আমি জগতে জগদাধারকে দেখিতেছি, আমার চিন্তাতে চিন্তার আশ্রয়কে দেখিতেছি এবং আমাকে জ্ঞাতা দ্রষ্টা বলিয়া জানিতেছি,—এই যে জ্ঞানক্রিয়া, যাহাতে আমার বিশেষ জ্ঞাতৃত্ব, আমার ব্যক্তিত্ব, ইহার সহিত অসীমের নিত্য প্রকাশস্বরূপ নিস্তরঙ্গ জ্ঞানের স্পষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। এবং এই প্রভেদ আমার জীবনব্যাপী। ইহা আমার

জীবনের সমুদায় কালে এবং সমুদায় ব্যাপারে ব্যাপ্ত। শৈশবের অস্ফুট জ্ঞান-ক্রিয়া হইতে মুক্তাবস্থার মুক্তিসুখ সম্ভোগ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপারই এই ভেদ বর্ত্তমান। যিনি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, তাঁহার পক্ষে শৈশবের জ্ঞানোন্মেষ, সাধকের জ্ঞানসাধন ও মুক্তাত্মার জ্ঞানলাভ, এই সকল কিছুই সম্ভব নহে। এই সমুদায় সসীম জীবেরই সম্ভব। আমার বিষয়জ্ঞান, চিন্তা, সুখদুঃখবোধ, পাপপুণ্য বিবেক, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, সাধন, সিদ্ধিলাভ, সমুদায়ই সসীম ভাবব্যঞ্জক, সমুদায়ের সঙ্গেই বিশেষ দেশকাল ও সংখ্যার সম্বন্ধ। এই সসীমত্ব ও বিশেষত্বেই আমার ব্যক্তিত্ব—আমার উপাসকত্বের ভিত্তি। এই ব্যক্তিত্ব প্রতি জীবে ভিন্ন ভিন্ন। আমার মানসিক ক্রিয়া ও মানসিক ব্যাপার সমূহ, বিষয় সমূহ, অন্যের মানসিক ক্রিয়া ও বিষয় হইতে ভিন্ন, এবং যে বিশেষ অহংবোধ সমুদায় মনোবৃত্তির, বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয়—সেই অহংবোধ ও প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞান-ক্রিয়া এবং বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানসমষ্টি কিছুই সম্ভব হইত না যদি সর্ব্বব্যাপী, ত্রিকালজ্ঞ নিত্য অখণ্ড জ্ঞান সকলের আধাররূপে না থাকিতেন ও প্রকাশিত না হইতেন। তিনিই প্রত্যেকের মধ্যে উপাস্য, এবং তাঁহার নিত্য জ্যোতির অনুপ্রকাশরূপী, নানা মানস তত্ত্বসমষ্টিভূত বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানময় কোষরূপী জীবাত্মাই উপাস্য। উপাস্য উপাসকের এই মৌলিক অভেদ ও অবান্তর ভেদতত্ত্বই অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের মিলন স্থল এবং সজ্ঞান দর্শনসম্মত উপাসনা, ভক্তি ও সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক সাধনের ভিত্তি।

বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম্ম।*

কোন বিশেষ দেশ, কাল, জাতি বা ব্যক্তির উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্ভর করে না, অনুকূল অবস্থা সংঘটনে সকল দেশে, সকল কালে, সকল জাতি ও ব্যক্তিই বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে পারেন। কোন বিশেষ

---

*এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশ দুই বৎসর পূর্ব্বে "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায়, "ব্রাহ্মধর্ম্ম—সার্ব্বভৌমিক ও জাতীয়" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। তদবধি আলোচ্য বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ক্রমাগতই-কিছু না কিছু আন্দোলন চলিতেছে। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রবন্ধটা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইল।

শাস্ত্র বা গুরুর উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্ভর করে না; সত্য মাত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র, সত্যের শিক্ষক মাত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরু। কোন জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র অধিকারী নহে, উপযুক্ত সাধনসম্পন্ন প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিই ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধারণত্ব ও সার্ব্বভৌমিকত্ব।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনুকূল অবস্থা বিশেষ বিশেষ দেশ কাল ও জাতির মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে। বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে পারেন; বিশেষ বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ আবিষ্কর্ত্তা বা রক্ষকরূপে জগতের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারেন। সে স্থলে এরূপ বিশেষ দেশ, শাস্ত্র বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব ও জাতীয়তা উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রচারিত ছিল কি না ও আছে কি না, বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রশ্নের বিচার করিব না। এই প্রবন্ধে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক হইলেও ইহা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম। এদেশে বহুদিন পূর্ব্বে বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে এবং গৃহী ও বনচারী উভয় শ্রেণীর সাধককর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে। 'বেদান্ত' শব্দে এদেশের শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকেরা মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ও তদীয় শিষ্যবর্গের মত বুঝেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং 'বেদান্ত' শব্দ সর্ব্বত্রই 'উপনিষদ্' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ফলতঃ 'বেদান্ত' শব্দে মুখ্যভাবে উপনিষদ্‌কেই বুঝায়। তৎপর যে সকল গ্রন্থে উপনিষদের মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সে সকল গ্রন্থও গৌণভাবে 'বেদান্ত' শব্দবাচ্য। যাহা হউক, বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও উপনিষদাদি শাস্ত্র প্রচার ও বিধিগ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব ও জাতীয়ত্ব উভয় সত্যই বিশেষ-ভাবে প্রচার করিয়াছেন। তিনি এদেশীয়দিগের মধ্যে বিশেষভাবে এদেশীয় শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম্মই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদ বেদান্তের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুশাস্ত্র প্রতিপাদিত ধর্ম্মরূপেই প্রচার করেন। তাঁহার প্রকাশিত "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" গ্রন্থের অধিকাংশই উপনিষদ্ হইতে গৃহীত এবং প্রত্যেক অংশই কোন না

কোন হিন্দুশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" নামক অমূল্য উপদেশাবলী উক্ত গ্রন্থের শ্লোকসমূহেরই ব্যাখ্যা। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা ও প্রবন্ধসমূহ সম্পূর্ণরূপেই এই সত্যের পোষক। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নানা কারণে "হিন্দু" নামের পক্ষপাতী না হইলেও তাঁহারও মতে এদেশীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদ্‌-প্রতিপাদিত ও উপনিষদ্‌-প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার "লিবারাল" পত্রে ১৮৮৫ সালের ৭ই জুন তারিখে Our Return to the Vedanta "শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হয়,—"The foundation of Brahmoism was laid upon the *Upanishads*. Although we have advanced, the foundation remains the same." অর্থাৎ—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ভিত্তি উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও আমরা অগ্রসর হইয়াছি, তথাপি ভিত্তি পূর্ব্ববৎই আছে।

ফলতঃ, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যসমূহ—ঈশ্বরের একত্ব ও অনন্তত্ব, তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাসনা, আত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ যোগ, আত্মার অমরত্ব ও ক্রমোন্নতি, এই সমস্ত সত্যই উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। অবান্তর বিষয়ে উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রভেদ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অবান্তর বিষয়ে সকল ধর্ম্মেরই প্রাচীন ও আধুনিক আকারে প্রভেদ হয় এবং অবান্তর বিষয়ে আধুনিক ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেক প্রভেদ আছে। আবান্তর প্রভেদে প্রাচীন ও আধুনিকের, পূর্ব্বপুরুষ ও পরপুরুষের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যসমূহ যে উপনিষদ্‌ শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট আছে এই বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করা অনাবশ্যক। রাজা ও মহর্ষির গ্রন্থাবলী যদি এই সত্যের প্রমাণ না হয়, তবে প্রতি পাঠকই উপনিষদ্‌ অধ্যয়ন করিয়া দেখিতে পারেন। উপনিষদ্‌ এই সকল সত্যে পরিপূর্ণ। উপনিষদের যে সকল মত আধুনিক মতের বিরুদ্ধ ও আধুনিকগণের অপ্রীতিকর, সেই সকল মত মূল সত্যসমূহের বিরুদ্ধ ও বিনাশক নহে। এই বিষয়ে আমরা প্রবন্ধের শেষ ভাগে কিছু বলিব। সম্প্রতি বক্তব্য এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি উপনিষদাদি হিন্দু-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হয়, তবে এই বিষয়ে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিশ্বাসীদিগের কতিপয় গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। সেই সকল কর্ত্তব্য এই,—

প্রথমতঃ, উপনিষদ্ যখন স্বাভাবিক সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্মই শিক্ষা দিতেছেন, তখন ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র অর্থাৎ ধর্ম্ম-সাহিত্যরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করা আবশ্যক। ইহা দেশীয় শাস্ত্র, ইহার প্রতি আমাদের স্বভাবতঃই বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকৃষ্ট হয়, সুতরাং ইহার উচ্চ শিক্ষা আমরা অন্যান্য শাস্ত্রের শিক্ষা অপেক্ষা সহজতররূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম। সাধ্য ও সুবিধা অনুসারে সমুদায় শাস্ত্র ও শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণই উচিত বটে; কিন্তু বিশেষ ভাবে কোন শাস্ত্র ও শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে শৈথিল্য ও স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অবস্থা এখন এইরূপ। এমন অনেক ব্রাহ্মপরিবার আছে, যেখানে নিয়মিতরূপে কোন শাস্ত্রাধ্যয়ন হয় না, কোন সাধুজীবনের আলোচনা হয় না। এই শৈথিল্য ও স্বেচ্ছাচারিতা দূর করিবার পক্ষে ব্রহ্মবাদ-প্রতিবাদক স্বদেশীয় উপনিষদ্ শাস্ত্রের এবং স্বদেশীয় সাধুজীবনের বিশেষ আলোচনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকর। ব্রাহ্মসমাজ ইদানীং কার্য্যতঃ অনেক পরিমাণে উপনিষদ্ হইতে দূরে পড়িয়াছেন, উপনিষদের আলোচনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে কয়েকটী বিষময় ফল ফলিয়াছে—(১) গভীর জ্ঞানালোচনায় শৈথিল্য, (২) উপাসনায় গাঢ়তার অভাব, (৩) গভীর ধ্যান ধারণায় বিতৃষ্ণা। এই অবস্থা বেশি দিন চলিলে ব্রাহ্মসমাজ একটী আধ্যাত্মিকতা-বিহীন সমাজসংস্কারক দলরূপে পরিণত হইবে এবং সমাজসংস্কারও প্রকৃত সংস্কার না হইয়া বাহ্য সভ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আকার ধারণ করিবে। পূর্ব্ব পুরুষদিগের যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনালব্ধ সঞ্চিত ধর্ম্মাভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইলে এরূপ আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। গাছের কাটা ডাল শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রচার সম্বন্ধেও এই সত্য স্মরণ রাখিয়া প্রণালী স্থির করা উচিত যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশের জাতীয় উচ্চাঙ্গ ধর্ম্ম, জাতীয় শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম। এরূপ প্রচার-প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইবে। অনেক উৎকৃষ্ট ও সুন্দর দেশ আছে, অথচ প্রকৃতিস্থ মানব মাত্রেরই পক্ষে স্বদেশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। অনেক উৎকৃষ্ট ও মধুর ভাষা আছে, অথচ মাতৃভাষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। অনেক উৎকৃষ্ট নারী আছেন, অথচ স্বীয় মাতা, ভার্য্যা ও ভগিনী সকলেরই অধিক প্রিয়। অনেক শিশু সন্তান আছে, অথচ নিজ সন্তান

সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহাস্পদ। এই কারণেই সকল শাস্ত্র, সকল গুরু, সকল সাধু-জীবন শ্রদ্ধার বস্তু হইলেও দেশীয় শাস্ত্র, গুরু ও সাধুজীবন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং ধর্ম্মজীবনের উপযোগী। এই নিয়ম সাধারণ; কেবল যেখানে কোন জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে জাতীয়তাবিহীন হইয়া গিয়াছে, সেখানেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

জাতীয়তা যেখানে যত প্রবল, যে জাতির সভ্যতা যত উচ্চ ও প্রাচীন, সেই জাতির মধ্যে নূতন বা বিদেশজাত ধর্ম্ম প্রচার করা তত কঠিন। অপেক্ষাকৃত অসভ্য, অনুন্নত জাতির মধ্যে নূতন ও বিদেশীয় ধর্ম্ম প্রচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অসভ্য প্রাচীন ব্রিটন ও জর্ম্ম্যান জাতির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা তাদৃশ কঠিন হয় নাই, কিন্তু সুসভ্য গ্রীক্ ও রোম্যান্ জাতি সহজে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই এবং যখন করিল, তখন ইহাকে তাহাদের জাতীয় দর্শন ও দেবতত্ত্বের মিশ্রণে এতদূর পরিবর্ত্তিত করিল যে ইহা আর সেই আদিম খ্রীষ্টধর্ম্ম রহিল না। হিন্দুজাতির সভ্যতা এত প্রাচীন ও সুদৃঢ়, এবং জাতীয়ভাব এত প্রবল, যে এই জাতি এখন পর্য্যন্ত কোন বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক অধিবাসী মুসলমান বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোক। আর তাহাদের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বংশবৃদ্ধির নিয়মানুসারেই বৃদ্ধি পাইয়াছে, সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ দ্বারা তত দূর হয় নাই। আর, ইহাও ঠিক যে বঙ্গদেশের মুসলমান ধর্ম্ম খাঁটি মুসলমান ধর্ম্ম নহে, পীরপূজা ও হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহাকে অনেক পরিমাণে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক, যাঁহার শিক্ষা জাতীয় ভাবে হয় নাই, যিনি জাতীয় শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, সুতরাং স্বভাবতঃ জাতীয়তার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন, তিনি আমাদিগকে একদিন বলিলেন, "আজ কাল ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুশাস্ত্র প্রতিপাদিত বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিতে চায় না, আর উক্তভাবে প্রচার করিলে লোকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনে।" আমার বোধ হয় অনেকেই এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন। এরূপ হইবার দুটী কারণ আছে। প্রথম কারণ হিন্দুজাতির বদ্ধমূল জাতীয়তা। দ্বিতীয় কারণ এই যে আজ কাল

হিন্দুশাস্ত্রের বহুল প্রচার বশতঃ লোকে দেখিতে পাইতেছে যে ব্রাহ্মেরা এমন কোন উচ্চ কথা বলিতেছেন না, ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে এমন কোন সত্য প্রচার করিতেছেন না যাহা হিন্দু শাস্ত্রে নাই।

এক কালে এদেশের শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে অনেক পরিমাণে জাতীয়তাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশের সর্ব্ব সাধারণও অনেক পরিমাণে শাস্ত্রালোচনা-বঞ্চিত ছিলেন। সেই সময়ে জাতীয়তা-নিরপেক্ষ প্রচার অনেক পরিমাণে কার্য্যকর হইয়াছিল। তখন ইংরেজির একাধিপত্য ছিল, সুতরাং ইংরেজি ভাষায় উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত, ইংরেজি ভাষায় সুবক্তা ও সুলেখক কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগিগণের ইংরেজি ভাবাপন্ন প্রচারচেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছিল। আজ কাল্ জাতীয়তার বিশেষ অভ্যুত্থান ও জাতীয় ধর্ম্মসাহিত্যের বহুল প্রচার বশতঃ যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নব যুগে যুগের উপযোগী প্রচারপ্রণালী অবলম্বন না করিলে প্রচারচেষ্টা তাদৃশ সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। মহাত্মা কেশবচন্দ্র যে শেষ জীবনে গভীরতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাবশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের জাতীয়ত্ব ও জাতীয় প্রচারপ্রণালীর আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদান্ত-প্রতিপাদিত জাতীয় ধর্ম্ম, এবং এদেশে ইহা প্রধানতঃ জাতীয় ভাবেই প্রচারিত হওয়া উচিত, এই মত সম্বন্ধে নানা আপত্তি উঠিতে পারে। সংক্ষেপে এরূপ কতিপয় আপত্তির উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম যুক্তি-নিরপেক্ষ হইয়া অন্ধভাবে কোন শাস্ত্র মানেন না। কিন্তু, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে উপনিষদ্ বেদের পূর্ব্বভাগকে এরূপ শাস্ত্র বলিয়া মান্য করেন। এরূপ আপত্তির উত্তর এই যে আমরা প্রাচীন ও প্রামাণিক উপনিষদ্ সমূহে এরূপ অন্ধ শাস্ত্রবাদ কোথাও পাই নাই। উপনিষদ্-লেখকগণ অত্যন্ত সাহসী ও স্বাধীন। এমন কি তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের নিন্দা করিতে, অর্থাৎ ইহাকে অপরা বিদ্যা ও নিম্ন সাধকের অবলম্বনীয় বলিয়া বর্ণনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অন্ধভাবে শাস্ত্র মানা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী হিন্দু লেখকগণই দায়ী, উপনিষদের ঋষিগণ দায়ী নহেন।

২। 'উপনিষদে অদ্বৈতবাদ আছে; অদ্বৈতবাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের

সামঞ্জস্য কোথায়?' এই আপত্তির উত্তর এই যে, উপনিষদের অদ্বৈতবাদকে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া মনে করি না। ব্রহ্মই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য বস্তু, দেশ কালগত ব্যাপার আপেক্ষিক ও ব্রহ্মাশ্রিত, এরূপ অদ্বৈতবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী হওয়া দূরে থাক্, প্রত্যেক ব্রাহ্মই বোধ হয় গভীর উপাসনার সময়ে এই সত্য অনুভব করিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের উপাসনার সময়ে স্পষ্টরূপেই এই সত্য উচ্চারিত হয়।

৩। 'উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মের মত আছে, এরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞেয়; ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বরের সহিত এরূপ ব্রহ্মের সাদৃশ্য কোথায়?' এই আপত্তিটী "নির্গুণ" ও "সগুণ" শব্দদ্বয় সম্বন্ধীয় একটী মহা ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ও প্রামাণিক উপনিষদ্ সমূহে 'সগুণ' 'নির্গুণ' কথাগুলি নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এই শব্দ দুটীর ভাব যাহা তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ অর্থাৎ বিশ্বরূপী ও বিশ্বাতীত এই উভয় ভাবেই বর্ণিত। উপনিষদ্-লেখকগণ এই দুই ভাবে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পান না। আর তাঁহাদের নির্গুণ ব্রহ্মও অজ্ঞেয় নহেন। তিনিও সৎ, চিৎ, ও আনন্দস্বরূপ।

৪। উপনিষদে জন্মান্তরবাদ আছে। কেহ কেহ জন্মান্তরবাদকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী মনে করেন। জন্মান্তরবাদ ইদানীন্তন অধিকাংশ ব্রাহ্মের মতবিরুদ্ধ বটে, কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মের মত বিরুদ্ধ হওয়া আর ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হওয়া এক কথা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আত্মা অমর ও অনন্ত উন্নতিশীল। আত্মা অশরীরী হইয়া অমর হইবে কি শরীরান্তর গ্রহণ করিবে, এই বিষয়ের মতামত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের অন্তর্গত নহে। জন্মান্তরবাদ অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতির বিরোধী নহে, সুতরাং ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধীও নহে।

৫। 'উপনিষদে নানা অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক কথা কথা আছে। এরূপ শাস্ত্রকে কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বলা যায়?' এই আপত্তির উত্তর এই যে ধর্ম্মের মূল ও অবান্তর মতের মধ্যে প্রভেদ করা আবশ্যক। উপনিষদের অবৈজ্ঞানিক মতগুলি উপনিষদের মৌলিক ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে, সুতরাং সেই সকল মতকে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী বলা যাইতে পারে না। হয়ত আমাদের মধ্যে এরূপ অনেক মত প্রচলিত আছে যে সকল মত ভবিষ্যতে

থেলিসের জীবৎকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৪০ হইতে ৫৫০ অব্দ পর্য্যন্ত। বলা বাহুল্য যে সেই সময়ে ভারতীয় দর্শন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। থেলিসের সময়ের ন্যূনাধিক শত বর্ষ পরেই বুদ্ধদেবের সময়। বুদ্ধদেব প্রসিদ্ধ ষড়দর্শন ও অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়কে উন্নত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শনাপেক্ষা অনেক প্রাচীনতর, এবং যদি সেই প্রাচীন কালে ভারত ও গ্রীশে চিন্তার আদান প্রদান হইয়া থাকে, তবে ভারতই গুরু, গ্রীশ শিষ্য। থেলিসের অধ্যাপিত দর্শনের মূল সূত্র যাহা, তাহা সংহিতাকার ঋষিগণের চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল, এবং সম্ভবতঃ কোন কোন ঋষি উক্ত মূল সূত্রেই আবদ্ধ ছিলেন, উহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। উপনিষদের সময়ে ঐ মূল সূত্র আপেক্ষিকভাবে—ব্রহ্মবাদের অধীনে—প্রচারিত হয়। থেলিস্ বলেন,—"সমুদায় বস্তুর কারণ জল। জল হইতে সমুদায় জন্মে এবং জলেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।" থেলিস্ সমুদ্রতীরবাসী ছিলেন। দেখিতেন সূর্য্য সমুদ্র হইতে উদিত হন, সমুদ্রেই অস্তমিত হন। পৃথিবী সমুদ্রবেষ্টিত এবং পৃথিবীর ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় দিকেই সমুদ্র। বৃক্ষ লতাদি জলে জীবিত ও পরিপুষ্ট। দেখিতেন জলের সহিত উত্তাপের নিকট সম্পর্ক, উত্তাপ জলজাত বলিয়াই বোধ হয়। আরও অসংখ্য স্থলে দেখিতেন জলই, জীবন রক্ষা ও বিকাশের কারণ, আর জলের সাহায্যেই বস্তু নানা রূপ ধারণ করে। উদ্ভিদের বীজসমূহ আর্দ্র, জলযুক্ত। জল কঠিন হইয়া হিমশীলা হয়, ভূমির আকার ধারণ করে। ঈদৃশ নানা কারণে থেলিস্ সিদ্ধান্ত করিলেন জলই সমুদায়ের কারণ। থেলিস্ এই জলরূপ কারণের উপর কোন জ্ঞানবান্ কারণ মানিতেন কি না, এই বিষয়ে ইতিবৃত্ত-লেখকগণের মধ্যে ঐকমত্য নাই। কেহ কেহ বলেন, থেলিসের মতে জলই আদিকারণ, জল দেবতাদেরও কারণ, থেলিস্ ঈশ্বর মানিতেন না। অপর কেহ কেহ বলেন, থেলিসের মতে জল ঈশ্বরের হস্তে উপাদান মাত্র, ঈশ্বরই আদিকারণ। উপনিষদে শেষোক্ত আকারেই জলের কারণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই জলকারণবাদিনী শ্রুতির আকার দেখিলে মনে হয়, হয়ত উপনিষদের সময়েও জলের আদিকারণত্বে বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই, এমন কি ঐ শ্রুতি এই মতাবলম্বী কোন ঋষির উচ্চারিত হওয়াও অসম্ভব নহে। ঋষি বলিতেছেন, "আপ এবেদমগ্র আসুস্তা

আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবান্।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্,৫মাধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ।) অর্থাৎ "এই সমস্ত পূর্ব্বে জল ছিল,সেই জল সত্যের সৃষ্টি করিল, সত্য ব্রহ্মের, ব্রহ্ম প্রজাপতির এবং প্রজাপতি দেবতাদিগের সৃষ্টি করিলেন।" এই শ্রুতিতে থেলিস্-প্রচারিত মত পূর্ণরূপেই বর্ত্তমান।

থেলিস্-শিষ্য আনাক্সিম্যাণ্ডার তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে সূক্ষ্মতর ও সত্যতর মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে আদিকারণ অনাদি, অনন্ত ও নির্ব্বিশেষ; তাঁহাতে জল বা অন্য কোন ভৌতিক বস্তুর সসীমত্ব ও বিশেষত্ব নাই। এই অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিশেষ আদিকারণে একটী অনাদি ক্রিয়াশীলতা আছে। এই ক্রিয়াশীলতা হইতে শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব নির্গত হয়। এই শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব হইতেই সমুদায় বিশিষ্ট ও সসীম বস্তু, চেতন ও অচেতন উভয় শ্রেণীর বস্তুই উৎপন্ন হইয়াছে। আদিকারণ সমুদায় সসীম ও বিশিষ্ট বস্তুতে আধার, কারণ ও পরিচালকরূপে বর্ত্তমান, কিন্তু স্বয়ং অসীম ও নির্ব্বিশেষ। আদিকারণকে আনাক্সিম্যাণ্ডার সজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার মত থেলিসের মতাপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইলেও তাঁহাকে থেলিসের সহিত 'ভূতবাদী' বলিয়াই বর্ণনা করা হয়।

আনাক্সিমাণ্ডারের শিষ্য আনাক্সিমেনিস্ কিয়ৎ পরিমাণে নিজ গুরুর ও থেলিসের মত মিশ্রিত করিয়া প্রচার করেন। গুরুর ন্যায় তাঁহারও মতে আদিকারণ অনাদি, অনন্ত ও সর্ব্বাধার। কিন্তু থেলিসের অনুকরণে তিনি আদিকারণকে সবিশেষ বলিয়া প্রচার করেন। থেলিসের মতে আদিকারণ জলরূপী, আনাক্সিমেনিসের মতে আদিকারণ বায়ুরূপী। তিনি দেখিলেন বায়ু নিয়ত ক্রিয়াশীল ও সর্ব্বব্যাপী। বাহিরে বায়ু, অন্তরেও বায়ু। বায়ুতে জীব জীবিত। বাহিরের বায়ু নিশ্বাসযোগে শরীরে প্রবেশ করিয়া জীবের প্রাণরূপী হয়। তাঁহার বোধ হইল বায়ু সূক্ষ্ম হইয়া অগ্নি হয়, এবং স্থূল হইয়া জল, মৃত্তিকা প্রস্তরাদি হয়। এই সকল ভাবিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন বায়ুই জগতের আদিকারণ। ঈদৃশ মত যে এক কালে ভারতীয় আর্য্যসমাজে প্রচারিত ছিল, এবং ব্রহ্মবাদের উদয়েও এক কালে অন্তর্হিত না হইয়া ভূতসৃষ্টির প্রকরণরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপনিষদ হইতে ২।১ টী শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছি। বৃহদারণ্যক উপ-

অবৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু আমরা অবৈজ্ঞানিক মতে বিশ্বাস করিতাম বলিয়া আমাদের ভাবী বংশীয়দের দ্বারা অব্রাহ্ম বলিয়া গৃহীত হইলে আমাদের উপর বড়ই অবিচার করা হইবে।

৬। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের নিকটেও ঋণী, তবে ইহাকে বিশেষভাবে বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা হইবে কেন? ইহাতে অন্য ধর্ম্মের উপর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে।' এই আপত্তির উত্তর এই যে অন্যান্য ধর্ম্মের আলোচনাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মজীবনের অঙ্গপুষ্টি হইতেছে, ইহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি বটে, কিন্তু হিন্দুজাতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য শিক্ষার জন্য যে অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট ঋণী, ইহা আমরা স্বীকার করি না। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ কেবল দেশীয় শাস্ত্রের সাহায্যে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশীয় শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না, এবং অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয় না। ইংরেজী ভাষা ইহার অঙ্গপুষ্টির জন্য নানা ভাষার নিকট ঋণী, কিন্তু ইহা মূলে য়্যাঙ্গলোস্যাক্সন্ ভাষা, ইহা সত্য, এবং এই সত্য কথা বলাতে অন্য ভাষার ঋণ অস্বীকার করা হয় না।

৭। 'উপনিষদ্ দেববাদিনী। দেববাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য কোথায়?' উত্তর—ব্রহ্ম যে এক অদ্বিতীয়, এবিষয়ে উপনিষদে কোন দ্বিরুক্তি নাই। তবে ইহা মনুষ্যাপেক্ষা উচ্চতর দেবতা প্রভৃতি জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আমরা এরূপ জীবের কোন প্রমাণ পাই না, তাই বিশ্বাস করি না। কিন্তু যদি কেহ এরূপ জীবে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে অব্রাহ্ম বলিবার কোন কারণ দেখি না। মনুষ্যাপেক্ষা উচ্চতর জীব নাই, এরূপ মত কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যাখানে "দেবতা" শব্দের বহুল উল্লেখ দেখা যায়।

৮। 'ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাতীয়তা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।' এই আপত্তির উত্তর এই,—জাতীয়তায় সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হয় না, জাতিগত সঙ্কীর্ণতায়ই সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হয়। আমরা যদি কেবল জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করি, এবং সমাজের সভ্যশ্রেণী কেবল হিন্দু-

জাতির 'একচেটীয়া' করি, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উদার খ্রীষ্টানগণ যেরূপ বাইবেলের শিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও সকল ধর্ম্ম-সাহিত্যেরই আলোচনা করিতেছেন, আমাদিগেরও তদ্রূপ,—তদপেক্ষাও অধিক—নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে, এবং কেবল দেশীয় নহে,এদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বারও সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের জন্য অবারিত রাখিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি কোন অহিন্দু জাতীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাসী আমাদের দেশীয় সাধন, সামাজিকতা ও প্রচার প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া এদেশীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীভুক্ত হইতে চান, এরূপ ব্যক্তিকেও আমাদের পরমাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ উদার নীতি অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব নাশের কোন সম্ভাবনা নাই।

এখন বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের জাতীয়তা রক্ষার জন্য আমাদিগকে এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে।

১। ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন-প্রতিপাদক উপনিষদ্ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা।

২। সাধারণভাবে দেশীয় সকল শাস্ত্রের আলোচনা।

৩। দেশীয় সাধুজীবনালোচনা।

৪। প্রচারকালে দেশীয় শাস্ত্র ও সাধুজীবন বিশেষভাবে অবলম্বন।

৫। গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান ও সামাজিক আচার ব্যবহারে যথাসম্ভব জাতীয়তা রক্ষা। সত্য ও বিবেকের অনুরোধ ভিন্ন কেবল স্বেচ্ছাচার বা পাশ্চাত্য রীতির অন্ধানুকরণে অনর্থক বিজাতীয় ব্যবহার অবলম্বন না করা।

প্রাচীনতম য়ুরোপীয় দর্শন।

য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ য়ুনানি ঋষি থেলিস্‌কে তাঁহাদের শীর্ষস্থানে স্থাপন করেন। তাঁহাদের মতে তিনিই দার্শনিক সম্প্রদায়ের পিতা, প্রতিষ্ঠাতা।

পারমেনাইদিস্-প্রণীত দার্শনিক মহাকাব্যের অনেকাংশ এখনও বর্ত্তমান। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সৎ ও দ্বিতীয় ভাগে অসতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথম ভাগের সার এই,—সৎ জ্ঞানগোচর, অসৎ স্ববিরুদ্ধ, জ্ঞানের অগম্য ব্যাপার। সৎ বস্তু অজাত, অবিনাশী, দেশাতীত, কালাতীত, অখণ্ড, একরস ও অচল। ইহা এক মাত্র, অদ্বিতীয়, অসীম, অপরিবর্ত্তনীয়। ইহার স্বরূপ—জ্ঞান। পারমেনাইদিসের মতে জ্ঞান ও সত্তা একই—জ্ঞান ব্যতীত সত্তা নাই। ব্রহ্মাভিমুখী বিশুদ্ধ জ্ঞানই এক মাত্র প্রকৃত অভ্রান্ত জ্ঞান। যাহাকে সাধারণতঃ লোকে জ্ঞান বলে—জন্ম মৃত্যু, বহুত্ব ও ভিন্নত্ব, দেশ ও গুণপরিবর্ত্তন, এই সকল সংক্রান্ত জ্ঞান—তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা ভ্রম মাত্র।

কিন্তু দেশকালগত জগতের প্রকৃত সত্তা অস্বীকার করিয়াও পারমেনাইদিস্ এই জগতের আপাত সত্তা অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং তদীয় মহাকাব্যের দ্বিতীয় ভাগে তিনি এই অসৎ আপাত জগতের সৃষ্টি ও বিকাশতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতের উপাদান কারণ উষ্ণ ও শীত, তেজ ও ভূমি—এই দ্বন্দ্ব। উষ্ণ বা তেজ জীবনী শক্তি ও চৈতন্য-বিকাশের অনুকূল; শীত বা ভূমি জড়তা ও নির্জীব ভাব আনয়নের কারণ।

পারমেনাইদিসের শিষ্য জিনো গুরুর মত প্রখর বুদ্ধিপ্রভাবে বিকশিত করেন। তিনি দেশকালগত জগতের আপাতত্ব বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া পারমেনাইদিস্ প্রচারিত অদ্বৈত সদ্বস্তুবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই প্রদর্শন করেন যে বহুত্ব ও পরিবর্ত্তন উভয়ই স্ববিরোধী, বহুত্ব ও পরিবর্ত্তন ভাবিতে গেলেই মানব চিন্তাকে নানা অসঙ্গতি দোষে জড়িত হইতে হয়। প্রথমতঃ, বহুত্বের বিপক্ষে তিনি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন,—বহু বলিলেই অনেক বস্তুর সমষ্টী বুঝায়। এরূপ সমষ্টিভূত অনেক বস্তুর প্রত্যেকে যদি প্রকৃতরূপে এক হয়, তবে ইহা অখণ্ড; যদি অখণ্ড না হয় তবে ইহা এক নহে, বহু। তার পর, যাহা অখণ্ড তাহার আয়তন থাকা অসম্ভব; যার আয়তন আছে তাহা খণ্ডনীয়। এখন, আয়তনশূন্য বস্তুসমূহের সমষ্টি যাহা, তাহাও আয়তনশূন্য। সুতরাং যাহাকে বহু বলা হয় তাহা আয়তনশূন্য, অসীমরূপে ক্ষুদ্র, অর্থাৎ তাহা

প্রকৃত পক্ষে বহুই নহে। আপত্তি উঠিতে পারে যে, যাহা আয়তনশূন্য তাহা কিছুই নহে, প্রকৃত বহু যাহা, সমষ্টি যাহা, তাহা কখন আয়তনশূন্য নহে, সমষ্টীভূত প্রত্যেক বস্তুর আয়তন আছে, এবং ইহারা পরস্পর স্বতন্ত্র। এই আপত্তির উত্তর এই,—মানিলাম সমষ্টীভূত বস্তুসমূহ প্রত্যেকে আয়তনবৎ এবং পরস্পর স্বতন্ত্র। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই, এই স্বাতন্ত্র্য কিসে রক্ষিত হয়? যদ্দারা এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় তাহাও আয়তনবৎ সন্দেহ নাই। পরস্পরের মধ্যে আয়তনবৎ প্রতিবন্ধক না থাকিলে বস্তুসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিয়া অস্বতন্ত্র হইয়া যাইত। তার পর জিজ্ঞাস্য এই, এই প্রতিবন্ধক সমূহ এবং উপরি-উক্ত বস্তুসমূহ কিসের দ্বারা পরস্পর স্বতন্ত্রীভূত? প্রতিবন্ধক সমূহ ও বস্তু সমূহের ভিন্নতা কিসের দ্বারা রক্ষিত? পুনরায় ভেদকারি বস্তু-কল্পনা আবশ্যক। এই কল্পনার শেষ নাই। দাড়াই-তেছে এই যে প্রত্যেক বস্তু হইতে অপর প্রত্যেক বস্তু আয়তনবৎ অসংখ্য প্রতিবন্ধকদ্বারা ভিন্নীকৃত। সুতরাং সসীম ও বিশেষ আয়তন আর কিছু থাকিতেছে না, সমুদায় আয়তন অনন্ত আয়তনে নিমজ্জিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে জিনো এরূপ যুক্তি দেন,—একটী বস্তুকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইলে, যে দূরত্ব অতিক্রম করিতে হইবে, সেই দূরত্ব অবশ্য বিভাজ্য। বস্তুটীকে প্রথমতঃ এই দূরত্বের প্রথমার্দ্ধ, তৎপর দ্বিতীয়ার্দ্ধ অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথমার্দ্ধ আবার দুই ভাগে বিভাজ্য। এই দুই ভাগের প্রত্যেক ভাগ আবার বিভাজ্য। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে উক্ত দূরত্বের অসংখ্য অংশ। তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে একটী বস্তুকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে অসংখ্য দেশখণ্ড অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা অবশ্য অসম্ভব। সুতরাং স্থানপরিবর্ত্তন অসম্ভব, গতি অপ্রকৃত, আপাত মাত্র। আরও দেখুন, একটী তীর এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে যে সময় লাগে, সেই সময়কে যদি এক একটী মুহূর্ত্তে ভাগ করা যায়, তবে তীরটী এক এক মুহূর্ত্তে এক একটি স্থানে থাকে, অর্থাৎ স্থির হইয়া থাকে, কারণ থাকার অর্থ তাহাই। যদি এক এক মুহূর্ত্তে এক এক স্থানে থাকে তবে গতির সময় কোথায়? সুতরাং ইহার গতি প্রকৃত নহে, আপাত মাত্র। এইরূপে জিনো বহুত্ব ও পরিবর্ত্ত-

নিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-উদ্দালক সংবাদে উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যকে সূত্রাত্মা অর্থাৎ জগতের ধারণকর্ত্তা-বিষয়ক প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২) অর্থাৎ—"হে গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র। বায়ুরূপ সূত্রদ্বারা ইহলোক, পরলোক, এবং সমুদায় প্রাণী ধৃত রহিয়াছে।" ছান্দোগ্য উপনিষদের (৪।৩) সম্বর্গবিদ্যায় বায়ুকে সমুদায় দৈবশক্তির আধার এবং প্রাণকে সমুদায় অধ্যাত্ম বস্তুর আধার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বায়ুকে "প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত দার্শনিকত্রয়ের মধ্যে কেহই আদিকারণকে জ্ঞানবান্ বলিয়া উপলব্ধি করেন নাই। আনাক্সিমেনিস্ তাঁহাকে প্রাণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এই মাত্র, তাঁহাকে সজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। ক্রীটদ্বীপবাসী ডায়োজেনিস্ আর এক সোপান উঠিয়া আদিকারণের জ্ঞানবত্তা দর্শন করিলেন। তিনিও আনাক্সিমেনিসের ন্যায় আদিকারণকে প্রাণ বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং সমুদায় জগৎক্রিয়াকে সেই প্রাণরূপীর প্রাণন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জগৎকারণ জ্ঞানবান্। জ্ঞানবান্ কর্ত্তা ব্যতীত এরূপ নিয়ম শৃঙ্খলাপূর্ণ কার্য্য হইতে পারে না। ডায়োজেনিস্ বলেন জগৎ একটী সজীব সজ্ঞান পুরুষ। নক্ষত্রসমূহ তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র এবং সমুদায় প্রাকৃতিক ক্রিয়া,—সূর্য্যের ভূমিরসাকর্ষণ, চুম্বকের লৌহাকর্ষণ প্রভৃতি সমস্তই—এই পুরুষের প্রাণন। জীব-পরম্পরার যে ভিন্নতা,—উচ্চতা নীচতা—তাহাও প্রাণবায়ুর গুণতারতম্য-জনিত। নিকৃষ্ট জন্তুদের নিকৃষ্টতার কারণ নিকৃষ্ট বায়ুগ্রহণ, মনুষ্যের উৎকৃষ্টতার কারণ তাহার নির্ম্মলতর বায়ুসেবন। যাহা হউক, এইরূপে প্রাচীন গ্রীক্ চিন্তার প্রথম যুগে স্থূল ভূতবাদ হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ভূতবাদ, তৎপর স্থূল জ্ঞানবাদ প্রচারিত হইল। ডায়োজেনিস-প্রচারিত মতের অনুরূপ মত,—আদিকারণকে সজ্ঞান প্রাণরূপে বর্ণনা—উপনিষদের যথা তথাই দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। প্রশ্নোপনিষদের প্রাণস্তুতি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে

পারে। কিন্তু ডায়োজেনিস্ ও উপনিষদের প্রাণোপাসক ঋষির মধ্যে প্রভেদ এই যে ডায়োজেনিস্ সচেতন প্রাণের উপরে আর কিছু দেখিতে পান নাই, উপনিষদের ঋষির পক্ষে ব্রহ্মের সচেতন প্রাণরূপও অপেক্ষাকৃত স্থূল, ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, উচ্চতর রূপ তাঁহার নিকট প্রকাশিত। কিন্তু এই প্রকাশ তিনি ক্রমশঃ দেখিয়াছিলেন, প্রথমে ডায়োজেনিসের পদবিতেই ছিলেন, সন্দেহ নাই।

যুনানি ঋষি পারমেনাইদিস্।

জ্ঞানের গভীরতা এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও গাম্ভির্য্যবশতঃ পারমেনাইদিস্ য়ুনানিদিগের গভীর ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে "পারমেনাইদীয় জীবন" এই বাক্য পবিত্র জীবনের নামান্তররূপে ব্যবহৃত হইত। এই ঋষি খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দিতে আবির্ভূত হন। তাঁহার গুরু এশিয়া মাইনারের অন্তর্গত কলফন্ নগরবাসী জেনোফেনিস্। আমরা পূর্ব্বে গুরুর মত সংক্ষেপে বলিব, তৎপর পারমেনাইদিস্ এই মতকে যেরূপে পরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধীকৃত করেন, তাহা প্রদর্শন করিব। জেনোফেনিস্-প্রবর্ত্তিত মতের সহিত কোন কোন বিষয়ে বেদান্ত-মতের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে সমগ্র জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ; উপনিষদের ভাষায়— "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম মানবের ন্যায় বা কবিকল্পিত দেবতার ন্যায় সাকার ও মনোবৃত্তিশালী নহেন। তিনি জ্ঞানময়,এবং জ্ঞানযোগে সমগ্র জগৎ নিয়মিত করিতেছেন। সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, সর্ব্বত্র তাঁহার জ্ঞান ; শ্রুতির ভাষায়—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" তিনি অখণ্ড, অপরিবর্ত্তনীয়, শান্ত, অচল। জেনোফেনিস্ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে সর্ব্বপ্রকার সসীমভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব ও অপরিবর্ত্তনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু সসীম বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। পারমেনাইদিস্ এই অভাব পূরণ করেন।

নের স্ববিরুদ্ধত্ব ও অসম্ভবত্ব প্রদর্শন করিয়া বিষয়-জগতের আপাতত্ব সপ্রমাণ করিয়া একমাত্র, অদ্বিতীয়, অসীম সদ্‌বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশ কাল ও জড়ের অনন্ত বিভাজ্যতা সম্বন্ধে মানব-চিন্তাকে যে স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি দোষে জড়িত হইতে হয়, এই সত্যের দিকে প্রথমে জিনোই দার্শনিক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার যুক্তি পরবর্ত্তী সময়ে কোন কোন সুবিজ্ঞ দার্শনিককর্ত্তৃক বিশুদ্ধতর ও গভীরতর আকারে ব্যাখ্যাত হয়।

AUTHORITY AND FREE-THOUGHT IN RELIGION.

I

THOUGHT is not really so free as the ordinary free-thinker supposes it to be. We cannot entirely break asunder the threads that bind our thoughts to the thought of the past. Whether we wish it or not, we think in lines laid down for us and not laid out by our own free choice. The ideas with which we are born,—or, if, with a certain class of philosophers, you say that ideas are not innate,—the tendencies of thought with which we come into the world and which form the basis of our mental life, are inherited from thinking ancestors. They are the result of their ways of thinking, of their intellectual and moral experience. These tendencies,—which lead us necessarily to think, feel and will in certain ways,—rule us with an iron sway. We cannot but follow them. And it is well that they do so. Without them, our minds—if one could think of 'minds' without such tendencies,—would be perfectly blank, and no experience would be possible for us, however favourable the field might be. An empty egg could not be hatched into a fowl, however careful the hatching might be. And it is well

that mental experience is not confined to individual life,—that it has the capacity of perpetuating and communicating itself endlessly. It is this fact of spiritual heredity that constitutes the advantage of being born in an advanced race and an advanced family. A Bengali and a Sonthal child are not born equal, and cannot be made equal by education. The one inherits a rich store of intellectual and spiritual experience, which helps him at every turn in his growth in life; the other is born with a poor inheritance, and has to struggle hard and proceed slowly. Ideas, therefore are not, in a sense, ours, they are an inheritance, they are derived from an authority to which every mind, however free it may suppose itself to be, is subject.

The history of ideas, the gradual development or manifestion of thought under conditions laid down not by us but for us, constitutes this authority. If you attempt to trace this history to its beginning, you will see it has no beginning. Your imagination may quickly carry you to what may seem to be the beginning of the world, but that beginning is really the beginning of a cycle and not of the world, It is not the beginning of existence. And the beginning of one cycle is the end of another. You cannot think an absolute beginning, nor an absolute end. But perhaps it will seem that in the beginning of a cycle, there is no thought; so that, though existence may have no beginning, thought would seem to have one. But these are mere idle fancies. You cannot think of existence without thought, and the derivation of thought from anything which is not thought is impossible. Thought is the *prius* of all existence, and is eternal, uncreate. The history of the gradual manifestation of thought to created beings, is the eternal, unwritten scripture that guides all individual thought, that even of the freest free-thinker. This is the esoteric, the philosophical explanation of the doctrine that the Vedas are *apaurusheya*, without a personal writer.

In this sense, the 'Vedas' means the eternal stock of ideas that partially manifest themselves to all thinking beings, form the basis of their mental life, and revealing themselves to specially gifted beings in unusual richness and fulness, constitute bodies of national tradition,and become objects of veneration and careful study. On this subject, the reader who possesses the needful leisure and preparation, may consult what the great Sankara says in his commentary on aphorisms 25 to 33 of the third pada, first chapter, of the *Vedanta Sutras*.

Is there no freedom then ? Is all thought bound by the iron chains of authority ? Cannot the individual rise above his history, his surroundings, by any means ? And, if he can so rise, what is the extent to which this is possible ? Freedom, we reply, is as real as authority, but the former proceeds upon and is made possible by the latter. An individual is not merely the result of other individuals,of those that have gone before him. In every individual there is something original which cannot be explained by a mere reference to his past history—to his natural and spiritual ancestry. Every individual indeed comes with a fund of inheritance, but he also adds something to that fund. This addition constitutes his originality. The condition, however, of this addition is the individual's participation in the treasured experience of his ancestors. This participation forms the ground, as it were, on which the individual stands, as well as the strength that enables him to work in the field of experience which opens before him on his coming into the world. To every individual, Nature unfolds a realm of thought which she invites him to conquer and take possession of. It is, at his birth, an unappropriated treasure to him, and its appropriation is, in a real sense, a new experience to him, an experience that cannot be resolved into things inherited from his ancestors To bring these things under his mind's sway, constitues a new

experience to him. In this experience, his progress may be much greater than his ancestors, both quantitatively and qualitatively. He may know many things more than they did, and know them more correctly than they. There may be evolved in him a set of emotions and activities not experienced by them, and these may be much higher and better than theirs, carrying him much nearer than they to the goal that Reason sets before the human mind. There is thus a wide field left for the free play of thought. The mind of man is not necessarily tied down to the errors and foibles of his fathers. He is meant for progress, and progress implies freedom. But this freedom, as we have already pointed out, is based on due subjection to authority. Progress is determined by the extent to which, and the way in which the treasured experience of the past has been utilised and assimilated. He who has not learnt what the past has to teach him, strives in vain to leave the past behind. He must serve his apprenticeship in full before he is enabled to strike out a new line for himself. It is only by obtaining a full possession of the treasures that the experience of the past has left for us,—only by patiently learning the lesson it has to teach—that we can rise above it and see things which it did not see, and do things it did not do.

II.

We do not know how far the present movement for a revival of the national religion has been successful in restoring the old belief in a supernatural revelation. It is not likely that, notwithstanding partial success in certain quarters, such an attempt will ever be crowned with general and permanent success. The times are against it. The progress already made in Science and Philosophy is against it. Science indeed is not without its dogmatism. Science is not always strictly scientific. It often presumes to deny whatever

it has not been able to bring under its sway. It is however getting more and more reverent. It now shows a greater and greater readiness every day to recognise a sphere of reality beyond that over which it reigns. But it is strictly within its limits to reject the supernatural explanation of anything that can be explained naturally. When anything can be clearly traced to the ascertained laws of nature and mind, it is simply preposterous to refer it to a supernatural source. The revelation of spiritual truth and its embodiment in national tradition and literature is such a thing. It can be explained by the ascertained laws of human nature. It can be traced to the natural insight of the human mind into truth relating to that which surrounds it and that which underlies it, to the laws of reasoning implied in its very constitution, and to the self-preserving instinct that leads it to conserve everything that is agreeable and beneficial to it. All this explains religion and the literature it has given rise to here and elsewhere. The knowledge of God, like the knowledge of Nature, is a perfectly natural thing. The one is not more strange than the other. The mind of man is not a whit less intimately connected with the Supreme Mind in which it is contained, than Nature, the sphere of its experience. This natural explanation of religion and its literature being quite sufficient, there is no need to seek a supernatural explanation of these phenomena. Such an explanation is sure to be discredited more and more as the natural explanation is felt to be perfectly reliable. And its reliability is confirmed more and more by our daily spiritual experience. As we grow in spirit, we feel more and more how natural a thing it is to know God. It needs no supernatural revelation to tell us that Nature and man have a Divine Author, and that he is good to us and wants us to be good. And, even if common sense is competent to know this, Metaphysics, backed by spiritual experience, has been for

centuries rearing a structure of religious philosophy which draws more and more day by day the admiration of reverent and thinking men. As this philosophy grows in depth and breadth—as it takes in a greater and greater number of spiritual phenomena within its scope and explains them with increasing clearness, the faith that men put in supernatural revelation in the childhood of their intellectual life, wanes more and more. And, as religion is seen more and to be a natural thing, it ceases to be looked upon as something exceptional.

The idea that religion is supernaturally revealed is allied to the belief that absolute and unmixed truth, unattainable in other spheres, can be obtained in regard to the objects of religion. The defects of the human intellect, its liability to error, so evident in other departments of knowledge, are supposed to have no influence on religious ideas obtained through inspiration. The divine influx is supposed to counteract this influence and communicate unmixed truth to the human mind, though otherwise fallible. With the loss of man's faith in supernaturalism, this exceptionalness of religious inspiration as an infallible medium of truth also begins to be discredited, and it is seen that the attainment of spiritual truth is subject to conditions similar to those that obtain in other spheres of knowledge. When the conditions are favourable, spiritual truth reveals itself to the human mind as clearly as the truths of natural science. When they are unfavourable, the one is as liable to be mixed up with untruth as the other. If so, if even the products of religious inspiration are thus liable to be mixed up with error, the literature which embodies them, the Sastras,—though we very naturally and reasonably esteem them over all other literature because of their embodying thoughts and ideas on the highest subjects with which the human mind is concerned,—can lay no claim

superior to other literature on the score of infallibility. They are likely to be as fallible as other products of the human mind, and as infallible as some of them, according as the minds out of which they come subject themselves with more or less care to the conditions of attaining truth. Hence also the value of the Sastras differ according as they embody the experiences of practised seers and devotees, or of comparatively thoughtless and impulsive enthusiasts. It is only the ignorant and the thoughtless, to whom all Sastras,—and by Sastras they mean almost all works on religion written in the Sanskrit language—are of equal value. The learned and thoughtful leaders of our society have always recognised a clear distinction among the Sastras according to their relative worth. Their valuation may not have been always correct, but the recognition of a distinction among works all believed to be more or less inspired, is itself remarkable. The distinction between *Sruti* and *Smriti* is well known. This line of demarcation separates Vedic works from all other classes of works. The *Srutis* are incomparably superior to the *Smritis*, and where these two classes of writings conflict, the authority of the former is to be accepted. But the *Sruti* itself, though professedly infallible, was far from being practically accepted as such. There is, first, the accepted distinction between the *Karmakanda* and the *Jnanakanda*, the former represented by the *Sanhitas* and *Brahmanas* and the latter by the *Upanishads*. The *Jananka nda* is decidedly superior to the *Karmakanda*, and from the standpoint of the former, most of the rites and ceremonies inculcated in the latter are absolutely valueless, and even the motives to which it appeals are low, and must be given up as obstructions to the attainment of the highest beatitude. And then, in the *Jnanakanda* itself, there is a good deal which is quietly laid aside as mere *Arthavada*, that is non-essential utterances on things, not intimately connected

with the main object at which the *Upanishads* aim. It will thus be seen that though the accepted teachers and leaders of the national church never say in so many words that the scriptures are fallible, they, by no means, accept them practically as infallible. The scriptures, therefore, should be studied with a free and unbiased mind. They should be handled in the same liberal and yet reverent manner as we handle all other good and beneficial literature,—with minds ready to accept their truths as well as reject their errors. We should always remember that the same Supreme Intelligence that inspired their writers, are with us too, their readers, ever ready to help us in understanding them, and lead us to truth. The book of revelation is not closed, for the same Spirit that revealed truth to ancient seers may do the same to us, and may even make us see things which they did not see, and interpret things aright which they interpreted wrongly.

মায়াবাদ ও পরিণামবাদ।

বৈদান্তিকগণ মায়াবাদী ও পরিণামবাদী এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। অন্যান্য মত এবং সম্প্রদায়ও আছে, কিন্তু সেই সকল তাদৃশ প্রসিদ্ধ নহে। মায়াবাদিদের প্রধান মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, পরিণামবাদিদের প্রধান মহাত্মা রামানুজস্বামী। দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ সৃষ্টিপ্রকরণ-বিষয়ক। ব্রহ্ম জগতের কারণ, এবং কারণ ও কার্য্যে মূলে ভেদ নাই, কারণকে ছাড়িয়া কার্য্যের কোন সত্তা নাই, এই মতে উভয়ের ঐক্য। ব্রহ্ম স্বয়ং স্বরূপতঃ জগৎরূপে পরিণত হন, অথবা স্বয়ং অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া ইন্দ্রজালবৎ কোন শক্তিযোগে জগদ্ব্যাপার প্রকাশিত করেন, অসার বস্তুকে সাররূপে প্রতীয়মান করেন, —এই প্রশ্নের বিচার সম্বন্ধেই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ। বেদান্ত-শ্রুতি উভয়েরই অবলম্বনীয়। উভয়েই স্ব স্ব মতের পক্ষে বহুল উপনিষদ্বাক্য

উদ্ধৃত করেন, কিন্তু এই সকল বাক্যের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করেন, কাজেই শ্রুতিপ্রমাণে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। শ্রুতির ব্যাখ্যায়ই যখন মতভেদ হয়, তখন সূক্ষ্মতর যৌক্তিক প্রমাণ সম্বন্ধে অধিকতর মতভেদ হইবারই সম্ভাবনা। আমরা প্রথমে উভয় পক্ষের প্রদত্ত শ্রুতিপ্রমাণ ও তদ্‌ব্যাখ্যা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া তৎপরে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে যৌক্তিক প্রমাণ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিব।

প্রভেদটা মূলে কোন অতীত, দূরস্থ ঘটনাসম্পর্কীয় নহে। সৃষ্টিব্যাপার নিয়তই ঘটিতেছে। জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ দৈনন্দিন সাক্ষাৎ ব্যাপার। সেই সম্বন্ধ কীদৃশ? ইহা ভেদব্যঞ্জক, কি অভেদব্যঞ্জক? মূলে ভেদ কেহই স্বীকার করেন না। সুতরাং বিবাদ ভেদ ও ভেদাভেদের মধ্যে? মূলে দ্বৈত কেহই স্বীকার করেন না, সুতরাং বিবাদ দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের নহে, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্যে। ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব অভেদ কি ভেদযুক্ত। নির্ব্বিশেষ কি বিশিষ্ট? ইহাই প্রশ্ন।

শাস্ত্র কি বলেন? ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন যে এক মাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎকে জানা হয়, কারণ জাগত বস্তুসমূহ ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সমুদায় মৃত্তিকা জানা হয়, কারণ মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তু যাহা,তাহা মৃত্তিকা মাত্র, আর কিছুই নহে, ঘট সরাবাদি শব্দ গুলি বাক্য মাত্র, কোন স্বতন্ত্র বস্তুর পরিচায়ক নহে, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য বস্তু, তেমনি ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জগৎকার্য্য ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কিছুই নহে। এই দৃষ্টান্তের অভিপ্রায় ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পরিণামবাদী ও মায়াবাদির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। পরিণামবাদী বলেন, এই দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম এক অখণ্ড বস্তু বটে, কিন্তু তিনিই আবার নানা বস্তুরূপী হন। যেমন ঘট শরাবাদি মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন হইয়াও পরস্পর ভিন্ন, তেমনি ব্রহ্ম কারণরূপে এক হইয়াও কার্য্যরূপে ভিন্ন। যেমন বৃক্ষ এক হইলেও শাখাভেদে নানা, যেমন সমুদ্র এক হইলেও ফেণতরঙ্গাদি-ভেদে নানা, তেমনি ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। মায়াবাদী বলেন, উক্ত দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ঘট শরাবাদি কার্য্যজাত কেবল

বাক্যকৃত, মৃত্তিকাই কেবল সত্য, সুতরাং বিকার মিথ্যা, বিকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। তেমনি ব্রহ্মই সত্য, কার্য্যরূপ জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত [illegible] বলিয়া কোন বস্তু নাই। জীবাত্মাও যে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কিছু নহে, ব্রহ্মই, তাহা "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই বস্তু) এই বাক্য দ্বারাই বুঝা যাইতেছে। অভেদবাচক বাক্য আরও অনেক আছে, যথা, 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এই সমস্ত ব্রহ্মরূপ, 'ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা' এই যে আত্মা সেই এই সমস্ত, 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং' এই সমস্ত ব্রহ্মই, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ব্রহ্মে কিছু মাত্র নানা ভাব নাই, ইত্যাদি। বিশেষতঃ শ্রুতি সর্ব্বত্রই মোক্ষলাভকে একত্ব জ্ঞানের ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে নানাত্ব জ্ঞানের কোন ফলই উল্লেখ করেন নাই। যদি একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য হয়, তবে শ্রুতিকথিত মোক্ষবিজ্ঞানকে মিথ্যা বলিতে হয়। পরিণামবাদী বলেন, নানাত্ব যদি সত্য না হয় তবে (১) প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ, (২) নানা ফল-প্রতিজ্ঞাযুক্ত বৈদিক কর্ম্ম, (৩) গুরুশিষ্য ভেদাত্মক মোক্ষ শাস্ত্র,এই সমুদায়ই নির্ব্বিষয় ও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। মায়াবাদী বলেন, বস্তুতঃ পারমার্থিক ভাবে এই সমুদায়ের কিছুই সত্য নহে, কেবল ব্যাবহারিক ভাবেই সত্য। যত দিন অবিদ্যার প্রভাব থাকে,ততদিনই এই সমুদায় সত্য বলিয়া বোধ হয়, সম্যক জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, অদ্বৈত বস্তু উপলব্ধ হইলে, এই সমুদায়কে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, যেমন স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারসমূহকে মিথ্যা বলিয়া জানে। যদি নানাত্ব সত্য হইত, তবে শ্রুতি (ছান্দোগ্য ৬ ১৬) তপ্তপরশু পরীক্ষিত তস্করের দৃষ্টান্ত দিয়া ভেদদ্রষ্টাকে 'অনৃতাভিসন্ধ' বলিতেন না, এবং 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি' (কঠ ৪।১১), যে ইহাতে নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে যায়, এই বলিয়া ভেদ দৃষ্টির নিন্দা করিতেন না।

যুক্তি ও অনুভব কি বলে দেখা যাক্। ব্রহ্মের স্বরূপ ও শক্তিতে যে প্রভেদ তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে "ব্রহ্ম—সগুণ ও নির্গুণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছি। মায়াবাদ ও পরিণামবাদের প্রভেদ আমরা পুনরুক্তি করিতেছি। পরিণামবাদী বলেন, এই ব্রহ্মশক্তিতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই বস্তু প্রকৃত বস্তু। ব্রহ্মস্বয়ংই এই সকল বস্তুতে পরিণত হন, সুতরাং এই সকল

বস্তুকে অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বস্তু বলা ঠিক নহে, এবং বস্তুসমূহের কারণরূপিণী শক্তিকেও মায়া বলা উচিত নহে। 'মায়া' বলিতে এমন এক শক্তি বুঝায় যাহা কেবল অপ্রকৃত আপাত বস্তু উৎপাদন করে। মায়াবাদী বলেন, ঐশী শক্তি-জাত বস্তুসমূহ প্রকৃত বস্তু নহে,আপাত বস্তু,অবিদ্যাঘটিত বস্তু অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃই মনে হয় যে সেই সকলের প্রকৃত সত্তা আছে; জ্ঞানোদয়ে বুঝা যায় সেই সকল আপাত মাত্র, সুতরাং সেই সমুদায়ের কারণরূপিণী শক্তিকে মায়া বলাই উচিত। পরিণামবাদী যে বলেন ব্রহ্মই নানা জাগত বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছেন,ইহা অসম্ভব। যিনি দেশাতীত, অখণ্ড,অসীম,তিনি কিরূপে সসীম বিষয়রূপী হইবেন? যিনি কালাতীত, নিত্য,অপরিবর্ত্তনীয়,তিনি কিরূপে কালগত,অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল বিষয়রূপী হইবেন? যিনি এক, তিনি কিরূপে প্রকৃত পক্ষে বহু হইবেন? যিনি অদ্বিতীয়, তিনি কিরূপে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু উৎপাদন করিবেন? অসীম, অপরিবর্ত্তনীয়, এক ও অদ্বৈতের পক্ষে সসীম, পরিবর্ত্তনশীল, বহু ও সদ্বৈত হওয়ার অর্থ স্বরূপবিচ্যুত হওয়া। স্বরূপবিচ্যুত হওয়া ব্রহ্মের পক্ষে কিরূপে সম্ভব? আর, স্বরূপবিচ্যুত না হইয়া বর্ণিতরূপ হওয়া—অর্থাৎ অসীম-সসীম, নিত্য-অনিত্য, এক-বহু, অদ্বৈত-সদ্বৈত হওয়া—ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? এই সমস্ত বিশেষণ স্ববিরুদ্ধ। এরূপ বিশেষণযুক্ত বস্তু থাকা অসম্ভব। ত্রিভুজ বৃত্ত, বক্র সরল রেখা, স্বর্ণময় প্রস্তরপাত্র থাকা যতদূর সম্ভব, উক্ত বিশেষণ-যুক্ত বিশেষ্য থাকাও ততদূর সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম সসীম, অনিত্য ও বহু হন নাই, ইহা নিশ্চয়, এবং ব্রহ্মব্যতীত বস্তু যখন নাই,—অসীম, নিত্য, এক, অদ্বিতীয় বস্তু ব্যতীত বস্তু যখন নাই—তখন প্রকৃত পক্ষে সসীম, অনিত্য, বহু ও সদ্বৈত বস্তু থাকিতে পারে না, ইহাও নিশ্চয়। অথচ আমাদের ব্যাবহারিক জ্ঞানে বোধ হয় ঈদৃশ বস্তু আছে। তবেই বুঝিতে হইবে যে এই সকল বস্তু আপাত বস্তু মাত্র, প্রকৃত বস্তু নহে; এই সকল আছে বলিয়া বোধ হয় মাত্র, প্রকৃত পক্ষে এই সমস্ত নাই। আর ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যে শক্তি এই সমুদায় বস্তু উৎপাদন করে, সেই শক্তি ইন্দ্রজালবৎ শক্তি, প্রকৃত সত্তাশূন্য আপাত বস্তু উৎপাদনের শক্তি। এই শক্তি 'অঘটনঘট-পটিয়সী'—যাহা প্রকৃত পক্ষে ঘটিতে পারে না তাহাই আপাতরূপে ঘটাইতে সক্ষম। একমাত্র অদ্বিতীয়

অসীম নিত্য বস্তুর বর্ত্তমানে সসীম ও অনিত্য বস্তু থাকা অসম্ভব, অথচ এই শক্তি এই ধারণা জন্মাইতেছে যে এরূপ বস্তু আছে; সুতরাং ইহার 'মায়া' নাম অনর্থক ও অনুচিত নহে, সম্পূর্ণ রূপেই সার্থক ও উপযুক্ত।

কিন্তু বস্তুরূপে প্রতীয়মান, প্রত্যক্ষগোচর (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর) বস্তুসমূহকে অপ্রকৃত, আপাত বলিয়া বর্ণনা করা কত দূর যুক্তিসঙ্গত? ইহা কি কেবল উপহাসের বিষয় নহে? মায়াবাদী বলেন, অবিবেকীর নিকট ইহা উপহাসের বিষয় বটে; প্রজ্ঞাগোচর কোন্ সত্য তাহার উপহাসের ব্যাপার নহে? অবিবেকী প্রত্যক্ষকেই বস্তুত্বের প্রমাণ বলিয়া মনে করে, সে যুক্তি বুঝে না, অনুভবের তো কথাই নাই। বাস্তব কথা এই, প্রত্যক্ষ বস্তুত্বের প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ যুক্তি ও অনুভবদ্বারা শোধিত না হইলে পদে পদেই আমাদিগকে ভ্রমে পাতিত করে। প্রত্যক্ষ বলে সূর্য্য চন্দ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড-সদৃশ। ইহা কি সত্য? যুক্তি এই ভ্রম সংশোধন করে, অথচ যুক্তির সংশোধনের পরেও প্রত্যক্ষ এই মিথ্যা কথা বলিতে নিরস্ত হয় না। প্রত্যক্ষ বলে ভূপৃষ্ঠ সমান, গোলাকার নহে। এই কথা কি সত্য? প্রত্যক্ষ বলে পৃথিবী নিশ্চল, অন্তরীক্ষ নীল কটাহতুল্য, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সেই কটাহতলে নিবদ্ধ। যুক্তি কি এই সকল কথা সমর্থন করে? প্রত্যক্ষ বলে আমার সম্মুখস্থ পুস্তকের রক্তবর্ণ আমার শরীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্থাপিত, আমার গৃহতলের শীতলতা আমার আসনের নিম্নে অবস্থিত রাজপথে সঞ্চালিত শকটধ্বনি রাজপথেই আবদ্ধ। কিন্তু যুক্তি বলে এই সকল ব্যাপার আমার ইন্দ্রিয়সংলগ্ন,—বর্ণ চক্ষুসংলগ্ন, শীতলতা চর্ম্ম-সংলগ্ন এবং শব্দ কর্ণপটহ-সংলগ্ন। এই সমস্ত দৃষ্টান্তে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তির প্রমাণই গ্রহণ করি, এবং প্রত্যক্ষগোচর ব্যাপার সমূহকে প্রাতিভাসিক, আপাত ব্যাপার বলিয়া সিদ্ধান্ত করি।

তার পর, অনুভব স্ফুরিত হইলে দেখা যায়, অনুভবলব্ধ সত্যের কাছে যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তও দাঁড়াইতে পারে না, তার কাছে যুক্তিলব্ধ সত্যও আপাত ব্যাবহারিক সত্য মাত্র, পারমার্থিক সত্য নহে। সম্মুখস্থ কাগজখণ্ড ও কাগজের জ্ঞাতা আমি—আপাততঃ মনে হয় এস্থলে দুটী বস্তু বর্ত্তমান। ব্যব-

হারোপযোগী ভাষা এবং সাধারণ প্রাকৃত চিন্তা উভয়ই এই দ্বৈতভাবব্যঞ্জক। কিন্তু গভীর অনুভবের অবস্থায় এই দ্বৈতভাব দূর হইয়া যায়। যে পাঠকের চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার বুদ্ধিতে সূক্ষ্ম বিচারযোগে সেই অনুভবের আভাস উৎপাদন করা অসম্ভব নহে, তাই আমরা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। কাগজখণ্ড আমাদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে। এই যে আমার দৃষ্টিতে কাগজখণ্ডের প্রকাশ, এই প্রকাশ হইতে কাগজখণ্ডকে স্বতন্ত্র করা যায় কি না? পাঠক দেখিবেন তাহা অসম্ভব। দৃষ্টি-বিচ্যুত হইলে কাগজখণ্ডের দৃশ্য গুণ, অর্থাৎ রূপ, বর্ণ, আর কিছু থাকে না। তেমনি স্পর্শ-বিচ্যুত হইলে ইহার শীতলতা মসৃণতাদি স্পর্শগুণ আর কিছু থাকে না। দৃষ্টিবিচ্যুত রূপ আর স্পর্শবিচ্যুত স্পর্শগুণ অভাবনীয় অর্থহীন ব্যাপার। এই রূপে দেখা যায়, কাগজখণ্ডের যে কোন গুণের বিচার করা যাক্, সমুদায়ই জ্ঞান-সাপেক্ষ। কাগজখণ্ড জানা না হইয়া থাকিতে পারে না, ইহার পক্ষে থাকা আর জানা হওয়া একই কথা। তাহা হইলে, এস্থলে যে দুটী স্বতন্ত্র বস্তু অনুভূত হইতেছে তাহা নহে,একটী বস্তুই অনুভূত হইতেছে, সেটী জ্ঞানবান্ আত্মা। ব্যাবহারিক ভাষায় তত্ত্বটি প্রকাশ করিতে হইলে ইহা দ্বৈতব্যঞ্জক বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনুভূত বস্তু একটী। এস্থলে আত্মা নিজ স্বরূপগত অনুভবসহ প্রকাশ পাইতেছে, আত্মা ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু প্রকাশ পাইতেছে না। মনে হইতে পারে যে কাগজখণ্ডরূপ বিষয়ের অনুভব, অথবা, অন্য কথায়, অনুভূত বিষয় কাগচখণ্ড আত্মাতি-রিক্ত না হইলেও এক অর্থে আত্মার নানাত্বসাধক, আত্মা এস্থলে রূপ স্পর্শাদি নানা গুণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত ; এই নানাত্ব অস্বীকার্য্য ব্যাপার নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই নানাত্ব কি আত্মার? এক অখণ্ড আত্মাতেই রূপরসাদি গুণ প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং স্থূল প্রাকৃত দৃষ্টিতে রূপরসাদি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এই সমুদায়কে আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে ইহাদের স্বতন্ত্রতা ও ভিন্নতার সংস্কার দূর হইয়া যায়। কাগজখণ্ডের উর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ভিন্ন, এবং ব্যাবহারিক জগতে এই প্রভেদ অস্বীকার্য্য। দুটী ভাগ দেশের দুই অংশে অবস্থিত, সুতরাং একে অন্য হইতে ভিন্ন। কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে দেশের অংশ কোথায় থাকে? দেশই বা কোথায়

থাকে? এক অখণ্ড আত্মাতে ঊর্দ্ধ অধঃ উভয়ই প্রকাশিত, উভয়ই ধৃত; এক অখণ্ড আত্মাই দেশরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, দেশরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই একমাত্র প্রকৃত বস্তু, আর তাঁহার অংশ নাই, বিভাগ নাই। আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে দেশের অংশ নাই, অথবা, অংশ না থাকিলে যদি দেশ না থাকে, তবে দেশও নাই। অর্থাৎ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে যাহা অংশযুক্ত দেশ, আত্মদৃষ্টিতে তাহাই নিরংশ অখণ্ড আত্মা।

দেশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বর্ণ ও শীতলতা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়; কিন্তু ইহারা একই অভিন্ন আত্মাতে প্রকাশিত, অনুভূত, সুতরাং আত্মদৃষ্টিতে ইহাদের ভিন্নতা নাই। যে দেশের আপাত ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে এই সকল বিষয়গুণ প্রকাশিত, সেই দেশ আত্মদৃষ্টিতে অখণ্ড। যে কালের আপাত ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহারা প্রকাশিত, সেই কালও আত্মাতে অখণ্ড। ভূত, ভবিষৎ, বর্ত্তমান, এই সমস্ত ভেদ আত্মার ভেদ নহে। আত্মা ভূত, ভবিষৎ, বর্ত্তমান সকল কালেই বিদ্যমান। সুতরাং তাঁহাতে ভূত, ভবিষৎ, বর্ত্তমানের ভেদ নাই; তিনি নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব আত্ম-দৃষ্টিতে কালের ভেদও অপ্রকৃত। দেশ কালের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলেও বর্ণ ও শীতলতার প্রকৃতিতে কিছু প্রভেদ থাকে? এই প্রভেদ কি বাস্তব নহে? সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় এই প্রভেদও অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণ শীত-লতা নহে, শীতলতা বর্ণ নহে, এস্থলে ভেদ; কিন্তু এই ভেদ সম্বন্ধ-সূচক। বর্ণও শীতলতা পরস্পর সম্বন্ধ না থাকিলে এই ভেদও অসম্ভব হইত। এই বর্ণের বর্ণত্ব অবর্ণের সহিত—এমন কিছু যাহা বর্ণ নহে, তাহার সহিত—সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, শীতলতার শীতলতা এমন কিছুর সহিত সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে যাহা শীতলতা নহে। এই সম্বন্ধের কারণ অভেদ আত্মা। অভেদ আত্মার আশ্রয়ে এই সমুদায় ভেদ প্রতিভাত হওয়াতেই ইহাদের সম্ভাবনা। সুতরাং এই সকল ভেদ মৌলিক নহে, ইহাদের মূলে অভেদ, এবং ইহারা আত্মার ভেদ নহে, কোন বস্তুর ভেদ নহে; ইহারা এক অদ্বিতীয়, অভিন্ন আত্মবস্তুর আশ্রিত ব্যাপার মাত্র।

পরিণামবাদী বলিতে পারেন, দেশ, কাল, সংখ্যা, পরিমাণ, সম্বন্ধ প্রভৃতি

ব্যাপারকে যত কেন সূক্ষ্ম, আপেক্ষিক, আশ্রিত ও অনিত্য বলিয়া বর্ণনা কর না, ইহাদের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পাইতেছ কি? অবিশুদ্ধ প্রাকৃত বুদ্ধিকৃত স্থূল ভেদ মিথ্যা কাল্পনিক বলিয়া সপ্রমাণ হইলেও, বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে অখণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলেও, সেই অখণ্ড বস্তুরই আশ্রিত একটী আপেক্ষিক সূক্ষ্ম ভেদ অস্বীকার করা কি সম্ভব? অন্য কথা দূরে থাকুক্, ব্রহ্মকে যে আমরা অসীম, এক, অদ্বিতীয় বলি, এই বলাতেই, এই সকল স্বরূপ লক্ষণের মধ্যেই, কি একটী সূক্ষ্মভেদ বর্ত্তমান নহে? ব্রহ্ম দেশাতীত সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশ বলিয়া কোন ব্যাপার না থাকিলে দেশাতীত শব্দের কি কোন অর্থ হয়? দেশ ব্রহ্মাশ্রিত বটে, কিন্তু আশ্রয় আশ্রিতের এই ভেদ টুকু আবশ্যক, ইটী না থাকিলে 'দেশাতীত' শব্দের কোন অর্থ থাকে না। তেমনি, ব্রহ্ম কালাতীত, অপরিবর্ত্তনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু কাল না থাকিলে পরিবর্ত্তন না থাকিলে, 'কালাতীত' 'অপরিবর্ত্তনীয়' শব্দের কোন অর্থ নাই। ব্রহ্ম এক অখণ্ড, ইহা সত্য বটে, কিন্তু 'বহু' ও 'খণ্ডিত' বিশেষণে বিশেষিত কোন ব্যাপার না থাকিলে 'এক' শব্দের, 'অখণ্ড' শব্দের, কি কোনও অর্থ হইতে পারে? এই রূপে দেখা যায়, ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও তাঁহার আশ্রিত এক প্রকার সূক্ষ্ম ভেদ মানিতে হয়।

মায়াবাদী বলেন আমি বস্তুগত ভেদই মানি না, স্বরূপগত ভেদই মানি না। কিন্তু ব্রহ্মের সত্যংজ্ঞানমনন্তং স্বরূপ এবং তাঁহার জগৎপ্রসারিণী শক্তি, এই দুয়ের প্রভেদ আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এই প্রভেদকে আমি ব্রহ্মের স্বগত ভেদ বলি না, দ্বৈতভাব বলি না; কারণ ব্রহ্মের এই জগৎপ্রসারিণী শক্তি আছে বলিয়া যে তিনি ভিন্ন হইয়া যান, দ্বৈত হইয়া যান, তাহা নহে; ইহা থাকাতেও তিনি অভেদ অদ্বিতীয়ই থাকেন। ব্রহ্মের এই শক্তি, যে শক্তিতে ব্রহ্মের আশ্রয়ে অসংখ্য জগৎব্যাপার উৎপন্ন হয়, এই শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক্, আমি ইহাকে নিত্য বলিয়া মনে করি, এবং যে অসংখ্য বিচিত্র জগৎব্যাপার ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই নিত্য কাল ইহাতে বর্ত্তমান থাকে, প্রলয় কালে অব্যক্তরূপে, বীজাকারে, সৃষ্টিকালে ব্যক্তরূপে, পরিস্ফুটাকারে বর্ত্তমান থাকে, ইহাই বলি। কিন্তু এই শক্তির অস্তিত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য হইলেও, ভাবিয়া দেখ, ইহা নিতান্ত অবোধ্য,

ইহা অব্যক্তা, অনির্ব্বচনীয়া। যাহার স্বভাবই হচ্ছে বহু সসীম ও অনিত্য ব্যাপাররূপে প্রতিভাত হওয়া, তাহাকে অদ্বিতীয় অসীম ও নিত্য বস্তুর সহিত এক মনে করা কি রকম? আবার, বহু, সসীম ও অনিত্য ব্যাপারসমূহ স্বতন্ত্র-রূপে বর্ত্তমান, এক অসীম ও নিত্য বস্তুর অধীন নহে—ইহাও অভাবনীয়। তাই বলিতেছি, এই শক্তি অব্যক্তা, অনির্ব্বচনীয়া। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অসীম, নিত্য ও অদ্বৈত বস্তু স্বরূপবিচ্যুত না হইয়া কিরূপে সসীম অনিত্য ও বহুরূপে প্রতীয়মান হন, ইহা সম্পূর্ণরূপেই অবোধ্য ব্যাপার। তিনি প্রকৃত পক্ষে এরূপ কিছুই হন না, হন বলিয়া আমাদের বোধ হয় মাত্র। এই জন্যই আমি বলি এই ভেদ প্রকৃত নহে, আপাত, মায়া শক্তি-কৃত, এবং এই জন্যই আমি ব্রহ্মের স্বগত ভেদ, স্বরূপগত ভেদ স্বীকার করি না।

আমাদের ধারণা এই যে মায়াবাদ ও পরিণামবাদ যতক্ষণ স্থূলাকারে থাকে, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে স্পষ্ট ভেদ থাকে; কিন্তু যখন উভয়ই সূক্ষ্মাকার ধারণ করে, তখন তাহাদের মধ্যে যে ভেদ থাকে, তাহা প্রকৃত ভেদ নহে, সে ভেদ কেবল শব্দগত।

আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে মহাত্মা শঙ্করকৃত সূত্র-ভাষ্য হইতে কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পাঠক দেখিবেন আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা শঙ্কর-প্রচারিত মতেরই কথঞ্চিৎ বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র।

১। অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ। (প্রথমাধ্যায়, চতুর্থ পাদ, তৃতীয় সূত্র।) অর্থাৎ সেই মায়া অব্যক্তা, যে হেতু ইহার সহিত ব্রহ্মের একত্ব বা অন্যত্ব কিছুই নিরূপণ করা যায় না।

২। নহ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্। নহি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাদিতাবোচাম। (২।১।১৪)। অর্থাৎ একই ব্রহ্মের পরিণামধর্ম্ম এবং তদ্রহিতত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। যে হেতু কূটস্থ ব্রহ্মের পক্ষে স্থিতি ও গতির ন্যায় অনেক গুণের আশ্রয় হওয়া সম্ভব নহে। আমরা বলি, সর্ব্ব বিক্রিয়া প্রতিষেধবশতঃ ব্রহ্ম কূটস্থ ও নিত্য।

অপিচ, নৈবাত্র বিবদিতাবং কথমেকস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেক-কারা সৃষ্টি স্যাদিতি, যত আত্মন্য প্যেকস্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেক-

ক্ষায়া সৃষ্টিঃ পঠ্যতে, 'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদিনা। লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদিসৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথৈকস্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি। (২।১।২৮)। অর্থাৎ—এই বিষয়ে এই আপত্তি উঠিতে পারে না যে, একমাত্র ব্রহ্মে স্বরূপ বিনাশ-ব্যতীতও কিরূপে অনেকাকারা সৃষ্টি হইতে পারে? কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, স্বপ্নদ্রষ্টা একমাত্র আত্মাতে স্বরূপবিনাশ ব্যতিরেকেও অনেকাকারা সৃষ্টি হয়, যথা, 'সেখানে (অর্থাৎ স্বপ্নে) রথ নাই, রথবাহী অশ্ব নাই, পথ নাই, অথচ আত্মা রথ, অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করে,' ইত্যাদি। সংসারেও দেখা যায় দেবতা ও মায়াবী প্রভৃতিতে স্বরূপবিনাশ ব্যতিরেকেও বিচিত্র হস্তী অশ্বাদির সৃষ্টি হয়; তেমনি একমাত্র ব্রহ্মেও স্বরূপবিনাশ ব্যতিরেকেই অনেকাকারা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যথা হি অসম্বিভাগেঽপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞান-প্রতিবদ্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ স্থিতৌ দৃশ্যতে, এবমপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞান-প্রতিবদ্ধৈব বিভাগ-শক্তিরনুমাস্যতে। (২।১।৯)। অর্থাৎ যেমন দেখা যায় যে অখণ্ড পরমাত্মাতে মিথ্যাজ্ঞানজাত ব্যাবহারিক বিভাগ স্বপ্নবৎ অব্যাহত থাকে, তেমনি অনুমান করিতে হইবে যে প্রলয়কালেও মিথ্যাজ্ঞান-জাতা বিভাগশক্তি বর্ত্তমান থাকে।

ষ্টোয়িক দর্শন।

প্রাচীন গ্রীসে প্লেতো ও আরিস্ততলের প্রতিভা-সূর্য্য অস্তমিত হইলে ষ্টোয়িকগণের যত্নরক্ষিত দর্শনালোকেই তত্রত্য জ্ঞানজগৎ আলোকিত ছিল। ষ্টোয়িকগণ যেমন গভীর চিন্তাশীল, তেমনই একান্ত সাধন-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের জীবন অতি নির্ম্মল ও উৎসাহপূর্ণ ছিল, এবং তাঁহারা সাধারণের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন।

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাইপ্রস্-দ্বীপবাসী জীনো খৃঃ পূঃ ৩৪০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ বৎসর কাল নানা গুরুর অধীনে দর্শনাধ্যয়ন

করেন, তৎপর পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতে অতৃপ্ত হইয়া নূতন দর্শন-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেই উদ্দেশ্যে এথেন্স নগরে আগমনপূর্ব্বক একটি গুম্বজাকার সুচিত্রিত উদ্যানবাটী ("ষ্টোয়া পিসাইলি") নির্ম্মাণ করিয়া তথায় দর্শন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এই বাটীর নাম হইতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দর্শনসম্প্রদায়ের নামকরণ হয়। কথিত আছে, তিনি ক্রমান্বয়ে ৫০ বৎসর ষ্টোয়া-মন্দিরে দর্শনাধ্যাপনা করেন এবং অতি পরিণত বয়সে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। জীনোর জীবনের পবিত্রতা ও বৈরাগ্য এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে তাঁহার স্মরণার্থ নির্ম্মিত মন্দিরের উপর এই প্রশংসাবাক্য খোদিত ছিল,—"তদীয় জীবন তৎপ্রদত্ত উপদেশানুরূপ ছিল।" জীনোর পর এশিয়া মাইনার নিবাসী ভক্তিপরায়ণ ক্লীন্‌থিস্, এবং তৎপর সিলিশিয়াবাসী ঋষি ক্রাইসিপাস্ এই সম্প্রদায়ের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। খৃঃ পূঃ ২০৮ অব্দে ক্রাইসিপাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ ষ্টোয়িক মতের গুরুশ্রেণীর শেষ হয়; পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মত অন্য মতের সহিত অনেক পরিমাণে মিশ্রিত ছিল। ঋষি ক্রাইসিপাস্ জনসাধারণের এমন গভীর ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে এক প্রকার অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করা হইত। তাঁহার কার্য্যোদ্যমও অতি বিস্ময়কর ছিল। কথিত আছে তিনি ৭০৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ, বিশেষতঃ প্লেতো ও আরিস্ততল, জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে বুদ্ধির কার্য্যকারিতাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে বুদ্ধি নিজ শক্তিপ্রভাবে নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করে,এবং এই সকল তত্ত্বই জ্ঞানের প্রধান অংশ। বুদ্ধির নিজশক্তিজাত তত্ত্বসমূহ অনেক স্থলেই প্রকৃত তত্ত্ব হইতে ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কাবশতঃ ষ্টোয়িক দার্শনিকগণ প্রকৃত তত্ত্বলাভ সম্বন্ধে প্রধানতঃ প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। তাঁহাদের মতে জ্ঞানের মূলোপকরণ প্রাকৃতিক শক্তিজাত, ইন্দ্রিয়বোধযোগে আনীত বিজ্ঞানাবলী। এই প্রত্যক্ষ-লব্ধ বিজ্ঞানসমূহকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া বুদ্ধি নানা তত্ত্ব গঠন করে। প্রকৃত তত্ত্বের সহিত বুদ্ধিকল্পিত ভ্রান্ত তত্ত্ব মিশ্রিত হইতে পারে,সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্ত্বের নির্ম্মলতা রক্ষার উপায় আছে। বিশুদ্ধ তত্ত্বের একটি অভ্রান্ত লক্ষণ আছে; সেই লক্ষণ—অপরিহার্য্যতা, অবশ্য-

বিশ্বসনীয়তা। যে তত্ত্ব প্রভূত বলের সহিত বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধিকে তৎসত্যতা স্বীকারে বাধ্য করে, বুঝিতে হইবে সেই তত্ত্ব কল্পনাজাত নহে, উহা প্রকৃতিজাত, বস্তুজাত, অকাট্য সত্য। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বোধ এবং এই অবশ্য বিশ্বসনীয়তা, এই দুই উপায়াপেক্ষা জ্ঞানলাভের কোন শ্রেষ্ঠতর উপায় ষ্টোয়িকগণ দেখিতে পান নাই।

কিন্তু বিষয়ী হইতে ভিন্ন বিষয়জগৎ কিরূপে বিষয়ীর উপর কার্য্য করে, কিরূপে তাহাতে জ্ঞানোৎপাদন করে? ষ্টোয়িকগণ এই প্রশ্নের এই সহজ মীমাংসা করেন যে, বিষয় বিষয়ীতে মূলে কোন প্রভেদ নাই, বিষয় ও বিষয়ী মূলে একই বস্তু। তাঁহাদের মতে ভিন্ন প্রকৃতিশালী বস্তুসমূহ কখনও পরস্পরের উপর কার্য্য করিতে পারে না। বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর ভিন্ন নহে, একই বস্তু, সুতরাং ইহাদের পরস্পরের উপর কার্য্য করাতে কিছুই রহস্য নাই। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অশরীরী আত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই, সত্য বস্তু সমুদায়ই শরীরী, তবে শরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

ঈদৃশ মূল সূত্র হইতে ষ্টোয়িকগণ সহজেই অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ব দার্শনিকগণ, বিশেষতঃ আরিস্ততল, ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবগত ভিন্নতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এরূপ ভিন্নতা থাকিলে ঈশ্বরের পক্ষে প্রকৃতির উপর কার্য্য করা অসম্ভব হইত, এই যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ষ্টোয়িকগণ এই ভিন্নতা অস্বীকার করিলেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর ও প্রকৃতি একই বস্তুর দুটি দিক্ মাত্র। প্রকৃতি শরীর, ঈশ্বর সেই শরীরানুপ্রবিষ্ট আত্মা। প্রকৃতি ঐশী শক্তির নিষ্ক্রিয় অধিষ্ঠান, ঈশ্বর প্রকৃতির আশ্রয় ও পরিচালক। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে সমুদায় জগৎ পরিচালন ও শাসন করিতেছেন। জগতের কোন বস্তুই স্বতন্ত্র নহে, সমুদায়ই ঈশ্বরের অপ্রতিহত শাসনাধীন। জগতের কোন অংশই ঈশ্বরাভির্ভাবশূন্য নহে, কোন অংশই নিরর্থক, উদ্দেশ্যবিহীন নহে। যাহা আপাততঃ অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয়, তাহাও প্রকৃত পক্ষে মঙ্গলের সোপান মাত্র।

ষ্টোয়িকদিগের নীতিবিজ্ঞান অতি গভীর ছিল। এস্থলে অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে। সমগ্র জগৎ যখন এক, তখন সমষ্টির মঙ্গলই প্রত্যেক ব্যক্তির অনুসরণীয়; সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত বাসনা পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মই

একমাত্র শ্রেয়ঃ এবং প্রকৃত সুখের নিদান। সাংসারিক আপাতসুখকর বস্তু সমূহ যে পরিমাণে ধর্ম্মের সহায়, সেই পরিমাণেই গ্রহণীয়, সুখের জন্য সুখ অন্বেষ্টব্য নহে। ধর্ম্মজগতে সাংসারিক বস্তুর কোন মূল্য নাই। ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী জীবনই ধর্ম্মজীবন, নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্যই পাপ। পাপ পুণ্য পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী। পাপ পুণ্যের মধ্যবর্ত্তী কিছু নাই, এবং ভিন্ন ভিন্ন পাপ ও ভিন্ন ভিন্ন পুণ্যের কোন তারতম্য নাই। সকল পুণ্যই সমান প্রশংসনীয়, সকল পাপই সমান নিন্দনীয়। মানবসমাজ প্রকৃত পক্ষে এক পরিবার, এবং সকলে এক বিধির অধীন এক অখণ্ড পরিবার-ভুক্ত হওয়াই আদর্শ, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অস্তিত্ব প্রকৃত সামাজিক আদর্শবিরুদ্ধ। ষ্টোয়িকগণ প্রকৃত জ্ঞানীর একটী অতি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিতেন; ইহাতে জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রীতি, শান্তি, স্বাধীন ভাব, আন্তরিক আনন্দ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণ সংযোজিত করিতেন, এবং এই উচ্চ আদর্শানুরূপ জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিতেন।
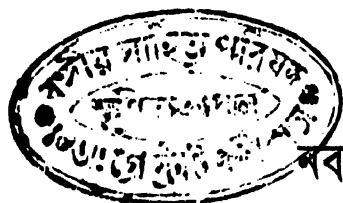
নব-প্লেতনিক মত।

মহামতি প্লেতো ব্রহ্ম বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দার্শনিক মত রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তিনি জ্ঞান ও অস্তিত্বতত্ত্ব সম্বন্ধে সে সকল গভীর চিন্তা প্রচারিত ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যার উপর পরবর্ত্তী সময়ে কেবল একটী ধর্ম্মদর্শন নহে, একটী প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা যিশুখৃষ্টের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দি পর্য্যন্ত এই মত ও সম্প্রদায়ের জীবৎ কাল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে, এই সম্প্রদায়ের কোন কোন বিভাগ প্রবলরূপে সেই ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়, এবং যখন সেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তখন এই দার্শনিক মত অনেক পরিমাণে সেই ধর্ম্ম মতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। দুই মতের বিবাদে কোন্ মত

জয়যুক্ত হইল স্থির করা কঠিন। আপাততঃ খৃষ্টীয় মতই জয়লাভ করিল বোধ হয়, কিন্তু ইহা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না, যে খৃষ্টীয় মতের নৈতিক ও সামাজিক ভাব জয়যুক্ত হইল, কিন্তু প্রাচীনতর সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত ও উচ্চ সাধনাঙ্গ খৃষ্টীয় মতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিরূপে দণ্ডায়মান হইল, এমন কি, সাধারণ চলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিতরেও প্রবিষ্ট হইল। খৃষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস, এবং পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিনে এক, একে তিন,—এই 'ত্রিনীতিবাদ' উক্ত দার্শনিক মতেরই কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র।

এই মতের নাম নব-প্লেতনিক মত। ইহার দার্শনিকাংশ প্লেতোর মতের নূতন ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাই ইহার এই নাম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা অমিশ্রিত গ্রীশীয় মত নহে, ইহার সহিত ইহুদীয় ভাব বহুলরূপে মিশ্রিত। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য ভাবের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। উপরি-উক্ত সময়ে আলেগজেন্দ্রিয়া নগর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তা-স্রোতের একটী প্রধান মিলন স্থান ছিল। সেখানেই এই মত প্রথমে প্রচারিত হয়। উক্ত নগরবাসী ধীমান ফাইলো প্রথমে এই মত প্রচার করেন। তিনি ইহুদী কুলোদ্ভব, এবং একদিকে স্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, অপর দিকে গ্রীশীয় দর্শন, উভয় বিধ শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন। গ্রীকসুলভ প্রখর বুদ্ধি এবং ইহুদীদেশসিদ্ধ স্বাভাবিক সরল বিশ্বাস, উভয়ই তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার প্রচারিত দর্শনেও দুই দিকের ঘনিষ্ট সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী আচার্য্যদিগের মতেও এই সম্মিলন সুরক্ষিত হয়। কিন্তু ফাইলোর পরবর্ত্তী সময়ে এই মত আর ইহুদী চিন্তার সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত রহিল না ; ইহা গ্রীক চিন্তা বলিয়াই প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আচার্য্য মিশরবাসী প্লটিনাস্। তিনি ২০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪০ বৎসর বয়স হইতে রোম নগরে তদীয় দর্শনাধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মধ্যে পরফাইরি, য়াম্‌ব্লিকাস্ ও প্রক্লাস্ প্রসিদ্ধ। ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রক্লাসের মৃত্যু হয়। ষষ্ঠ শতাব্দির মধ্যেই নবপ্লেতনিক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

ষ্টোয়িকগণের পর কতিপয় সন্দেহবাদী দার্শনিক আবির্ভূত হইয়া চিন্তাজগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে,

কোন বিষয়েই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই সন্দেহবাদে ঈশ্বরবিশ্বাসকেও বিপর্য্যস্ত করে। সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ দার্শনিকগণ ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিরূপে ধর্ম্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিবেন। ফাইলো বলিলেন, বুদ্ধি ব্রহ্মকে ধরিতে পারে না ইহা ঠিক। বুদ্ধি সসীম আত্মার বৃত্তি, ইহা অসীমকে কিরূপে ধারণ করিবে? কিন্তু ব্রহ্মপ্রত্যয় অনপনেয়, বুদ্ধি তাঁহাকে না পাইলেও বিশ্বাস তাঁহার কথা বলিতে ছাড়ে না। কিন্তু বিশ্বাস ব্রহ্মাস্তিত্বের প্রমাণ দিতে সক্ষম হইলে ও ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারেন না। ব্রহ্মবিষয়ক স্বাভাবিক বিশ্বাসে কেবল এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় যে জগতের কারণরূপী এক পূর্ণ অনন্ত বস্তু আছেন। এই বস্তু কিরূপ তাহা বিশ্বাসও বলিতে পারে না। ফলতঃ ব্রহ্মানুভূতি মানবীয় ব্যাপার নহে, ইহা ব্রহ্মকৃপার ফল। ব্রহ্ম নিজগুণে স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে মানব তাঁহাকে জানিতে পারে না। কিন্তু প্রকাশিত হওয়া, আত্মপ্রকাশ করা, ইহা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার প্রথম প্রকাশ শব্দ রূপে। এই 'শব্দ' ("লোগস্") কথাটি অতি গভীর অর্থযুক্ত। শব্দের দুই দিক—অন্তর ও বাহির। অন্তরের দিকে শব্দ অতীন্দ্রিয়, জ্ঞানরূপ, বাহিরের দিকে শব্দ স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর। ব্রহ্মের এই শব্দরূপ আবির্ভাবই জগতের সাক্ষাৎ কারণ, এবং ব্রহ্ম ও মানবাত্মার যোগের হেতু। এই শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্মের সহিত স্বরূপে এক, প্রকাশে ভিন্ন। ইনি পরব্রহ্মের অনাদি পুত্র। ইহার বাহ্য প্রকাশই ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ। শব্দব্রহ্ম যেমন পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অথচ তাঁহার সহিত এক, জগৎও তেমনি শব্দব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অথচ তাঁহার সহিত এক। জগৎকে ফাইলো 'অপর ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। শব্দব্রহ্মে সমুদায় জাগত বস্তু চিন্তারূপে, আদর্শরূপে বর্ত্তমান, জগৎরূপ অপর ব্রহ্মে সেই সকল চিন্তারূপ আদর্শ স্থূল বস্তুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মানব ব্রহ্মের সহিত এক অথচ তাহা হইতে ভিন্ন। মূলে সমুদায়ই ব্রহ্মের সহিত এক, প্রভেদ কেবল প্রকাশে। মানবের জ্ঞানাংশ শব্দব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকাশ, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্ত্যাদি স্থূল জগতের অংশ। পবিত্র জীবন ও ভক্তিসাধনদ্বারা মানব ব্রহ্মকৃপা লাভ করে, এবং বিশুদ্ধ অনুভব যোগে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত একীভূত হয়।

বেদান্ত মতের সহিত ফাইলো ও তৎপরবর্ত্তী নব প্লেতনিকদিগের মতের

সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু এই সৌসাদৃশ্য ভারত ও মিশরের সাক্ষাৎ আদান প্রদানজনিত, অথবা কেবল চিন্তা-বিকাশের সাধারণ ও সার্ব্বভৌমিক নিয়মের ফল, এই প্রশ্নের সম্যক্ মীমাংসার উপায় নাই। যাহা হউক, ফাইলো ও গ্রীক নব-প্লেতনিকগণ গভীর চিন্তাশীল জ্ঞানী হইয়াও আপন আপন দেশীয় শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। তবে জ্ঞানীর পক্ষে লৌকিক মত যেরূপে গ্রহণ করা সম্ভব, তাঁহারা সেরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফাইলো ইহুদী শাস্ত্রের এবং গ্রীক নব-প্লেতনিকগণ তাঁহাদের স্বদেশীয় দেবতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিতেন। ফাইলোর মতে আদম, ইভা, এব্রাহেম, সারা, আইজাক, কেইন—সকলেই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। তেমনি প্লটিনাস প্রভৃতির মতে জুপিটার, ইউরেনাস প্রভৃতি গ্রীক দেবতাগণ বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সত্যপ্রকাশক রূপক মাত্র।

এখন আমরা প্লটিনাসের মত ব্যাখ্যা করিব। প্লটিনাসের মতে ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিগত জ্ঞান সম্যক জ্ঞান নহে। বুদ্ধিগত জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম ভেদ-রহিত, অখণ্ড, অদ্বিতীয়। যে জ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। সেই জ্ঞান অনুভবস্বরূপ। এই অনুভবরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানেই সমুদায় সন্দেহ ও অশান্তি দূর হয়। এই অনুভব কোন জীবঘটিত ব্যাপার নহে; ইহাতে যে জীব জ্ঞাতা এবং ব্রহ্ম জ্ঞেয় তাহা নহে। ইহা বিষয় বিষয়ীর ভেদাতীত অভেদ পরব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ; ইহাতে ব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানেন। এই অনুভব অনুপম আনন্দের নিদান। এই আনন্দ লাভ করিলে অপর সকল বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এমন কি দ্বৈতভাবাত্মক উচ্চতম বিজ্ঞানেও স্পৃহা থাকে না।

অনুভব, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ্ঞান—এই ত্রিবিধ জ্ঞানের বিষয়রূপে ব্রহ্মের তিনটী ভাব আছে। অনুভবগোচর উচ্চতম ভাব যাহা, তাহা অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়। ইহা এক, অদ্বিতীয়, পূর্ণ, অনন্ত, ইহা ব্যতীত উহার সম্বন্ধে যাহা বলিতে যাওয়া যায়, তাহাতেই ইহাকে সসীম করিয়া ফেলা হয়। বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি গুণও ইহাতে আরোপিত হইতে পারে না, কারণ এই সমস্তও দ্বৈতভাবব্যঞ্জক, সসীম ভাবসূচক। বুদ্ধিজাত উচ্চতম ভাবসমূহও, এমন কি ব্যাবহারিক অর্থে 'সত্তা'ও ইহাতে আরোপিত হইতে পারে না।

এই অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, পূর্ণ, অখণ্ড বস্তু হইতে, অগ্নি হইতে উত্তাপোৎপত্তির ন্যায়, হিমশিলা হইতে শিলোৎপত্তির ন্যায়, সুগন্ধি পুষ্পাদি হইতে ঘ্রাণোৎপত্তির ন্যায়, পূর্ণাবয়ব জীব হইতে জীবান্তর উৎপত্তির ন্যায়, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ শব্দব্রহ্ম সম্ভূত হন, কিন্তু এই সম্ভব জাগত ঘটনাবৎ ক্ষণিক ব্যাপার নহে, ইহা অনাদি, অনন্ত ব্যাপার। আর, ইহাতে পূর্ণ অখণ্ড বস্তু কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত বা ক্ষুণ্ণ হন না। এই শব্দব্রহ্ম দেশে অনন্ত, কালে নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জগতের আধার, কারণ ও নিয়ন্তা। এই বিশাল জগতের আশ্চর্য্য নিয়ম শৃঙ্খলা তাঁহার অনুপম জ্ঞান, শক্তি ও মহিমার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

অখণ্ড অদ্বৈত বস্তু হইতে শব্দব্রহ্মের সম্ভবের ন্যায়, আবার শব্দব্রহ্ম হইতে বিশ্বাত্মা সম্ভূত হন। সম্ভব-প্রণালী উভয় স্থলে একইরূপ, ইহাতে কারণের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় না। যাহা হউক, বিশ্বাত্মা শব্দব্রহ্মে পূর্ণ হইয়া তদাশ্রিত জগদাদর্শ সমূহকে স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর আকারে পরিণত করেন, এবং সমুদয় সৃষ্ট বস্তুতে ব্যাপ্ত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন। জড়জগৎ তাঁহার বাহ্য প্রকাশ এবং সৃষ্টিক্রমের নিম্নতম সোপান।

মানবজীবনে ব্রহ্মের উপরি-উক্ত ত্রিবিধ প্রকাশই বিদ্যমান। মানব মূলে ব্রহ্মের সহিত এক, এবং মূলে এক থাকিয়াই অনতিক্রমণীয় নিয়তিবশে সংসার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, জড়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। কঠোর বৈরাগ্যদ্বারা, বিষয়ে অনাসক্তি দ্বারা, এই বন্ধন মোচন হয় এবং মানব বিশুদ্ধ বুদ্ধির রাজ্যে প্রবেশ করে। সেই বুদ্ধির রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সে ক্রমশঃ সাধনপ্রভাবে সমুদায় কামনার পরিসমাপ্তিরূপ পরমানন্দময় ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।
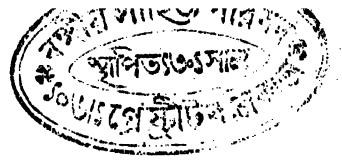
ব্রহ্মবাদ—বৈদিক ও অবৈদিক। *

(১)

যে ধর্ম্মে ব্রহ্ম স্বীকৃত হন সেই ধর্ম্মের নাম ব্রহ্মবাদ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম। 'ব্রহ্ম' অর্থ জগতের জ্ঞানবান্ কারণ। জগৎ ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে দ্বিবিধ। দেশ ও কাল লইয়া ভৌতিক জগৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া আধ্যাত্মিক জগৎ। দেশ-কাল-গত জগতের কারণ যিনি, তিনি দেশ কালের সীমাতীত, তিনি অনাদি অনন্ত, অদ্বিতীয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা যিনি, তিনি পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ, পূর্ণ পবিত্র-স্বরূপ। এই অনন্ত পূর্ণব্রহ্ম যে ধর্ম্মে স্বীকৃত হন, এই অনন্ত পূর্ণব্রহ্মকে লাভ করা যে ধর্ম্মের লক্ষ্য, সেই ধর্ম্মই ব্রহ্মবাদ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম।

এই অনন্ত পূর্ণব্রহ্ম স্বীকাররূপ মূলসত্যের কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী শাখা-সত্য আছে, সেই শাখা-সত্যগুলি মূলসত্যেরই ব্যাখ্যা, বিকাশ বা তৎপ্রসূত সিদ্ধান্ত; সেগুলি না মানিলে মূলসত্যে আঘাত পড়ে, এবং প্রমাণ হয় যে মূল-সত্য প্রকৃতরূপে স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং সেগুলিও ব্রহ্মবাদের অঙ্গ। এরূপ শাখাসত্যের মধ্যে কয়েকটী এই;—

১। জড় অস্বতন্ত্র, ব্রহ্ম-পরতন্ত্র। জড়কে স্বাধীন স্বতন্ত্র বলিলে বলা হয়, ব্রহ্ম জড়ের স্থিতির কারণ নহেন, সুতরাং ব্রহ্মের কারণত্ব আংশিকরূপে অস্বীকৃত হয়।

২। জীবচৈতন্য অস্বতন্ত্র, ব্রহ্ম-পরতন্ত্র; ব্রহ্ম ইহার প্রাণ। ইহাকে স্বতন্ত্র বলিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষই ঘটে।

---

* এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশ ইতিপূর্ব্বে "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩। ব্রহ্মজ্ঞান সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ। ব্রহ্ম অনন্ত অনুপম বস্তু, তাঁহাকে না জানিয়া অন্য বস্তুর উপমায়, পরোক্ষ গুরূপদেশে, কদাচ তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হইতে পারে না।

৪। ব্রহ্ম স্বয়ং পরিত্রাতা, পরিত্রাণে মধ্যবর্ত্তী নাই। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ব্যতীত পরিত্রাণ অসম্ভব। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার কেবল স্বয়ং ব্রহ্মই করাইতে পারেন, মানব গুরু করাইতে পারেন না, সুতরাং মানবগুরু পরিত্রাতা বা মধ্যবর্ত্তী নহেন।

৫। জীবাত্মা অমর ও উন্নতিশীল, যেহেতু জীবের পরিত্রাণ ও উন্নতি মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মের ঈপ্সিত।

এরূপ শাখাসত্য আরো থাকিতে পারে ও আছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় এরূপ যত সত্য আবিষ্কৃত হয়, ততই ব্রহ্মবাদের অঙ্গ-পুষ্টি হয়। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে উপরি-উক্ত কয়টাই যথেষ্ট।

এখন দেখা যাক্ প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে এই সকল মূল ও শাখা-সত্যসমূহ কতদূর আবিষ্কৃত ও গৃহীত হইয়াছে। ইহা বলা এক প্রকার বাহুল্য যে, বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থায় জগৎকারণের একত্ব ও অনন্তত্ব স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় নাই; সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মের প্রথমাবস্থাকে ব্রহ্মবাদ বলা যাইতে পারে না। ইহুদী ধর্ম্মকে একপ্রকার একেশ্বরবাদ বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে ব্রহ্মবাদ বলা যাইতে পারে না। ইহার ঈশ্বর জগতের বাহিরে, জগতে ব্যাপ্ত ও অনুপ্রবিষ্ট নহেন। তিনি স্বর্গবাসী; বিশেষ দেশে আবদ্ধ। মানব তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ও দূরে। ঋষি ও পুরোহিতগণ এবং বাহ্য শাস্ত্র উপাসক ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী। ঈশ্বর ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসা-পরবশ, তাঁহার প্রেমের ভাব ও মানবের অমরত্বের ভাব অপরিস্ফুট। এরূপ ধর্ম্মকে কথনও ব্রহ্মবাদ বলা যাইতে পারে না।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্মেরই সন্তান। ইহাতে ঈশ্বরের প্রেম ও মানবের অমরত্বের ভাব অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও পূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। ঈশ্বর স্বর্গেই আছেন, মানব ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্রই আছে, ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-লাভ বাহ্য শাস্ত্র ও বাহ্য গুরু-সাপেক্ষই রহিয়াছে, এবং ঈশ্বরের ক্রোধ ও ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী পাপ পুরুষের হাত হইতে

মানবকে রক্ষা করিবার জন্য এক নরেশ্বর কল্পিত হইয়াছেন। এরূপ মতও ব্রহ্মবাদ হইতে অনেক দূরে।

মুসলমানধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহার ঈশ্বর খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরাপেক্ষা জগৎ ও মানবের কিছুই নিকটতর নহেন। ইহা ত্রিত্ববাদ অগ্রাহ্য করিয়া বিশুদ্ধতর একেশ্বরবাদের সম্মান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ এই মত অগ্রাহ্য করিয়া ইহা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং দরিদ্রই হইয়াছে। ত্রিত্ব-বাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতে যে গভীর সত্যের আভাস আছে, ইহা তাহা হইতে বঞ্চিত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে তিনটী ধর্ম্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম বলিয়া আধুনিক সভ্য জগতে সম্মানিত, সে ধর্ম্মত্রয় প্রকৃত ব্রহ্মবাদ নহে। এই সকল ধর্ম্ম এক ভিন্ন দুই ঈশ্বর স্বীকার করে না বটে, কিন্তু জগৎ কারণের অনন্তত্ব ও অদ্বিতী-য়ত্ব ইহারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইহারা জড়, জীব, শয়তান, দণ্ড, পুরস্কার, গুরু, মধ্যবর্ত্তী প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরূপ মত পোষণ করে, তাহাতে পদে পদেই ব্রহ্মের অনন্তত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণতায় আঘাত পড়ে।

উপরি-উক্ত ধর্ম্মত্রয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, এদেশের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত সম্বন্ধে তাহা সম্পূর্ণরূপে এবং তদপেক্ষাও অধিকতররূপে খাটে। সুতরাং তদ্বিষয়ের স্বতন্ত্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে স্থলে পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মত বেদান্তানুসারী, সে স্থলে এই সকল কথা খাটে না।

জগতের প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে আমরা কেবল একটীকেই ব্রহ্মবাদ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। সেটী বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম। প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে কেবল ইহাই ব্রহ্মের অনন্তত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব স্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে। উপরি-উক্ত শাখা-সত্য সমূহেরও প্রত্যেকটী ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা কয়েকটী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে তাহা দেখাইতেছি।

১। জগতের জ্ঞানাধীনতা।—সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। (ঐতরেয়, ৩।৩)। অর্থাৎ—সমুদয় প্রজ্ঞা-চালিত, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। জগৎ প্রজ্ঞা-চালিত, প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠ। প্রজ্ঞান ব্রহ্ম।

২। জীবের ব্রহ্মাধীনতা।—এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে। (প্রশ্ন, ৪।৯)। অর্থাৎ—এই যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তিনি অক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

৩। ব্রহ্মজ্ঞানের অপরোক্ষতা।—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ (মুণ্ডক, ৩।১।৮)। অর্থাৎ—নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃ-করণ হইয়া সাধক অতঃপর ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

৪। ব্রহ্ম স্বয়ং পরিত্রাতা।—মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১২)। অর্থাৎ—পুরুষই (অর্থাৎ পরমাত্মাই) মহান্ প্রভু; ইনি অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক, সুনির্ম্মল পরম পদ প্রাপ্তির নিয়ন্তা, জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয়। পুনশ্চ—তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। (২।৮)। অর্থাৎ—তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; অমৃতত্ব প্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

৫। আত্মার অমরত্ব ও উন্নতিশীলতা।—বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (শ্বেতাশ্বতর,৫।৯)। অর্থাৎ——জীব কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া বিজ্ঞেয়। অথচ সে আনন্ত্য প্রাপ্তির জন্য অভিপ্রেত।

কিন্তু ব্রহ্মবাদ বেদাধ্যায়ী ও বেদানুগ ব্যক্তিদের মধ্যে আবদ্ধ নহে। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় সময়েই, নানা দেশে চিন্তাশীল সাধকগণ নিজ সাধনবলে ব্রহ্মবাদ আবিষ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মবাদ নানা আকারে ও নানা নামে প্রচারিত হইতেছে। এই বেদনিরপেক্ষ ব্রহ্মবাদকেই আমরা অবৈদিক নামে অভিহিত করিয়াছি। এই অবৈদিক ব্রহ্মবাদের সহিত বৈদিক ব্রহ্মবাদের কতিপয় প্রভেদ আছে। আমরা দুটী বিশেষ ভিন্নতার উল্লেখ করিতেছি, এবং বৈদিক ব্রহ্মবাদের একটী বিশেষ অভাব প্রদর্শন করিতেছি।

১। বৈদিক ও অবৈদিক ব্রহ্মবাদের একটী ভিন্নতা দেবদেবীতে বিশ্বাস। বৈদিক ব্রহ্মবাদে ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীতে বিশ্বাস দেখা যায়। এই বিশ্বাসকে আপাততঃ ব্রহ্মবাদবিরোধী বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ

তাহা নহে। জগৎ পরস্পর স্বতন্ত্র ও ভিন্ন নানা দেবদেবীর অধীনে আছে, তাঁহাদের সাধারণ কারণ ও নিয়ন্তা কেহ নাই, এই মত বস্তুতঃই অব্রাহ্ম। কিন্তু উপনিষদ্ এই মতের পক্ষ নহেন। উপনিষদ্ সমুদায় দেবতার উপরে এক পরম দেবতা, এক পরব্রহ্ম পরমেশ্বর স্বীকার করেন, যিনি সমুদায় দেবতার, সমুদায় সৃষ্ট জীবের, জ্ঞান ও শক্তির আধার। কেনোপনিষদুক্ত উমারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার উপাখ্যান এবং "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" (কঠ, ৬।৩) এবং "যতশ্চোদেতি সূর্য্যো-ঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥ (কঠ, ৪।৯) অর্থাৎ—যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হন, আর যাঁহাতে অস্ত যান, তাঁহাতে সমুদয় দেবতা স্থিত রহিয়াছেন; তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন না—ইত্যাদি শ্রুতি এই কথার প্রমাণ। এক একটী জড়দেহ প্রকৃতির এক একটী অংশ বা বিভাগ; এই সকল দেহের অভিমানী বা অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরাধীন ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা স্বীকার করা যদি ব্রহ্মবাদ-বিরুদ্ধ না হয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরাশ্রিত শাসনকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যদি ব্রহ্মবাদ-বিরুদ্ধ না হয়, তবে অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভাগে ঈশ্বরাধীন ভিন্ন ভিন্ন দেবতা স্বীকার করাও ব্রহ্মবাদ-বিরুদ্ধ নহে। এই বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক লোকের মধ্যে পার্থক্য এই যে আধুনিকগণ প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাবে অনেকেই এরূপ দেবতায় বিশ্বাস করেন না; মানব-চৈতন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, অথচ ব্রহ্ম-চৈতন্যাপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন চৈতন্য স্বীকার করেন না, প্রাচীনগণ এরূপ প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রাকৃতিক কার্য্যের আপাত-পার্থক্য দেখিয়া, দেব-চৈতন্যে বিশ্বাস করিতেন। আধুনিকদিগের দেবতায় অবিশ্বাস অনেক স্থলে যে কেবল সন্দেহবাদ ও জড়-বাদের ফল, এবং এরূপ সন্দেহবাদ ও জড়বাদ যে মূলে ব্রহ্মবাদেরও বিরোধী, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 'অগ্নি, বায়ু ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি দেবতা নহে কেন?'—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই বলিবেন, 'কারণ ইহারা জড়-শক্তি।' শক্তি যে অচেতন হইতে পারে না, শক্তি মাত্রই যে সচেতন ও ঐশ্বরিক, এই বোধ অনেক আধুনিকেরই নাই, সেই জন্য তাঁহারা যে কেবল দেবতায় বিশ্বাস করেন না তাহা নহে, তাঁহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসও অতি অস্পষ্ট ও

মলিন। ‘অগ্নি, বায়ু বিদ্যুতাদি কেবল জড়ময়’ এই যুক্তিতে যিনি দেবতা অস্বীকার করেন, তাঁহার ঈশ্বর-বিশ্বাসেরও মূলোচ্ছেদ হয়। এরূপ বিজ্ঞানাভিমানযুক্ত, সন্দেহ-মূলক একেশ্বরবাদ ব্রহ্মবাদ হওয়া দূরে থাকুক, ইহা নাস্তিকতা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সূক্ষ্ম জ্ঞান-দৃষ্টিতে জগতের মূলে এক মহৎ আধ্যাত্মিক একতা দেখিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদে উপনীত হওয়া এক কথা; ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মবাদ। এই ব্রহ্মবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেবতায় বিশ্বাস থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। থাকা না থাকার প্রভেদ বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় প্রভেদ, দর্শন বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রভেদ নহে। ব্রহ্মাশ্রিত বহু মানবাত্মায় বিশ্বাস, এবং ব্রহ্মাশ্রিত বহু দেবাত্মায় বিশ্বাস, দর্শন বা ধর্ম্মের চক্ষে এক। কিন্তু ‘ইহা অগ্নি, ইহা জড়, ইহা দেবতা নহে,’ ‘ইহা বায়ু, ইহা জড়, ইহা দেবতা নহে,’ এরূপ ‘নেতি’ ‘নেতি’ প্রণালীর আশ্রয়ে বহুদেববাদ নিরসন করিয়া বিনা প্রমাণে যেন কৃপাপূর্ব্বক, অথবা কেবল নাস্তিকতার নিন্দা ও কষ্ট পরিহার করিবার জন্য, একটী মাত্র দেবতা স্বীকার করা,—ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এরূপ একদেববাদ ব্রহ্মবাদ নহে, এবং ইহার আয়ু অতি অল্প।

বৈদিক ও অবৈদিক ব্রহ্মবাদের আর একটী পার্থক্য স্থল পরলোক-সম্বন্ধীয় মত। বৈদিক ব্রহ্মবাদিগণ জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন। কিন্তু জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় ইহা স্বীকার করিয়াও তাঁহারা জীবের উন্নতি স্বীকার করেন। ইহকালে যেমন জীব নিজ কর্ম্মফলে কখনও উন্নতি, কখনও অবনতি, প্রাপ্ত হয়, পরকালেও তেমনি সে নিজ কর্ম্মফলে কখনও উচ্চ যোনিতে, কখনও নিম্নযোনিতে, জন্ম গ্রহণ করে, এই তাঁহাদের মত। সাময়িক উন্নতি অধোগতি সত্ত্বেও মোটের উপর জীব ক্রমশঃ উন্নতির পথে যাইতেছে, ইহা যেমন সাধারণ বিশ্বাস, উচ্চ নীচ জন্ম সত্ত্বেও ব্রহ্মকৃপাবলে জীব উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিতেছে, ইহা তেমনি বৈদিক ব্রহ্মবাদিগণের বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন, সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবে। এই একত্বের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন বৈদান্তিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেন। “বেদান্তসূত্র”-প্রণেতা,—যিনি বৈদান্তিকদিগের মধ্যে সর্ব্বমান্য,—উপনিষদুক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহার মত এক প্রকার অভ্রান্তরূপে সকল সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক গৃহীত হয়,—তাঁহার মতে জীব ব্রহ্মের একত্বাবস্থায়ও সৃষ্টি-শক্তিতে ভেদ থাকিবে। আবার কোন

কোন ঋষির উক্তি পাঠ করিলে বোধ হয়, তাঁহাদের মতে জীবের জীবত্ব তখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে, অর্থাৎ জীব আদবে থাকিবেই না। উপনিষদে স্পষ্টতঃ প্রথমোক্ত মতেরই প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাবস্থায় জীব ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম-সহবাসে নিত্যানন্দ ভোগ করিবে, ইহাই বৈদিক ব্রহ্মবাদের সাধারণ মত। যাঁহারা জীবত্বলোপের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের কথারও একটী উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্ভব।

এখন অবৈদিক ব্রহ্মবাদের কিছু সমালোচনা করিব। এক প্রকার ব্রহ্মবাদ আছে, যাহাকে কেবল সভ্যতা বা সামাজিকতার অনুরোধে ব্রহ্মবাদ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; বস্তুতঃ তাহা ব্রহ্মবাদ নহে। সে মত এই;—জড় ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। ইহা এক সময় ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। সেই সময়ের কথা আমরা কিছু জানি না, তবে বিশ্বাস করি যে এক সময় ইহা ছিল না, ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র সৃষ্ট হইল। এখন ইহা পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও পূর্ব্ব-সঞ্চারিত শক্তিতে চলিতেছে। জীবও ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, এককালে ইহা ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এবং এখন ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়মে বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রার্থনা-প্রভাবে ইহা সময়ে সময়ে ব্রহ্মশক্তি লাভ করে, অন্য সময় ইহা কতকটা নিজ-তন্ত্র ও কতকটা প্রকৃতি-পরতন্ত্র। এই মতাবলম্বীরা কথায় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা তাহা অস্বীকার করেন। তাঁহারা জগৎ, জীব, ও ব্রহ্মকে পরস্পর এত পৃথক্ পৃথক্ রাখেন যে তাহাতে ব্রহ্মযোগ ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব হয়। অন্ধ বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের নৈকট্য চিন্তা করিয়া হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, কার্য্যতঃ ইহাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হন। তাঁহারা বাহ্য শাস্ত্র মানেন না বটে, কিন্তু প্রচলিত অধিকাংশের মতই তাঁহাদের শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহার বিপক্ষে কোন কথা বলিলে তাঁহারা খড়্গাহস্ত হন। বিধান, ঈশ্বরাদেশ, ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মদর্শন প্রভৃতি তাঁহারা স্পষ্টতঃ অস্বীকার না করুন্, এই সকল বিষয় সর্ব্বদাই তাঁহাদের সন্দেহ ও সমালোচনার বিষয়। জগতে এই সকল বিষয়ের যে অপব্যবহার হইয়াছে, সে দিকেই তাঁহাদের সমগ্র দৃষ্টি, যে ধর্ম্মে এই সমুদায় নাই, সে ধর্ম্ম যে অতি স্থূল ও বাহ্য, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। এরূপ মত যে প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মবাদ নহে, ইহা যে একটা স্থূল একেশ্বরবাদ বা এক-

দেববাদ মাত্র, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। জড়জগৎ ও জীবজগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মযোগকে ভিত্তিশূন্য করিয়া, ইহারা যে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের অনন্তত্ব অস্বীকার করেন, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব হরণ করেন, এই স্থূল কথাটা এই মতাবলম্বী লোকেরা বুঝিতে পারেন না। আমাদের বোধ হয় খ্রীষ্টীয় বা ইউরোপীয় ভাবের অত্যধিক প্রভাবেই এদেশে এই মত স্থান পাইয়াছে। বিশেষতঃ ইউরোপীয় ভাব অন্তরঙ্গ সাধনে বিমুখ ও ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানে পরিতৃপ্ত। এদেশে যে পরিমাণে ইউরোপীয় ভাবের আধিক্য হইয়াছে, সেই পরিমাণে ইহা লোককে গভীর ধ্যান ধারণায় বীতস্পৃহ ও বাহ্যানুষ্ঠানে তৎপর করিয়াছে।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় ও ইউরোপীয় ভাবের প্রভাব এদেশের এক মহদুপকারও সাধন করিয়াছে। এদেশীয় সাধন-প্রণালীর একটী বিশেষ দোষ এই যে ইহাতে সাধককে অল্প বা অধিক পরিমাণে সমাজের প্রতি বীতরাগ করে। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ উভয় মার্গই এবিষয়ে অল্লাধিক দোষী। এদেশীয় ব্রহ্মবাদে ধর্ম্মের সামাজিক দিক্ যথেষ্ট উজ্জ্বলরূপে স্বীকৃত হয় নাই। সামাজিক কর্ত্তব্য ধর্ম্মের ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, ঈশ্বরাধীন হইয়া, করিতে হইবে, এই কথা স্পষ্টরূপেই স্বীকার করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু লব্ধজ্ঞান ব্রহ্মযোগীর পক্ষেও যে কর্ম্ম প্রয়োজন, কর্ম্ম না করিলে যে তাঁহাকেও অপরাধী হইতে হয়, এই সত্য তাদৃশ স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হয় নাই। ভগবদ্গীতায় এই সত্য অনেকটা স্পষ্টরূপেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র এবং দেশের সাধারণ সাধকমণ্ডলী এই সত্য বিশেষরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে যদিও এদেশীয় ব্রহ্মবাদিগণ ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব ও পরিত্রাণপ্রদ শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি, স্বয়ং ঈশ্বরও যে একটী সামাজিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন, পৃথিবীতে নিজ রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশে কার্য্য করিতেছেন, এই সত্য তাঁহারা তাদৃশ স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই। এই সত্য,—পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে এই সঙ্কল্প,—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেই সমধিক উজ্জ্বল, এবং ইউরোপীয় সভ্যতাতেও এই সঙ্কল্প,—আন্তরিক আদর্শানুসারে সমাজকে পুনর্গঠন করিবার সঙ্কল্প—স্থূল ভাবে বর্ত্তমান। তাই বলিতেছিলাম, খ্রীষ্টীয় ও ইউরোপীয় ভাব আমাদের

মধ্যে আসিয়া একটী মহদুপকার সাধন করিয়াছে,—আমাদের সামাজিক উদাসীনতা ও আত্যন্তিক অন্তর্ম্মুখিতায় আঘাত করিয়া আমাদিগকে সমাজের পুনর্গঠনে তৎপর করিয়াছে।

আর একটী অবৈদিক মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব। এদেশে ব্রহ্মবাদ যদি বরাবর বিশুদ্ধ আকারে প্রচারিত হইয়া আসিত, খ্রীষ্টীয় একদেববাদ ও ব্রহ্মবাদ এক বস্তু নহে, ইহা যদি বরাবর বুঝিয়া চলা হইত, ব্রহ্মজ্ঞানার্জ্জনের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া খ্রীষ্টীয় প্রচারক-দিগের ন্যায় কেবল "বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর" বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসের দোহাই না দেওয়া হইত, প্রকাশ্য বেদির স্থূল উপদেশে লোককে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা না করিয়া যদি প্রাচীন ব্রহ্মবাদীদের আদর্শে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে উত্তরোত্তর ব্রহ্মসাধনের পথে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করা হইত, যদি পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শাস্ত্রও যথেষ্টরূপে আলোচিত হইত, তবে আর এত দিন পরে দেশ মধ্যে অন্ধ গুরুবাদের পুনরুত্থান দেখিতে হইত না। উপরি-উক্ত স্থূল ও বাহ্য একেশ্বরবাদ সাধক-হৃদয়ে তৃপ্তি দিতে পারিল না; প্রকৃত, গভীর, তৃপ্তিপ্রদ ব্রহ্মবাদের শিক্ষা অনেক স্থলেই অপ্রাপ্য,—তান্ত্রিক ভাবের পুনরুত্থানের ইহা একটী বিশেষ কারণ। "ধর্ম্ম সম্বন্ধে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে, কিছু জানি না, কিছুই বুঝি না, গুরু যাহা বলেন করিব, যাহা বলেন মানিব," ইহা ধর্ম্ম-জীবনের বাল্য ভাব। বালকের মুখে এই কথা শোভা পায়, বরং মিষ্টই লাগে, এবং প্রতিবাদের অযোগ্য। কিন্তু এই বাল্যভাবই আবার জ্ঞান বিজ্ঞা-নের অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও যখন নিজের অবলম্বিত অন্ধ নির্ভরকে যুক্তি-বলে সমর্থন করিতে যায়, তখন ইহা কেবল হাস্যাস্পদই হয়। "আমার বুদ্ধি প্রাকৃত, অবিশুদ্ধ, মলিন, ইহাতে ঈশ্বরনির্ণয় হয় না," এই কথা বলিয়া আবার এই প্রাকৃত বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিই যখন বলেন, "এই মহাত্মা ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন, এই আধারে ব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা আমি নিশ্চয় বুঝি-য়াছি, অতএব আমি সম্পূর্ণরূপে ইঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছি"—তখন কেন যে তিনি নিজের স্পষ্ট স্ববিরোধিতা বুঝিতে পারেন না, ইহা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে, ব্রহ্মনির্ণয়ের পূর্ব্বে, সাধক-মহাত্মা-দিগের প্রদর্শিত পথ পরীক্ষার্থ অবলম্বন করা, এমন কি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের

কথায় প্রত্যয় করাকেও জ্ঞান-বিরুদ্ধ কার্য্য মনে করি না। কিন্তু এই নির্ভরের অবস্থায় সাধক ব্রহ্মবাদী নামের অধিকারী হন না, এবং তাঁহার অন্ধ শ্রদ্ধাও বিশ্বাস-প্রসূত মতকে ব্রহ্মবাদ বলা যাইতে পারে না। এরূপ সাধকের জড়, জীব, ব্রহ্ম, জ্ঞান, শাস্ত্র, পরিত্রাণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে নির্ব্বাক্ থাকাই উচিত। তিনি যখন তাঁহার মলিন প্রাকৃত যুক্তি ও অভিজ্ঞতাদ্বারা এই সকল বিষয়ে কোন মতের সমর্থন বা প্রতিবাদ করিতে অক্ষম, এবং তাঁহার গুরুর দোহাই যখন তাঁহার সমশিষ্য ছাড়া আর কাহারও উপর চলে না, তখন তাঁহার পক্ষে তাঁহার মত সমূহ প্রচার করা, বিশেষতঃ ব্রহ্মবাদের নামে প্রচার করা, নিতান্তই ধৃষ্টতার কার্য্য বলিতে হইবে। এরূপ ব্যক্তির প্রচারিত মত ব্রহ্মবাদের পক্ষ কি বিপক্ষ, এই বিচারও অনর্থক, কারণ ব্রহ্মবাদের শাস্ত্র যে সাক্ষাৎ জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানের দোহাই দিয়া এই সকল মত প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আলোচ্য মহোদয়দিগের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা এক দিকে যুক্তির নিন্দা করেন, গুরুকৃপা-বঞ্চিত প্রাকৃত অনুভবের নিন্দা করেন, আপনাদিগের অনভিজ্ঞতা কীর্ত্তন করেন, অথচ অপর দিকে ধর্ম্মের কোন মতামতই তাঁহাদের প্রচার ও সমালোচনার ক্ষেত্রকে অতিক্রম করিতে পারে না। ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধুর ভাব পর্য্যন্ত কোন তত্ত্বকেই তাঁহারা নাড়িতে চাড়িতে ছাড়েন না। প্রচলিত শিক্ষা ও সাধনপ্রণালীতে দোষ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই অসঙ্গত স্ববিরোধী প্রণালীতে সে দোষ সংশোধিত হইবার নহে। আর, অনভিজ্ঞ বালকের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও নির্ভরশীলতাকে বয়স ও অনভিজ্ঞতাতে অতিক্রম করিয়াও যিনি পরিপক যুক্তিবলে যুক্তির অযৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, নিজাধারে প্রকাশিত জ্ঞানদীপকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নির্ব্বাপিত করিয়া গুরু-প্রদত্ত পরোক্ষ জ্ঞানের আলোকে চলিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি কোন্ দিন কোন্ অতলস্পর্শ অন্ধকারার্ণবে ডুবিয়া যাইবেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

(২)

কতিপয় ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈদিক ও অবৈদিক আকারের মধ্যে মধ্যে এত প্রভেদ, যে আপাততঃ এই দুই শ্রেণীর বিশ্বাসকে দুটী ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতে

পারে, এবং দুই শ্রেণীর বিশ্বাসীর মধ্যে কার্য্যতঃ সহানুভূতিরও অভাব হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাস দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাসেরই বিকাশ-প্রাপ্ত রূপ মাত্র। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর বিশ্বাসীর মধ্যে সাময়িক মতভেদ ও পরস্পরের ভ্রম-প্রদর্শন অনিবার্য্য হইলেও সহানুভূতির অভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা হউক কতিপয় ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈদিক ও অবৈদিক রূপ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১। "ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা"—এই বিশ্বাস ঈশ্বরবিশ্বাসী মাত্রেরই আছে। কিন্তু এই বিশ্বাসের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এই বিশ্বাসের স্থূল রূপ এই,—এমন এক সময় ছিল, যখন জগৎ ছিল না, একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছাতে জগতের উৎপত্তি হইল। সূক্ষ্ম চিন্তার হস্তে এই স্থূল রূপ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এক সময় জগৎ ছিল না, পরিবর্ত্তন ছিল না, কার্য্য ছিল না, অথচ ঈশ্বর ছিলেন, কর্ত্তা ছিলেন, ইহা অর্থহীন। ঈশ্বর ছিলেন, কিন্তু কার্য্য করিতেছিলেন না, নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এরূপ মনে করাতেও ঈশ্বরস্বরূপে দোষ স্পর্শে। তার পর, 'পূর্ব্বে' অথবা 'এক সময়' এরূপ কথাতে সময়ের অস্তিত্ব বুঝায়, কিন্তু ঘটনা ছাড়া সময় অর্থ-হীন, সময় থাকিলে ঘটনাও চাই; সুতরাং সময় ছিল, অথচ কোন ঘটনা ঘটে নাই ইহা হইতেই পারে না। তার পর, পূর্ব্বে কেবল মাত্র ঈশ্বর ছিলেন, সৃষ্টিকালে তাঁহার অতিরিক্ত কিছুর উৎপত্তি হইল, ইহাতে ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও পূর্ণতায় আঘাত পড়ে। যে ঈশ্বরের অতিরিক্ত কিছু থাকিতে পারে, তিনি কখনও অসীম নহেন। যিনি অসীম, তাঁহার অতিরিক্ত, তাঁহার বাহিরে, কিছু থাকিতে পারে না; যাহা কিছু সকলই তাঁহার স্বরূপের অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। তার পর, জগতের মূলীভূত বস্তু যে জড় ও জীব, এই বস্তুদ্বয়কে বিশ্লেষণ করিলে এমন এক বস্তুতে যাইয়া উপনীত হইতে হয়, যাহার সম্বন্ধে "এক সময় ছিল না, পরে হইয়াছে" এই কথা একবারেই খাটে না। জড় জগতের মূলীভূত বস্তু শক্তি; জড়বস্তু সমূহ শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। এই শক্তি আবার আত্মার একটী স্বরূপ মাত্র; সুতরাং ইহার উৎপত্তি অসম্ভব, ইহা পরমাত্মাতে নিত্য বর্ত্তমান। দ্বিতীয়তঃ, জীবের মূলীভূত বস্তু চৈতন্য, জ্ঞান; এই চৈতন্য বা জ্ঞানবস্তু দেশ কালের অতীত, এবং ইহাও পরমাত্মার

অঙ্গীভূত, স্বরূপগত বস্তু, ইহারও উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং উপরি-উক্ত বিশ্বাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা এই দাঁড়াইতেছে,—'জগৎ' অর্থ পরিবর্ত্তন, কার্য্য; কার্য্য ও কাল পরস্পর আপেক্ষিক চিন্তা; কাল না থাকিলে কার্য্য থাকে না, কার্য্য না থাকিলে কাল অর্থহীন। কালের আরম্ভ নাই, শেষ নাই; কার্য্য-শৃঙ্খলেরও আরম্ভ নাই, শেষ নাই। বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও কার্য্য-শৃঙ্খলের আরম্ভ আছে, শেষও আছে। এই দৃশ্যমান জগৎ, এই কার্য্য-শৃঙ্খল, এক সময় ছিল না, ইহার আরম্ভ আছে, শেষও আছে। কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা চাই, সুতরাং জগৎ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ইহা ঠিক। কিন্তু কার্য্যশৃঙ্খল যখন অনাদি অনন্ত, তখন ঈশ্বর এক সময় নিক্রিয় ছিলেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন। পুনশ্চ, কার্য্য কর্ত্তার অতিরিক্ত, কর্ত্তা ছাড়া, কিছু নহে; কর্ত্তা কার্য্য করিতে গিয়া নিজস্বরূপের অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করেন না, নিজ স্বরূপের ভিতরেই থাকেন। ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে গিয়া, নিজ শক্তিকে ভিন্ন ভিন্নরূপে পরিণত করিতে গিয়া, আপনার অতিরিক্ত, আপনা ছাড়া, কোন বস্তু উৎপাদন করেন না, সুতরাং সৃষ্টি কার্য্যে তাঁহার অনন্ত স্বরূপে কোন আঘাত পড়ে না। এখন দেখা গেল, "ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা", এই বিশ্বাসের বাহ্যিক স্থূল রূপ ও আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম রূপে কত প্রভেদ। অথচ মূল বিশ্বাস—কর্ত্তা ও কার্য্যের পরস্পর আপেক্ষিকতায় বিশ্বাস—একই। বেদোক্ত ব্রহ্মবাদে এই সূক্ষ্ম রূপই দেখিতে পাওয়া যায়, অবৈদিক ইহাকে বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে সৃষ্টিবিরোধী অদ্বৈতবাদ বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

২। "ঈশ্বর জগতের আধার" ইটীও একটী সাধারণ বিশ্বাস, অথচ ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে অনেক প্রভেদ। জড় ও চেতন, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে, চলিত লৌকিক মত যেরূপ পার্থক্য কল্পনা করে, তাহাতে এই বিশ্বাস অনেকটা অর্থহীন হইয়া পড়ে। বিষয় ও বিষয়ী যদি পরস্পর হইতে পৃথক, স্বতন্ত্রই হয়, তবে বিষয়-জগৎকে পরম বিষয়ী, পরম জ্ঞান, ঈশ্বরের আশ্রিত মনে করিবার কোন হেতু থাকে না। স্থূল বিশ্বাস জগৎকে জ্ঞানের ভূমি হইতে দৃষ্টি করে না, অথবা,—সূক্ষ্মতর ভাষায় বলিতে গেলে,—আমরা যে জগৎকে সর্ব্বদাই জ্ঞানের ভূমি হইতে দৃষ্টি করিতেছি, ইহাকে জ্ঞান হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া দৃষ্টি করা, চিন্তা করা, বিশ্বাস করা যে অসম্ভব,—লৌকিক চিন্তা তাহা জানে না, বুঝে না। অথচ তাহা ঠিক। আমরা জগৎকে জ্ঞানের বিষয়রূপে, জ্ঞানাশ্রিতরূপে, প্রত্যক্ষ করি, জ্ঞানাশ্রিতরূপে চিন্তা করি, জ্ঞানাশ্রিতরূপে বিশ্বাস করি। জ্ঞানকে সাক্ষীরূপে না বসাইয়া কোন কার্য্য, কোন দেশ, কোন কাল, কোন বস্তু চিন্তা করা যায় না, বিশ্বাস করা যায় না। "ঈশ্বর জগতের আধার" এই বিশ্বাসের প্রকৃত মূল এখানে। বিষয়রূপ জগৎ কেবল অনন্ত বিষয়ী সর্ব্বসাক্ষী পরম জ্ঞান ঈশ্বরের আশ্রয়েই থাকিতে পারে। কার্য্য যেমন কর্ত্তা-সাপেক্ষ, সত্তা তেমনি জ্ঞানাশ্রিত। জ্ঞানে প্রকাশিত সত্তা ছাড়া অন্য সত্তা আমরা জানি না, ভাবিতে পারি না, বিশ্বাস করিতে পারি না। "থাকিলে থাকিতেও পারে" এরূপ ভাবিতে গিয়াও ইহাকে প্রকারান্তরে জ্ঞানের আশ্রয়েই আনি। যাহা হউক, যে সত্তা আমরা জানি ও চিন্তা করি, তাহা যে জ্ঞানাশ্রিত সত্তা, জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-রহিত কোন অবোধ্য সত্তা নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জ্ঞান স্বয়ংপ্রভ, সুতরাং স্বতন্ত্র, নিজ-তন্ত্র; কিন্তু বিষয় জ্ঞান-প্রকাশিত, সুতরাং জ্ঞান-পরতন্ত্র। অতএব "ঈশ্বর জগতের আধার" এই বিশ্বাস জ্ঞানের হস্তে এই আকার ধারণ করে—"বিষয়-জগৎ পরম জ্ঞানের আশ্রিত।" উপনিষদে এই বিশ্বাস এই আকারেই দেখিতে পাওয়া যায়।

এস্থলে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বিচার আসে। স্থূল বিশ্বাসদ্বারা এরূপ বিচারের সমাধান হওয়া অসম্ভব। সূক্ষ্ম জ্ঞানে কিরূপ মীমাংসা হয়, সংক্ষেপে যত দূর সম্ভব দেখাইতে চেষ্টা করিব। চিন্তা ও চিন্তাকারীর সম্বন্ধ আলোচনা করা যাক্। চিন্তা চিন্তাকারীর আশ্রিত, চিন্তার স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন এই, চিন্তা ও চিন্তাকারী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, কি এক বস্তু? স্থূলভাবে, কেবল ভাষাদ্বারা বিচার করিলে, চিন্তা ও চিন্তাকারী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু; চিন্তা আধেয়, আশ্রিত; চিন্তাকারী আধার, আশ্রয়। কিন্তু ভাষার মায়াজাল কাটিয়া সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে দেখা যায় চিন্তা চিন্তাকারীরই একটী রূপবিশেষ, অবস্থাবিশেষ। চিন্তাকারীই প্রকৃত বস্তু, চিন্তা সেই বস্তুর গুণ মাত্র। গুণ গুণীছাড়া কিছুই নহে, গুণীর একটা রূপমাত্র, অবস্থামাত্র। চিন্তা বলিলে চিন্তাকারীকেই বুঝায়, চিন্তাকে

ভাবিতে গিয়া আমরা চিন্তাকারীকেই কোন বিশেষ রূপে ভাবি। সুতরাং চিন্তা ও চিন্তাকারীর মধ্যে ভেদ ও অভেদ, দ্বৈতভাব ও অদ্বৈতভাব, উভয়ই আছে। কোন বিশেষ চিন্তা চিন্তাকারীর সমগ্র প্রকৃতি প্রকাশ করে না, তাহার আরো চিন্তা আছে, আরো রূপ আছে। এই অর্থে চিন্তাকারী সেই বিশেষ চিন্তার অতীত, এবং এই অর্থে সেই বিশেষ চিন্তাকে চিন্তাকারী হইতে ভিন্নরূপে ভাবা যায়, দ্বৈতভাবে ভাবা যায়। কিন্তু সেই বিশেষ চিন্তাও চিন্তাকারীরই একটী রূপ, সেই চিন্তা চিন্তাকারী ছাড়া—চিন্তাকারীর অতিরিক্ত—কিছুই নহে, সুতরাং এই অর্থে ইহা চিন্তাকারী হইতে অভিন্ন, চিন্তাকারীর সহিত এক অদ্বিতীয়। এখন বক্তব্য এই যে, জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ চিন্তা ও চিন্তাকারীর সম্বন্ধের অনুরূপ, এবং চিন্তা ও চিন্তাকারীর ভিন্নতা ও অভিন্নতা, দ্বৈতভাব ও অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, সমস্তই সেই সম্বন্ধ বিষয়ে সংলগ্ন হয়। জগৎ ঈশ্বরের আশ্রিত, তিনি জগতের আশ্রয়, এস্থলে আপাততঃ দ্বৈতভাব। কিন্তু জগৎ, জগতের অংশীভূত বিশেষ বিশেষ বস্তু, তাঁহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। ইহা, ইহারা, তাঁহারই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ, জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, সুতরাং তিনি ছাড়া কিছুই নহে। তিনি যেমন জগতের অন্তরে, তেমনি জগতের বাহিরেও আছেন, দেশ কাল তাঁহাকে বদ্ধ রাখিতে পারে না, তিনি দেশ কালের অতীত। সুতরাং জগৎ তাঁহার সমগ্র স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু জগৎ তাঁহার শক্তির ভিন্ন ভিন্নরূপ—তাঁহার জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ব্যতীত কিছুই নহে, ইহা দেশে কালে প্রকাশিত তিনি ব্যতীত কিছুই নহে। জগৎ জানিতে গিয়া বস্তুতঃ তাঁহাকেই জানি, জগৎ ভাবিতে গিয়া তাঁহাকেই ভাবি, তাঁহা ছাড়া আর কিছু জানি না, ভাবি না। এস্থলে অভেদভাব, অদ্বৈতভাব। এখন ভেদাভেদভাব, দ্বৈতাদ্বৈতভাব কথঞ্চিৎ বুঝা যাইবে, এবং উপনিষদাদি গ্রন্থে ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে দ্বৈতভাবাত্মক ও অদ্বৈতভাবাত্মক, আপাত-বিরুদ্ধ বর্ণনাসমূহ কেন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণও কতকটা বোধগম্য হইবে।

এস্থলে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতে পারে। ‘সগুণ’ অর্থ প্রাকৃতিক গুণযুক্ত; এ দেশীয় দার্শনিক ভাষায় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই

তিনটী প্রকৃতির মৌলিক গুণ। 'নির্গুণ' অর্থ প্রাকৃতিক গুণের অতীত। 'নির্গুণ' অর্থ 'স্বরূপবিহীন' নহে, ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবও সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই স্বরূপত্রয়যুক্ত। এই সগুণ নির্গুণ প্রভেদের মূল এই যে প্রাকৃতিক গুণের ধারয়িতা যিনি, তিনি অবশ্যম্ভাবিরূপেই প্রাকৃতিক গুণের অতীত; প্রাকৃতিক, গুণের অতীত না হইলে, প্রাকৃতিক গুণের সাক্ষী হওয়া যায় না, ধারয়িতা হওয়া যায় না। দেশে প্রসারিত খণ্ডশীল বস্তুকে কেবল সেই জানিতে পারে, যে স্বয়ং দেশাতীত, অখণ্ড। কাল প্রবাহকে, প্রবাহশীল ঘটনা-পরম্পরাকে কেবল সেই জানিতে পারে, যে কালাতীত, নিত্য। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপের দুটী দিক্। এক দিকে তিনি বিশ্বের সহিত সম্বদ্ধ, বিশ্বরূপী, সগুণ; আর এক দিকে তিনি বিশ্বের অতীত, নির্গুণ। পাশ্চাত্য দর্শনের immanent ও transcendent এর প্রভেদ এই সগুণ ও নির্গুণ ভাবেরই নামান্তর মাত্র। ব্রহ্মস্বরূপের এই দুটী দিকের কোন দিকই অস্বীকার্য্য নহে, তিনি সগুণ নির্গুণ দুইই। বেদে তিনি সগুণ নির্গুণ উভয়রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন।

৩। 'ঈশ্বর জীবের প্রাণ''—এই বিশ্বাসও ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু ইহারও স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ আছে। এই বিশ্বাসের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ না করিলে ইহার শক্তি অনুভূত হয় না, আন্তরিক অজ্ঞানতা-মূলক অহঙ্কারে আঘাত পড়ে না। ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম, জ্ঞানের সহিত বিষয়-জগতের সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে আলোচনা না করাতেই বিষয়-জগৎকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জ্ঞান ও বিষয়-জগতের সম্বন্ধ কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিয়াও, কথঞ্চিৎ বুঝিয়াও, আমরা জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এমন ভ্রম করিতে পারি যাহাতে উচ্চতর আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সংক্ষেপে যতদূর সম্ভব এই ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। জগৎকে জ্ঞানাশ্রিতরূপে দেখিতে গিয়া, ভাবিতে গিয়া, আমরা কি ইহাকে কোন দেশে কালে আবদ্ধ, সসীম, বহুত্বশালী বস্তুর আশ্রিত বলিয়া জানি, ভাবি? আপাততঃ তাহাই বোধ হয়। ক্রমাগত বিষয়-জগতের সীমা ও খণ্ডশীলতা দেখিয়া দেখিয়া আমাদের চিন্তা এমন স্থূলভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে যে সেই জগতের আলোক ও আশ্রয়রূপী জ্ঞানবস্তুতেও আমরা সেই সসীম ও খণ্ডশীলতার ভাব আরোপ করি।

অপেক্ষাকৃত স্থূল দার্শনিক দৃষ্টিতেও জগৎ বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মার চিন্তা ও ভাব-সমষ্টি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে এই ভ্রম দূর হয়। যে জ্ঞানকে আমরা 'আমাদের জ্ঞান' বলি, এবং যাহা স্থূল দৃষ্টিতে কেবল আমাদের বলিয়াই বোধ হয়, বস্তুতঃ সেই জ্ঞানকেই আমরা আমাদের শরীরের বাহিরে, শরীরের নিকটস্থ ও দূরস্থ সমুদায় বস্তুতে, প্রত্যক্ষ করি, সমুদায় বস্তুতে আছে বলিয়া চিন্তা করি। এই জ্ঞানবস্তুকে সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান না করিয়া আমরা দূরস্থ বা নিকটস্থ কোন বস্তু বা কার্য্য,কোন দেশ বা কাল, ভাবিতে পারি না। এই সাক্ষীরূপী জ্ঞানবস্তুর সর্ব্বব্যাপিত্বে বিশ্বাস জ্ঞাতভাবে হউক, অজ্ঞাত ভাবে হউক, আমাদের সমস্ত বিশ্বাসকে নিয়মিত, পরিচালিত করিতেছে। সমুদায় দেশগত, কালগত, জীবগত বিভাগ সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের মূলে জ্ঞানবস্তুর অখণ্ডত্বে বিশ্বাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা সসীম বস্তু ভাবিতে গিয়া বস্তুতঃ এই জ্ঞান বস্তুর সসীমত্ব ভাবিনা, ইহার আশ্রিত রূপরসাদি ভৌতিক বস্তু, ও সুখ দুঃখাদি মানসিক বস্তুর সীমা ও সংখ্যা ভাবি। "আমি ও অন্যান্য মনুষ্য সসীম ক্ষুদ্র জীব মাত্র" ইহা ভাবিতে গিয়া এই জ্ঞানবস্তুর সীমা ভাবি না, ইহার আশ্রয়ে, ইহার আলোকে, বিশেষ বিশেষ চিন্তা, বিশেষ বিশেষ সুখ দুঃখাদি, ও বিশেষ বিশেষ কার্য্য-শক্তির সমষ্টিরূপী এক একটী সচেতন বস্তু ভাবি। এরূপ এক একটি সমষ্টির মূলে "এই সমস্ত চিন্তা ভাবাদি আমার" এই অহংভাব রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই অহংভাব সেই সর্ব্বাবভাসক জ্ঞান থাকাতেই সম্ভব হইয়াছে, ইহা সেই সর্ব্বাধার জ্ঞানেরই একটী বিশেষ ভাব। বিশেষ বিশেষ মানস বস্তুসমষ্টির সহিত সেই জ্ঞানবস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতেই ইহার সবিশেষ ভাব, নতুবা ইহা নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বপ্রকাশক, সমুদয় বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ। এই মূল জ্ঞানবস্তু, এই মূল আত্মজ্ঞান, আমার বিশেষ অহংভাবের মূলীভূত বস্তু হওয়াতেই আমি ঈশ্বরকে আমার 'প্রাণ', আমার 'জ্ঞান' আমার 'পরমাত্মা' বলিতেছি। যাহা হউক, এস্থলেও দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিচার আসিতেছে। পরম জ্ঞান কেবল আমার জীবনের উপকরণরূপী চিন্তা ভাবাদির অবভাসক নহেন, তিনি সমুদায় চিন্তা ভাবাদিরই অবভাসক, সত্য; কিন্তু আমাতে তাঁহার জ্ঞান বিশেষ বিশেষ চিন্তা ভাবাদিযোগে প্রতিভাত হইতেছে; 'আমি' বলিতে সেই অখণ্ড বস্তুর এই খণ্ড অনুপ্রকাশকে বুঝায়।

তিনি অসীম, আমি সসীম। এই ভাবে দেখিতে গেলে আমি ও তিনি ভিন্ন; এস্থলে দ্বৈতভাব বর্ত্তমান। আবার, এই যে আমার জ্ঞান, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছাড়া কিছুই নহে। ইহা তাঁহারই জ্ঞান, ইহা জ্ঞানরূপী তিনিই, তিনি ছাড়া আর কেহ নহে, আর কিছুই নহে,—এই অর্থে তিনি ও আমি অভিন্ন; এস্থলে অদ্বৈতভাব। তাহাতেই বেদোক্ত ব্রহ্মবাদে দ্বৈতভাব ও অদ্বৈতভাব উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

সংস্কার-প্রণালী।
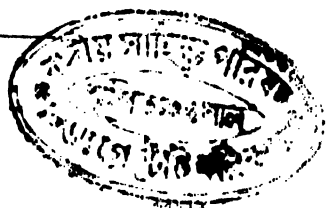
দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় বিনা মেঘে হঠাৎ বজ্রাঘাত হইলে লোক যেমন ভীত, স্তম্ভিত ও বিচলিত হয়, কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তেমনি জন-সমাজকে বিকম্পিত করিয়া ভারতাকাশে এক বজ্রধ্বনি হইল—শব্দ হইল—সংস্কার। সে শব্দে শুধু ভারত নয়, ইংলণ্ড পর্য্যন্তও কাঁপিয়া উঠিল। সে শব্দ আজও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কবে নিবৃত্ত হইবে কে বলিতে পারে?

রামমোহন যে নাম শুনাইয়া গিয়াছেন বঙ্গের কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বলিয়াছেন যে তাহা দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। পূর্ব্বে এ দেশের কোনও সংস্কার হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার নামকরণ 'সংস্কার' নয়। যাহা হউক, পূর্ব্বের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু এখন আর এ সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধই নাই যে আমাদের সমাজের সংস্কার প্রয়োজনীয়। তবে সমাজের কোন্‌গুলি দোষ এবং কোন্‌গুলি গুণ,কি পরিত্যাগ করিতে হইবে,কি রক্ষা করিতে হইবে, অথবা নূতন কি গ্রহণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বিরোধ থাকা সম্ভব। কেহ বলিতেছেন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত, কেহ বা বলিতেছেন বিধবার ব্রহ্মচর্য্য হিন্দুস্থানের গৌরব। সমাজের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সংস্কারের কি প্রণালী হওয়া কর্ত্তব্য তাহাই এস্থলে বিবেচ্য।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সমাজের কি দোষ ও অপূর্ণতা তাহা

পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছেন এবং তাহা সংশোধিত হয় ইহাও বাক্যতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারা যে সংস্কারক তাহাও স্বতঃ পরতঃ ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নহেন,কিন্তু কার্য্যতঃ কোনও সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত নহেন, কেন না তাহা হইলে সমাজস্থ লোকমণ্ডলীর বিরক্তিভাজন হইতে হইবে এবং তাহারা উৎপীড়ন করিবে। তাঁহারা সমাজে থাকিয়া সমাজ সংস্কার করিবেন। যে কাজ করিলে সামাজিকেরা বাহ্যতঃ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিবেন সে কাজে তাঁহারা হাত দিবেন না। এই তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর আপত্তি। কেহ বলিতে পারেন যে ইহা ত সত্য কথা, সমাজ ছাড়িয়া সমাজসংস্কার হইবে কিরূপে? আমরাও ইহা স্বীকার করি, শুধু তাই নয়, আমরা বলি সমাজ ছাড়িয়া তো সমাজ সংস্কার অসম্ভবই, পরন্তু সমাজ ছাড়িলে মানুষ মনুষ্যত্বই হারায়। ইহারা কিন্তু কথাটা এত সূক্ষ্মভাবে দেখা দূরে থাকুক, ইহার অতি স্থূল অর্থই গ্রহণ করেন। ইহারা সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধটাকে অতি স্থূল ভাবে দেখেন। ইহাদের মতে এক কথায়ই সম্বন্ধ স্থাপিত হয় আবার এক কথায় ভাঙ্গিয়া যায়। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমূহের সম্বন্ধ যে একরূপ অচ্ছেদ্য, তাহা তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম, এ সম্বন্ধে এখানে বেশী কথা বলা যাইতে পারে না, বলা সম্ভবও নয়। সুতরাং মূল বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে। একটী দৃষ্টা-ন্তের দ্বারা তাহাদের কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। মনে করুন এক জনের পাঁচ পুত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল তিনজন পরিবারের কোনও উন্নতির জন্য লালায়িত নহেন, যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু আর দুজন কিঞ্চিৎ উন্নতিপ্রয়াসী, কিছু পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে ইচ্ছুক। ইহাতে যদি পূর্ব্বোক্ত তিন ভ্রাতা রুষ্ট হইয়া দুই জনের সঙ্গে বাহ্যতঃ সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তবে কি ইহাদের সমপিতৃত্ব ও সমপরিবারত্ব নষ্ট হইল? বিবেচক মাত্রই বলিবেন, না। কিন্তু এই সংস্কারকদের মতে একত্ব নষ্ট হইল। ইহারা দেখেন না এরূপ তরল একত্ব কত সহজে ধ্বংস হইতে পারে। ইহাদের কথা সত্য হইলে এই প্রকাণ্ড হিন্দু পরিবারে বৈষ্ণবের সঙ্গে শাক্তের সমধর্ম্মত্ব নাই, ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রের সম-জাতিত্ব নাই, এমন কি এক পরিবারে পৃথগন্নভুক্ত ভ্রাতৃপঞ্চকের মধ্যে সম-পিতৃত্ব নাই। ইহারা হয়তো বলিবেন যে এটাতো আর মূল কথা নয়, কথা হই-তেছে এই,দুই ভাই যদি উন্নতির জন্য পৃথক হইয়া পড়েন,তবে তাহাদের উন্নতি

হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু এ তিন জনের তো আর কোনও লাভ হইল না। ঘরে থাকিয়া এ তিন জনকে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত কর, পরে পাঁচ জনই একই সময়ে উন্নতি কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। শিক্ষা দিতে থাক, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না, বাক্যে প্রবৃত্ত হও,দেখিবে,তোমার বাক্যের চোটে একদিন সমাজ, একটু একটু করিয়া নহে,কিন্তু একদম পাঁচ হাত,উপরে উঠিয়া পড়িয়াছে। ইহাঁরা মনে করেন বিনা স্বার্থত্যাগে ও বিনা রক্তপাতে ইহাদের বাক্যমহিমায়, বাল্যবিবাহের বিপক্ষে বলিতে বলিতে, অথচ সেই সঙ্গে অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীকে বিবাহ করিতে করিতেই—(কেন না যে পর্য্যন্ত সকলে বাল্যবিবাহ বন্ধ না করে সে পর্য্যন্ত আমিও পারি না)—সমাজ সংস্কৃত হইয়া উঠিবে, একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিব যে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী ঠাকুর মন্দির সমূহে দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে বটে, কিন্তু কেহ তাহাদের নৈবিদ্যের আয়োজন করিতেছে না, গৃহে দশ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা সত্ত্বেও আর তাহার বিবাহের জন্য জনক জননী বিচলিত নহেন, উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকভয়ে ভীত নহেন। ব্রাহ্মণ যুবক আর শূদ্র-কন্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত নহেন। সে দিন প্রভাতে নূতন তপন নূতন জীবন বপন করিতেছে। এই তাঁহাদের সংস্কারস্বপ্ন। হে সংস্কারক,জিজ্ঞাসা করি তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ তোমার এই সংস্কারের উদ্ভব কোথায়? তুমি কি যথার্থ ই সংস্কারপ্রয়াসী,না ইহা তোমার স্বার্থত্যাগে অপারগতার নামান্তর মাত্র? তোমার ভীরুতা ও কাপুরুষতা এই নামে তোমায় প্রতারণা করিতেছে না ত? জগতের ইতিহাস এক পৃষ্ঠাও কি উল্টাইয়াছ? যদি উল্টাইয়া থাক তবে অবশ্যই দেখিয়াছ বিনা রক্তপাতে, বিনা স্বার্থনাশে, সমাজ এক পাও অগ্রসর হয় নাই। শুধু বক্তৃতায় কি মনুষ্যসমাজ জাগে? বিনা রক্তস্রোতে কি কখনও স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা ভাসিয়া যায়?

তুমি যাহাই বল, আমি তোমার মনের ভাব স্পষ্টই বুঝিতেছি। তোমার মনের সম্মুখে জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একটী উচ্চ আদর্শ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তোমার ইচ্ছাতে এমন শক্তি নাই যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে পরীক্ষা উৎপীড়ন এবং স্বার্থনাশের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে তাহা তুমি সহ্য করিতে পার। সেই জন্য দুই কুল রাখা গোছ একটী মত অবলম্বন করিয়াছ যাহাতে তুমি যে অপর দশ জনের ন্যায় নিম্নভূমিতে পতিত

নহ এই অভিমানটুকুও বজায় থাকিতেছে—অথচ দশ জন হইতে উচ্চে উঠিতে হইলে যে আত্মত্যাগের প্রয়োজন তাহাও করিতে হইতেছে না। তুমি বেশ উপায় অবলম্বন করিয়াছ। তাহাতে মাছও ধরিতেছ অথচ গায়ে কাদা লাগিতেছে না। তুমি কি সংস্কারের জন্য ব্যাকুল? সমাজের জন্য কি তোমার প্রাণ কাঁদে, যদি কাঁদে তবে যে সকল সংস্কারে সমাজচ্যুত হইতে হয় না সেখানে তোমায় দেখি না কেন? নিজ চক্ষু নিজ হাতে আবরণ করিয়াছ, আবার অন্যের চক্ষে ধূলা দিতে আসিয়াছ কেন? যাঁহারা সমাজের মঙ্গলার্থ রক্ত দান করিতেছেন তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইও না। তুমি বুঝিতেছ না, তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইলে সমাজের নাড়ী যে আজ অল্প পরিমাণেও চলিতেছে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে, যে অগ্নি জ্বলিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহাও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। তুমি যখন বলিতেছ যে শিক্ষা দ্বারাই সমাজ সংস্কৃত হইবে, লোকে বুঝিতে পারিলেই সমাজের দোষ সংশোধিত হইবে,তখন তুমি বুঝিতেছ না যে কেবল শিক্ষায় কিছুই হইবে না, আরও কিছু চাই। দেশ শুদ্ধ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, সকলেই বলিবে "সদা সত্য কহিবে, মিথ্যা কহা বড় দোষ" এবং সত্য কহিলে কাহাকেও সমাজচ্যুত হইতে হয় না। কিন্তু বল দেখি এমন কয়টা মোকদ্দমা আছে যেখানে মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করা হয় না? দেশের লোক মিথ্যা সাক্ষী দেয় বলিয়া আমার মোকদ্দমায় আমিও কি মিথ্যা সাক্ষীই আনয়ন করিব? আমি কি বলিব দেশের লোক এখনও এত উন্নত নয় যে বিনা মিথ্যা সাক্ষীতে মোকদ্দমা চালাইতে পারে, সুতরাং মোকদ্দমা চালাইতে হইলে আমাকেও মিথ্যা সাক্ষী সাজাইতে হইবে। তাই বলি বক্তৃতায় কিছু হইবে না!, কার্য্য চাই। যদি দেখাইতে পার সত্যাবলম্বন করিয়াও মোকদ্দমা চলে,তবেই তাঁহারা সংস্কৃত হইতে পারে—নতুবা নহে। যদি সত্য পথে অন্যকে আনিতে চাও তবে নিজে আগে সত্যাবলম্বন কর, কর্ত্তব্যপথ দেখাও। যে সেনাপতি পশ্চাৎ হইতে বলেন অগ্রসর হও, তিনি সেনাপতিত্বের উপযুক্ত নহেন। তিনিই প্রকৃত সেনানায়ক যিনি বিপদকে তুচ্ছ করত অগ্রগামী হইয়া সেনাদিগকে বলেন 'অনুসরণ কর'। এই সেনাপতির কথাতেই সৈন্যগণ হৃদয়ের সহিত যোগ দেয়, ইহারই যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা—অন্যের নহে। সংস্কর্ত্তৃত্বও এইরূপ।

আগে আলো লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা ঠেলিলেও সমাজ নড়িবে না। তুমি তো শিক্ষার কথা বলিয়া থাক, কিন্তু প্রাচীন মহর্ষি লোকশিক্ষার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা শুনিবে কি? তিনি বলিতেছেন—"যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি যুক্তঃ কর্ম্ম সমাচরন্"। বক্তৃতা নহে, উপদেশ নহে, শিক্ষাবিস্তার নহে, কর্ম্ম, কর্ম্মাচরণ। ঐ যে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দুই জনের কথা আমরা বলিয়াছি, তাঁহারা ঘরে থাকিলেও যে শিক্ষা বিস্তার হইবে, বাহির হইতেও সেই শিক্ষাবিস্তার করিতে পারিবে, বেশীর মধ্যে কর্ম্মাচরণ করিয়া শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে। শুধু উপদেশ নয়—দৃষ্টান্ত চাই। শত উপদেশ অপেক্ষা কি একটী দৃষ্টান্ত বেশী কার্য্য করে না? "মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব ভূতানি" তো বেদে ছিল, তবুও পশুরক্তে মেদিনী কলঙ্কিত হইত কেন? যে দিন শাক্যসিংহ জীবনে দেখাইলেন "হিংসা করিও না" সেই দিন হইতেই অগ্নির পশুরক্ততৃষা নির্ব্বাপিত হইবার সূত্রপাত হইল। এরূপ না করিয়া বুদ্ধদেব যদি মনে করিতেন যে দেশ এখনও এত শিক্ষিত নয় যে অহিংসা ধর্ম্ম বুঝিতে পারে, অতএব শুধু বক্তৃতাই করিতে হইবে, কার্য্যতঃ কিছু করা যাইতে পারে না, তবে হয় ত ভারতেতিহাস অন্যাকার ধারণ করিত,যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণ হইত কি না সন্দেহ।

আলোচ্য মতের বিপক্ষে উপরি উপরি অনেক কথা বলিলাম। যাহা সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা সূচনায়ই বলা হইল। তখন এগুলিকে জ্যামিতির সামান্য কথা (cnunciation) রূপে গ্রহণ করিয়া প্রমাণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

উক্ত রক্ষণশীলগণ 'সংস্কারক' এই উচ্চ নাম গ্রহণের অভিলাষী, কিন্তু 'সংস্কার' কথাটার প্রকৃত অর্থ কি তাহা ইঁহারা তলাইয়া দেখেন না। ইঁহারা যদি কথাটীর অর্থ গ্রহণে সমর্থ হইতেন,তবে আর "আমরা সমাজে থাকিয়া সমাজ সংস্কার করিব" ইহা বলিয়া এত আস্ফালন করিতেন না। আমি যদি বুঝিতে পারি যে সমাজের সংস্কার প্রয়োজন, তবে সঙ্গে সঙ্গেই ইহা ভাবিতে হইবে যে আমার মধ্যে এমন কিছু আসিয়াছে যাহা সমাজে নাই। সমাজসংস্কার অর্থই এই যে ইহাকে এমন কিছু দিতে হইবে যাহা ইহার ছিল না। যদি আমার মধ্যে এমন যে কিছু আসিল যাহা সমাজের নাই, তাহা হইলে এক অর্থে আমি কি তৎসঙ্গে সঙ্গেই সমাজ ছাড়িলাম না? আমার মাথা কি সমাজকে অতিক্রম করিয়া উঠিল

না? সুতরাং এ অর্থে সংস্কারক মাত্রই সমাজত্যাগী। কোন ব্যক্তির পক্ষে সমাজ ত্যাগের যদি কোনও অর্থ থাকে তবে তাহা এই, আর কোনও অর্থে মানুষ সমাজ ছাড়িতে পারে না। যাহারা মনের ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া সমাজ হইতে দৃষ্টতঃ বিচ্ছিন্ন থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে সমাজত্যাগী বলা যাইতে পারে না।

আপত্তিকারী হয় ত বলিবেন,যাহাতে এই বিচ্ছিন্ন ভাবটুকু আসিতে না পারে আমরা সেই অনুসারে চলিব, এবং ইহাই সমাজে থাকিয়া সমাজসংস্কার, এবং ইহার অন্যথাই সমাজত্যাগ। উত্তরে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি সংস্কারকের পক্ষে এরূপ ভাবে চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহাতে কোন কাজই সম্ভব নহে। ইহারা আপনাদের প্রণালীর দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। ইহারা বলেন শিক্ষা বিস্তারদ্বারা লোকদিগকে উন্নত করিতে হইবে, সমাজের দূষণীয় প্রথার নিন্দা ও নব শুভকরী প্রথার গুণকীর্ত্তন দ্বারা লোকের চক্ষু উন্মিলিত হইলে সমাজ আপনিই সংস্কৃত হইবে, সে জন্য তোমায় আমায় কোনও প্রবল উপায় (drastic measure) অবলম্বন করিতে হইবে না। এখন প্রশ্ন এই, সমাজ যে রক্ষণশীল বক্তার এই 'সহজ' সংস্কার সহ্য করিতেছেন, তাঁহার এই বাক্যবাণ হৃদয় পাতিয়া বহন করিতেছেন, তাহা কি তাঁহার বিরোধী সংস্কারক দলের রক্ত দানের ফল নহে? তিনি কি এত সত্বরই ভুলিয়াছেন যে রাজর্ষি রামমোহন পৌত্তলিকতার বিপক্ষে লিখিয়াই গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, বক্তা যে আজ সমাজের দোষ উদ্‌ঘাটন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন তাহার পথ কি সংস্কারকগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, সমাজচ্যুত হইয়া, পরিষ্কার করিয়া দেন নাই?

একটী গল্প মনে পড়িল। একজন আইরিষ রমণী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে লোকে আলোকদাতা বলিয়া সূর্য্যকে বৃথা প্রশংসা করিয়া থাকে, কারণ সূর্য্য দিবসে কিরণ বিতরণ করেন; তখন ত যথেষ্ট আলোই থাকে। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার নিরাকরণ করেন বলিয়া চন্দ্রই অধিকতর প্রশংসার পাত্র। ইহাদেরও বুদ্ধি প্রায় এইরূপ। ইহারা যে যথেষ্ট আলো লইয়া সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহা যে সমাজত্যাগিদেরই সম্পত্তি, তাহা ইহাদের দেখিবার অবসর নাই। হে সংস্কার-বক্তা! তুমি বুঝিতেছ না যে তোমার প্রণালীতে সমা-

জের অবনতি ভিন্ন উন্নতির আশা আদতেই নাই! আজ বিধবাবিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়, কিন্তু বিধবাবিবাহের সপক্ষে বলিবার এবং বালিকার চির-বৈধব্যের দোষোৎঘাটন করিবার তোমার স্বাধীনতা আছে, সুতরাং তাহা তুমি করিতেছ। কিন্তু সামাজিকগণ যদি বলিতেন যে শুধু বিধবাবিবাহ করিলেই যে সমাজচ্যুত হইবে তাহা নহে, যে ঘরের ঢেকী কুমীর হইয়া আমাদের সামাজিক প্রথার বিপক্ষে লিখিবে বা বলিবে তাহাকেই আমরা সমাজচ্যুত করিব,তাহা হইলে তোমার সংস্কার-স্বপ্ন নিশ্চয়ই ভাঙ্গিত। সমাজ-ভ্রূকুটীর ভয়শূন্য এই সংস্কারক সম্প্রদায়, যাঁহাদের বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে সমাজের বহুদিন-সঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর হইতেছে, এবং যাঁহাদের দৃষ্টান্তে ইহা এক এক পদ অগ্রসর হইতেছে, এই সম্প্রদায় যদি না থাকিত তবে তোমার এই উৎকটাকাঙ্ক্ষাই যে জন্মিতে পারিত না তাহা কি তুমি এখন বুঝিতে পারিলে? যে ডালে বসিবে মনে করিয়াছ সেই ডালের গোড়াতেই যে কুঠার বসাইয়াছ তাহা বোধ হয় এখন তোমার বোধগম্য হইয়াছে। যে আলোতে পথ দেখিবে মনে করিতেছ সেই আলো নিবাইও না। তাহা হইলে তোমার সংস্কার-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহার স্মৃতি পর্য্যন্তও থাকিবে না।

হে সংস্কারেচ্ছু! তুমি তো পৌত্তলিকতা,জাতিভেদ,বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিতে চাও, কিন্তু তোমার বিরোধী বলিতেছেন, এ গুলি উঠাইয়া দিলে কখনও সমাজ থাকিতে পারে না। সুতরাং আদর্শ সমাজ গঠন কর, দেখাও যে জাতিভেদ ছাড়াও সমাজবন্ধন সুদৃঢ় থাকে, পৌত্তলিকতা ছাড়াও মানুষের ধর্ম্মভাব উজ্জ্বল থাকিতে পারে, দেখাও যৌবনবিবাহই বিবাহের আদর্শ, কেবল তাহাই নহে, দেখাইতে হইবে যে সামাজিক ও পারিবারিক সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ঐ সকল কুপ্রথার উন্মূলনের উপরই নির্ভর করে। ঐ য়ুরোপের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এক সময় ছিল যখন কেহই বিশ্বাস করিত না যে রাজার হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা না থাকিলে কখনও রাজ্য চলিতে পারে। লক্ "সিবিল গবর্ণমেণ্ট" লিখিয়া দেশ-ত্যাগী হইলেন, হব্‌সের মত মহা পণ্ডিতও রাজার যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করিলেন। শুভক্ষণে আমেরিকার সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, দেখিতে না দেখিতে য়ুরোপময় এক মহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সমাজের কুসংস্কার ভস্মীভূত হইয়া গেল। এখন কিন্তু বিপরীত মতই প্রবল হইয়া

উঠিয়াছে। এখন সাধারণ মত এই যে রাজ্যশাসনে রাজার কোন প্রয়োজন নাই। আমেরিকা যদি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এতটা পরিবর্ত্তন সম্ভব হইত না। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখাইলেন রাজা ছাড়া রাজ্য কেবল চলে তাহা নহে, বরঞ্চ অধিকতর সুশৃঙ্খলতার সহিত চলে, অমনি সকল সন্দেহ বিদূরিত হইল, আর কাহারও প্রতিবাদের অবসর রহিল না। তাই বলিতেছি যদি সমাজ সংস্কার করিতে চাও আদর্শ সমাজ গঠন করিয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধারণ কর, নিঃশব্দে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। নতুবা শত বক্তৃতা, শত উপদেশ অরণ্যে রোদন মাত্র হইবে। ঐ আদর্শ অবলম্বন করিয়া আপনি উঠিয়া পড়, দেখিবে সমাজ পশ্চাতে উঠিয়া আসিতেছে। নতুবা নৌকায় বসিয়া গুণ টানিলে যেমন নৌকার গতি একটুও বৃদ্ধি হয় না, তোমার চেষ্টায়ও তেমনি সমাজের গতি বাড়িবে না।

আরও একটী কথা আমাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সমাজসংস্কার অর্থ কি? অর্থ এই, ভারতীয় জনমণ্ডলীর যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক এবং সামাজিক অবনতি ঘটিয়াছে তাহারই সংশোধন। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের সমবেত উন্নতি ছাড়া এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না, সুতরাং সমাজসংস্কার অর্থ—সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি এবং সেই পথে যে যে বাধা আছে তাহার নিরাকরণ। নতুবা ভারতোদ্ধার অর্থ—হিমালয়েরও উদ্ধার নয়, ভারত মহাসাগরেরও সংস্কার নয়। কাজে কাজেই যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ উন্নতিতে নিযুক্ত হন, তবেই সমাজসংস্কার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ সমাজসংস্কার করিতে চান বটে কিন্তু নিজেরা সংস্কৃত হইতে অভিলাষী নহেন। ইহাদের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া একটী গল্প মনে হয়। একদা জনৈক রজক স্বীয় ভারবাহী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে কাপড়ের প্রকাণ্ড মোট চাপাইয়া রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে তাহার অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল আহা, এই গর্দ্দভটীকে এরূপ খাটাইলে শীঘ্রই এ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং ইহার ভার লাঘব করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই রজকের দয়াবৃত্তিটী যত প্রবল, বুদ্ধিবৃত্তিটী তত তীক্ষ্ণ নয়। তাই সে যে উপায় নির্দ্ধারণ করিল তাহা বেচারী গাধার পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইল। রজক মহাশয় তাঁহার দয়ার উত্তেজনায় গর্দ্দভ-পৃষ্ঠ হইতে মোটটী

তুলিয়া নিজ মস্তকে লইলেন কিন্তু মোটসহ স্বয়ং তাহার পৃষ্ঠে চাপিয়া বসিলেন। এই সংস্কারকেরাও ভারত মাতার দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া তাহার পাপভার লাঘব করিতে যাইয়া স্বীয় স্বীয় বাক্য ও কার্য্যের অসামঞ্জস্যরূপ মহা পাতক তাহার উপরে চাপাইয়া দিতেছেন, অন্ততঃ ইঁহারা অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া যদি স্বীয় স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া যাইতেন তাহা হইলে ভারত মাতার যে ভারের লাঘব হইত তাহা হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিতেছেন। এরূপে কখনই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না। যে আত্মা স্বীয় আদর্শের অনুসরণ করিতে পারে না, তাহার তো মৃত্যু অতি সন্নিকট। দেহতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাই—যদি ফুস্‌ফুস্ হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্যে বাধা দেয় তবে ইহা ঠিক যে সে দেহের অবসান নিকটবর্ত্তী, সেইরূপ যে আত্মার এক ভাগের কাজ অন্যের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় সে আত্মাও মৃত্যু দশাপন্ন। জ্ঞানে যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছ ইচ্ছা যদি তাহার অনুসরণ না করে তবে জানিবে তোমার আত্মার দশা অতি শোচনীয়। এ আত্মা দ্বারা জগতের কোনও কল্যাণকর কাজই সম্পন্ন হইতে পারে না। জগতের সংস্কারকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ঐ যে মহাত্মা ঈশা রোম সাম্রাজ্য কম্পিত করিয়া স্বীয় শক্তি অভ্যুদিত করিলেন, ঐ যে লুথর য়ুরোপে মহা বিপ্লব সংঘটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পার্কার যে এই অত্যদ্ভুত সংস্কার সংসাধন করিতে পারিলেন, দূরে দূরে ঘুরিবার প্রয়োজন কি, রাজর্ষি রামমোহন যে এই ভারতব্যাপী মহা সংস্কারের বীজ উপ্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা কোন্ শক্তির বলে? তাহা চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের ঐক্য। যে আত্মার ইচ্ছা তাহার চিন্তার সাহচর্য্য করিতে সক্ষম নয় সে আত্মার কার্য্যশক্তি কোথা হইতে আসিবে, সে আত্মা রুগ্ন, সে নিজের ভার বহনেই অক্ষম। কিন্তু একবার চিন্তা-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি মিলিত হউক, কোথা হইতে যে শক্তি আসিবে তাহা বুঝিতেই পারিবে না। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন আপনা হইতেই ধ্বংস হয়, তোমার বাধা বিঘ্নও কোথা দিয়া চলিয়া যাইবে তাহা তুমিই নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে না। যাহা এখন পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, হয়তো যে বাধা দেখিয়া এখন এই উদ্ভ্রান্ত সংস্কার-প্রণালী অবলম্বন করিতে যাইতেছ তাহাও তৃণবৎ তোমার সম্মুখ হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি এ প্রণালী যে কেবল আত্মার রুগ্নাবস্থার পরিচায়ক তাহা নহে,

কিন্তু ইহা সমস্ত কার্য্যশক্তিরও মূলোৎপাটনকারী। সেই জন্যই দেখিতে পাই, যে সকল সংস্কারকার্য্যে সমাজচ্যুত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই তাহাতেও ইহাঁরা মনোযোগী নহেন। এই যে আসুরিক বিবাহ নর-শোণিত-পিপাসু রাক্ষস অপেক্ষাও অধিকতর নির্ম্মম ভাবে মানুষের হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে তো ইহাদিগকে সংগ্রাম করিতে দেখিতেছি না? কেন দেখিতেছি না তাহার কারণ নিকটেই রহিয়াছে। ইহারা কার্য্যশক্তিই নষ্ট করিয়া বসিয়াছেন, ইহারা ইচ্ছাশক্তির মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সুতরাং ইহারা কোন কাজেই হাত দিতে পারিতেছেন না; কেবল মুখে বলিতেছেন শিক্ষা দাও, শিক্ষা দাও, তাহা হইলেই মঙ্গল সংসাধিত হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—

"হবেনা কথাতে কেবল লেখাতে
করিতে হইবে কঠোর সাধনা॥"

কার্য্যক্ষেত্রই যে শিক্ষারও প্রকৃত ক্ষেত্র এ ধারণা ইহাদের নাই। তাই ইহারা নিদ্রিত থাকিয়াই নিদ্রিত ভারতকে জাগাইতে চান, সুতরাং ভারত জাগিতেছে না। ব্যক্তিগত সুখ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কি আর দেশের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে? প্রতি মুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া আত্ম-বলিদান করিতে না পারিলে দেশের মঙ্গল হইবে না। তুমি যে বক্তৃতা দ্বারাই দেশ উদ্ধার করিবে বলিয়া মনে সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছ তাহা পরিত্যাগ কর।

"ছাড় সে কল্পনা, তাহাতে হবেনা
বৃথা কেন কর সে সুখ বাসনা?
ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বার মাস
দেশের উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়॥"

ঐ কবি ডাকিতেছেন—

"এ ঘোর দুর্দ্দশা ঘুমালে কি যায়?
বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ুক ধরায়,
তিল তিল করে আর যাই মরে,
বল বুদ্ধি মন মিলিয়া সবায়,
আয় ধরে দিই ভারতের পায়।

উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে,
তাও যদি হয় হোক্‌রে কপালে!
বুঝিয়াছি বেশ দিতে হবে প্রাণ,
তবে সে জাগিবে ভারত সন্তান,
আয় জন কত ধরি এই ব্রত,
খাটিয়া জীবন করি অবসান,
তবে যদি জাগে ভারত সন্তান।"

আমরা এতক্ষণ যে শ্রেণীর আপত্তির সমালোচনা করিলাম তাহা যেমন ভ্রান্ত সমাজতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি আর এক শ্রেণীর আপত্তি আছে তাহা ভ্রান্ত নীতিতত্ত্বের উপর স্থাপিত। সেই আপত্তির মূল এই—মানুষ অপূর্ণ জীব, সুতরাং তাহার পক্ষে সমস্ত কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব, অনেক সময় তাহার নিকট বিরুদ্ধ কর্ত্তব্য সকল উপস্থিত হয়, একটীর সম্পাদনে অন্যটীর ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, কাজেই কর্ত্তব্যের ত্রুটী তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য। জাতিভেদ নিবারণের চেষ্টা করা যেমন আমার একটী কর্ত্তব্য, পিতামাতার আদেশ পালন করা আমার তেমনই কর্ত্তব্য, এই দুইয়ে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখন যে-কোন পথ আমি অবলম্বন করিতে পারি তাহাতেই আমার কর্ত্তব্য সাধিত হইবে, কারণ দুইটীই এক সঙ্গে সম্পাদন করা আমার পক্ষে একবারে অসম্ভব।

মূলতঃ আপত্তিটী এইরূপ। ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে এই কর্ত্তব্যবাদ কিরূপ কাঁচা ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহারা 'কর্ত্তব্য' কথাটা একবারেই বুঝেন নাই। কর্ত্তব্য অর্থ যে পথ অবলম্বন করিয়া আমার কর্ম্ম করা উচিত, যাহা আমাকে করিতেই হইবে, যাহা করিতে আমি বাধ্য। এরূপ স্থলে দুইটী বিরোধী কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য হইতে পারে না। পরস্পর-বিরোধী দুইটী কর্ম্মমার্গ আমার নিকট উপনীত হইতে পারে এবং উভয়ে স্ব স্ব মার্গে আমাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু উভয়ে একই সময়ে কর্ত্তব্যত্বের দাবী করিতে সক্ষম নয়, কেননা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার ঐ প্রবৃত্তি গুলির হস্তে নয়,স্বাধীন বিবেকী মানবের হস্তে। এই জন্যই মানব ইতর প্রাণী অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ। এই শক্তি না থাকিলে মানব ও পশুতে কোনও বিভিন্নতা থাকিত না। পশু যেমন প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করে, মানবীয় কর্ম্মের পরিণাম ও নিয়ামকও যদি তাই হয় তবে মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। কিন্তু আমাদের সমালোচনা স্থানীয় কর্ত্তব্যবাদ ও প্রবৃত্তিবাদ একই কথা। নামভেদ মাত্র। ইহাকে নিঃসঙ্কোচে প্রবৃত্তিবাদ বলা যাইতে পারে। কারণ যাহা কিছু ইঁহাদের নিকট কর্ত্তব্য বলিয়া আত্মপ্রকাশ করে ইঁহারা তাহাকেই অনুসরণ করিতে প্রস্তুত,কেননা সকলই কর্ত্তব্য এবং কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার ইহাদের অন্য কোনও উচ্চতর অবলম্বন (মাপকাটী, Standard) নাই, থাকিলে ইহারা কখনই বলিতে সমর্থ হইতেন না যে সকলই কর্ত্তব্য, যেটী সম্পন্ন করা যায় তাহাতেই কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয়, তাহা-তেই পুরুষার্থ সাধিত হয়। এই মত যে অত্যন্ত অজ্ঞতা-প্রসূত, ইহা যে ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার উপর যে মানবীয় নীতিতত্ত্ব সংস্থা-পিত হইতে পারে না,মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ব্বাচনের ভার ইহার উপর দিলে যে কিছুতেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতে পারেনা, মানবের কর্ম্ম মাত্রই যে প্রবৃত্তির অনুসরণ হইয়া পড়ে তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং যখন দুইটী পরস্পর-বিরোধী কর্ম্মমার্গ কর্ত্তব্য বলিয়া আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করে তখন আমার নিকট এমন একটী মাপকাটী (Standard) থাকা চাই যাহা উভয়েরই অতীত এবং সকল মানবেরই মান্য, যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া আমি ঠিক করিব কোন্‌টী আমার পক্ষে কর্ম্ম ও কোন্‌টীই বা অকর্ম্ম। যেমন সমস্ত দেশে একটী খাঁটী ওজন-যন্ত্র থাকে যাহা সকলের পক্ষেই এক, যাহা সকলেরই Standard,ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে ওজন লইয়া মতভেদ হইলে উভয়েই যেমন সেই ওজন-যন্ত্রের আদেশ মান্য করিতে বাধ্য, নতুবা যেমন কোনও রূপেই উভয়ের বিরোধ ভঞ্জনের উপায় নাই, নীতি জগতেও তেমনি মানব সাধারণের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের একটী মাপকাটী আছে, যাহা সকলের পক্ষেই সমান এবং যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া মানব আপনার কর্ম্মপথ নির্দ্দেশ করিবে। ইহাই কষ্টিপাথর, ইহাতে ঘষিয়াই মানব কি কর্ম্ম কি অকর্ম্ম তাহা নিশ্চয় করিতে সমর্থ। নতুবা আমি যাহা কর্ত্তব্য মনে করি তাহাই কর্ত্তব্য এবং আমি সেই অনুসারেই চলিব, অন্য কোনও নিয়মের অধীন হইয়া চলিব না, এই ভাবে

কার্য্য করিলে সমাজস্থিতি অসম্ভব। ব্যক্তিগত খেয়াল মানবের কর্ত্তব্য-নিয়ামক হইতে পারেনা। বুদ্ধিমান্ জীব মানবের পক্ষে উদ্দেশ্য ও আদর্শবিহীন হইয়া কার্য্য করা অসম্ভব। এখন কথা হইতেছে,সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ? মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞানের ভিত্তি কোথায় ?

এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে এক বিস্তৃত স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়, আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে ইহার মীমাংসা করিতে যত্নবান হইব।

মানব সামাজিক জীব, সমাজ ছাড়িয়া তাহার বিকাশ ও উন্নতি অসম্ভব, মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ কেবল মাত্র সমাজেই সম্ভব, সমাজকে শরীর ধরিয়া ব্যক্তি সমূহকে নিঃসঙ্কোচে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলা যাইতে পারে, কারণ শরীরের ন্যায় মানবসমাজও একটী যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমাজকে ভুলিলে চলিবে না, সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের উপর ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এখন, যদি মানবত্বের পূর্ণ বিকাশই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, এবং তাহাই প্রজ্ঞানেত্রের নিকট মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে জীবনের আদর্শ ব্যক্তিগত না হইয়া সামাজিক হওয়া অপরিহার্য্য। পূর্ণ মনুষ্যত্বই এই আদর্শ এবং ইহা জীবনে আয়ত্ব করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং যে কার্য্য এই উদ্দেশ্যের অনুকূল তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং যাহা প্রতিকূল তাহাই অকর্ম্ম। এখন ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্যক্তিত্বের খেয়ালের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কর্ত্তব্য নির্ণীত হইতে পারে না অথবা দশটী কর্ম্মপথ আমার নিকট কর্ত্তব্য বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে, যে-কোন একটী সম্পাদন করিয়া কর্ত্তব্য উদযাপিত হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। যে কর্ম্ম ঐ আদর্শের যত অধিকতর নিকটবর্ত্তী এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির যত প্রবলতর সহায় তাহাই তত উচ্চতর কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। দুইটী বিরুদ্ধ কর্ম্ম যদি আমার নিকট উপস্থিত হয় তাহা হইলে যেটী দ্বারা আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে, এই আদর্শ আয়ত্তীকৃত হইতে পারে তাহাই কেবল আমার কর্ত্তব্যপদবাচ্য হইবে,অন্যটী অকর্ম্ম বলিয়া দূরে পরিত্যক্ত হইবে। ইহাই মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয়ের একমাত্র পন্থা, অন্য পথ নাই। এই সাধারণ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশকে সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে

মানুষ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া এবং পরস্পরের কর্ত্তব্য সাধনে সহায় হইয়া, স্বার্থ পরার্থ একীভূত করতঃ সংসারে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে।

আমরা উপরে যে আদর্শের কথা বলিয়া আসিলাম সেই আদর্শ—সাধারণ মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণ বিকাশ—ঈশ্বরে নিত্য সিদ্ধরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহা হইতে দুইটী স্রোত নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া একটী জনসমাজে বাহিরের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, নিয়ম পদ্ধতিরূপে এবং অপরটী মানব হৃদয়ে নীতিজ্ঞান, বিবেক বা ঈশ্বর-বাণী রূপে সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছে এবং ক্রমাগত সেই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, এই চেষ্টা হইতেই ঐ আদর্শ সমাজে ফুটিয়া উঠিতেছে। যখন এই দুই স্রোত সমান ভাবে প্রবাহিত হয় তখন সমাজ ধীর ও শান্ত ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে, কোনও অশান্তি বা বিরোধ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ঐশ্বরিক নিয়মের অনির্দ্দেশ্য কৌশল বশতঃ সময়ে সময়ে, যদিও ব্যক্তি সমাজেরই ফল, এই ব্যক্তিহৃদয় নিহিত অন্তঃস্রোত একটু খরবেগে বহিতে থাকে। ঐ আদর্শ ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে বাহিরের প্রকাশ অপেক্ষা পূর্ণতর আকার ধারণ করে। তখন ঐ আদর্শের অপেক্ষা বাহিরের সমাজে অনেক দোষ ও অপূর্ণতা দৃষ্ট হয়, এবং ফলস্বরূপ ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। এই ব্যক্তিত্বের প্রভাব সাময়িক, ইহা সমাজ-রোগের ভেষজ স্বরূপ। বিষ শরীরের ধ্বংসকারী হইলেও যেমন রোগ বিশেষে শরীর রক্ষার জন্যই বিষ প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, সমাজ-রোগের অবস্থা বিশেষে ব্যক্তিত্বের প্রাধান্যও সেইরূপ প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক অবস্থা নহে। ব্যক্তিত্ব আপনাকে সমাজে প্রভাবিত করিয়া সমাজের সঙ্গে পুনরায় একীভূত হইয়া যায়।

কিন্তু যতক্ষণ না এই কার্য্য সংসিদ্ধ হয় ততক্ষণ ব্যক্তি ও সমাজে বিরোধ চলিতে থাকে এবং এই সংঘর্ষণে সমাজ গঠিত হইয়া উঠে। ইহাই সমাজ-সংস্কার। এই সংঘর্ষণ, এই সমাজ চিকিৎসার প্রণালী অতি স্বাভাবিক। উহা সমাজের অভিব্যক্তির নিয়ম বিরোধী নহে। এই নিয়ম অনুসারে যখন যে হৃদয়ে এই আদর্শ পূর্ণতর ভাবে প্রকাশিত হয়, এই ঔষধ আবির্ভূত হয়, তিনি তাহা সমাজে প্রভাবিত করিতে বাধ্য, কারণ সেই জন্যই উহা তাহার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি তাহা করিতে পশ্চাৎপদ, যিনি এই চিকিৎসা-প্রণালী

অবলম্বন করিতে পরাঙ্মুখ তিনি ঐ আদর্শের নিকট, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট বিশ্বাসঘাতক এবং সমাজের নিকট কৃতঘ্ন আত্মাপহারী চোর।

যাঁহারা সমাজে থাকিয়া সমাজ সংস্কার করিতে এবং প্রকৃত সংস্কারকদিগের পথে সর্ব্বদা বাধা দিতে অগ্রসর তাঁহারা যদি এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখেন তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই বিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। শাস্ত্র এই শ্রেণীর লোকদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন :—

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং ন তেন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥

সমাজ-সংস্কারকদিগের বিপক্ষে আর একটী আপত্তি এই যে, যখন সময় আসিবে তখন সমাজ আপনিই সংস্কৃত হইবে, সেজন্য চেষ্টার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। এই আপত্তির উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে চেষ্টা ব্যতীত সময় কখনও আসিবে না। তাহার প্রমাণ এই যে, আজ য়ুরোপ ও আমেরিকা উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিতে যাইতেছে, কিন্তু হে ভারতবাসী, তুমি পঞ্চদশ শতাব্দীও অতিক্রম করিতে পারিলে না কেন? কারণ কঠোর সাধনায় তাঁহারা সময়কে করতলস্থ করিয়াছেন, আর সুনিদ্রায় তুমি সময় হারাইয়াছ।
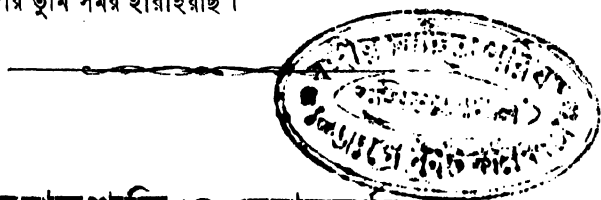
বেদান্তশ্রুতি ও বেদান্তদর্শন।

ভারতীয় অদ্বৈতবাদের মূল শাস্ত্র বা সাহিত্য "বেদান্ত"। বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের অন্ত বা বেদমীমাংসা। ইহার নামান্তর উপনিষদ্। কোন কোন উপনিষদ্ বেদসংহিতার অংশীভূত, যথা শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদ্। অপর কয়েক খানি ব্রাহ্মণ বা আরণ্যক ভাগের অন্তর্গত, অথবা স্বতন্ত্ররূপেই বেদাংশ বলিয়া পরিগণিত। উপনিষদ্ নামধারী গ্রন্থ মাত্রই প্রকৃত উপনিষদ্ বলিয়া গৃহীত হয় না; এতন্নামক অনেক গ্রন্থই সাম্প্রদায়িক, কৃত্রিম

বলিয়া উপেক্ষিত। ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকি, এই দ্বাদশ উপনিষদ্ বিশেষরূপে সম্মানিত। এতদ্দেশীয়—বঙ্গদেশীয়—অনেক লোকের "বেদান্ত" সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত ধারণা আছে; তাঁহারা 'বেদান্ত' শব্দে 'উপনিষদ্' না বুঝিয়া অপর কিছু বুঝেন। এদেশে বেদচর্চ্চার হীনতাই বোধ হয় এই ধারণার কারণ। যাহা হউক এই ধারণার ভ্রান্ততা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। উপনিষদ্ স্বয়ংই আপনাকে 'বেদান্ত' বলিয়াছেন, যথা 'মুণ্ডকোপনিষদে'—

বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥
(তৃতীয় মুণ্ডক, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ শ্রুতি)

পুনশ্চ, শ্বেতাশ্বতরে,—

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥
(৬ষ্ঠাধ্যায়, ২২তম শ্রুতি)

ভাষ্যকার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য শারীরক মীমাংসা ভাষ্যের সর্ব্বত্রই 'বেদান্ত' শব্দ উপনিষদর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা ভূমিকার শেষ ভাগে প্রথম সূত্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে,—

"অস্যানর্থহেতোঃ প্রহানায়াত্মৈকত্ববিদ্যা-প্রতিপ্রত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে। যথাচায়মর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথাচ বয়মস্যাং শারীরক-মীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ। বেদান্তমীমাংসা শাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যাহস্মাভিরিদমাদিমং সূত্রম্।" অর্থাৎ—এই অনর্থ হেতু অবিদ্যার বিনাশার্থ আত্মৈকত্ব-জ্ঞান লাভার্থ বেদান্তসমূহের আলোচনা আরম্ভ করা যাইতেছে। সর্ব্ব বেদান্তের যে ইহাই উদ্দেশ্য, তাহা আমরা এই শারীরক-মীমাংসায় প্রদর্শন করিব। আমরা যে বেদান্ত-মীমাংসা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার আদিম সূত্র এই।

পাঠক বুঝিলেন যে শারীরক-মীমাংসা শাস্ত্র স্বয়ং বেদান্ত নহে, বেদান্তের মীমাংসাগ্রন্থ মাত্র। আরও বুঝিলেন যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই মীমাংসা শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার; তাঁহার ভাষ্য স্বয়ং বেদান্ত নহে, বেদান্ত-মীমাং-

সাও নহে, বেদান্ত-মীমাংসার ব্যাখ্যা মাত্র। সুতরাং পাঠক যেন শঙ্কর অথবা অন্য কোন বেদান্ত-ব্যাখ্যাকার অথবা বেদান্তমীমাংসা-ব্যাখ্যাকারের উক্তিকে বেদান্ত বলিয়া মনে না করেন। একমাত্র উপনিষদ্ই প্রকৃত বেদান্ত; উপনিষদ্ সম্বন্ধীয় কোন মীমাংসা বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ "বেদান্ত" পদবাচ্য নহে, তবে এরূপ গ্রন্থকে "বেদান্ত দর্শন" বলা যাইতে পারে। কিন্তু "বেদান্ত দর্শন" শব্দটীরও অনেক স্থলে ভ্রান্ত অর্থ করা হয়; সুতরাং এ বিষয়েও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

বেদান্তের মীমাংসা ও ব্যাখ্যা অসংখ্য। কিন্তু তন্মধ্যে উপরি-উক্ত "শারীরক মীমাংসাই" সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত। এই গ্রন্থের অন্যান্য নাম "বেদান্ত-সূত্র" (অর্থাৎ বেদান্ত মত-ব্যাখ্যায়ক সূত্রগ্রন্থ), "ব্রহ্মসূত্র," "শারীরক সূত্র", (অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয় সূত্রগ্রন্থ) "উত্তর মীমাংসা" (অর্থাৎ বেদের উত্তর ভাগস্বরূপ উপনিষদের মীমাংসা) "ঔপনিষদী মীমাংসা" "ব্যাসসূত্র", "বাদরায়ণ সূত্র" ইত্যাদি। যাহা হউক, এই গ্রন্থ বেদান্ত দর্শনের প্রধান গ্রন্থ হইলেও ইহাই একমাত্র "বেদান্ত দর্শন" পদবাচ্য নহে। বেদান্ত মত-ব্যাখ্যায়ক গ্রন্থমাত্রই "বেদান্ত দর্শন" নামের অধিকারী, সুতরাং শঙ্কর-প্রণীত উপনিষদ্ ভাষ্য, শারীরক সূত্র-ভাষ্য, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকগণ-প্রণীত,'বেদান্তসার' 'পঞ্চদশী','বেদান্ত পরিভাষা' 'যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' 'বিচার-সাগর' প্রভৃতি বেদান্ত মত-ব্যাখ্যায়ক গ্রন্থও বেদান্ত দর্শনের অন্তর্গত। পুনশ্চ, মহাত্মা রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি যাঁহারা শঙ্কর হইতে ভিন্ন প্রণালীতে বেদান্ত মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থাবলীও "বেদান্ত দর্শনের" গ্রন্থ। তদনুসারে উপনিষদুক্ত মত-ব্যাখ্যায়ক ইদানীন্তন গ্রন্থাদিও "বেদান্ত দর্শন" নামের অনধিকারী নহে।

উপনিষদ্ বেদের অন্তর্গত বলিয়া শ্রুতিরূপে সম্মানিত। বেদান্ত সম্বন্ধীয় অন্য গ্রন্থ দূরে থাকুক্, "শারীরক মীমাংসা"ও এই সম্মানের অধিকারী নহেন। তবে উপনিষদের পরেই ইহার সম্মান। ইহা শ্রুতি না হইলেও ঋষি-প্রণীত বলিয়া স্মৃতির মধ্যে গণ্য। 'স্মৃতি' বলিতে পাঠক কেবল ব্যবস্থা শাস্ত্র বুঝিবেন না; যাহা শ্রুতি নহে অথচ ঋষি-প্রণীত তাহাই স্মৃতি। শঙ্কর শারীরক সূত্র-ভাষ্যে "ভগবদ্গীতাকে" বার বারই স্মৃতি বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন। যাহা হউক, অতি প্রাচীন কাল হইতেই উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা,এই তিনখানি গ্রন্থ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক প্রধান গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থত্রয়কে 'প্রস্থানত্রয়' কহে। মহাত্মা শঙ্কর ও রামানুজ এবং অন্যান্য অনেকে এই "প্রস্থানত্রয়ের" ভাষ্য লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থত্রয়ই বেদান্তধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্র বা সাহিত্য।

KESHUB CHANDRA SEN, THE APOSTLE OF HINDU THEISM.*

THERE seems to be a singular incompatibility between the subject and the appointed speaker of the present meeting. One who, apart from his occasional speeches at denominational meetings, is not a public speaker at all, has undertaken to lecture on one, who, besides his other excellences, was one of the most eminent orators of his time. But, gentlemen, I think you will agree with me when I say that there are things which one must do, and do at the right time, however ill-prepared he may be for doing them. Such a thing is, according to Hindu ideas at any rate, the *sraddha* ceremony of one's parents or other very near relatives. On an occasion like that, you cannot plead inadequacy of preparation as an excuse for either the non-performance or postponement of the sacred rite. You must perform it, and that at the day fixed by Scripture and tradition, and must not mind even if you are ill-spoken of for the unsatisfactoriness of your preparations. The present seems to be an occasion like that. Though not in name and form, yet in spirit, it is a *sraddha* ceremony that I am going to perform and to which I have

* The substance of an address delivered by Babu Sitanath-Datta Tattvabhushan, Head Master, Keshub Academy, at the Academy premises, on Mr. Sen's last birth-day, November 19, the Rev. J. Morrison, M.A. B.D. presiding.

invited you as witnesses. To-day is Keshub Chandra Sen's birth-day, and not the day of his death. In name, therefore, it is not his *sraddha* day ; and so far as form is concerned, we, the followers of Keshub Chandra Sen, have discarded the material appendages of the ordinary *sraddha* ceremony as inconsistent with our view of the spirituality of the other world. But Keshub Chandra is no more with us, and we are not allowed to have those rejoicings naturally connected with a birth-day observance which would take place if the departed one were with us. His birth-day and the day of his ascension have become the same with us ; we celebrate both by meditating on and discussing, with whatever devoutness we can command, his extraordinarily pure, pious and useful life, and his noble, saving utterances. It was this which led me to say that though not in name and form, yet in spirit, it is a *sraddha* ceremony that we are going to perform, a ceremony having for its object the expression of our *sraddha* or respect for the sacred memory of the departed teacher by devout meditations on his life and work in general, or some particular aspect of his teachings. That this is a duty we cannot put off, is also clear. This school bears the honoured name of Keshub Chandra Sen. It is a memorial, a very humble memorial no doubt, of the great reformer, raised by a loving and beloved disciple, and now maintained by a deeply admiring follower. My humble self is at the head of its teaching staff, and must see that the institution remains true to its name and keeps up its best traditions, and even, if possible, becomes more and more deserving of the great name it bears. I need hardly say, however, that so far as the present duty, at any rate, is concerned, that of addressing, and if possible, enlightening you a little on Mr. Sen's life-work, I feel my inability very deeply, and would not have undertaken the task if it could be put off. But it cannot be put off. The relations, not only of the school, but of my own humble self, with the great soul

we have met to honour, are most intimate. Notwithstanding minor differences on some doctrinal and practical points, I profess to be a humble follower of Keshub Chandra Sen. He is my spiritual father. His spiritual blood,—the noble thoughts he inspired, the lofty ideals he preached and pursued, the subtle, unspeakable emotions that he aroused in the inmost recesses of the soul,—run through my inner organism, and make my ethical and spiritual life, however humble it may be, possible. I feel, therefore, that it is my duty, both as an officer of this school, and as individually tracing my spiritual lineage to Keshub Chandra Sen, to pay a tribute to his memory to day in the manner arranged, without minding the poverty of my preparation.

I purpose to speak of Keshub Chadra Sen as the Apostle of Hindu Theism. My purpose will be fulfilled if I explain every term of the title of my address. I need not tell you in detail who Keshub Chandra Sen was. I need not dwell upon the particulars of his life and work. His life has been told and re-told several times. For those who have not yet had occasion to go through a biography of Mr. Sen, but wish to do so in future, I may mention the chief books that have been written on the subject. The most detailed life of the great teacher is the one which some of his immediate disciples, Pandit Gour Govinda Ray Upadhyaya among them, are writing in Bengali. Five volumes of this book have been already published and perhaps two or three more will complete it. The next to be mentioned is that written in English by Babu Pratap Chandra Mozumdar, the work of a devoted but at the same time impartial follower and friend of Mr. Sen's. The two others I shall mention is a Bengali Life by Babu Trailokyanath Sanyal, a pious follower of Mr. Sen, who goes under the assumed name of Chiranjiva Sarma, and an English Life by the Rev. Mr. Slater, a Christian Missionary. For those who know Keshub Chandra only by name, and there may be such

in this assembly, I shall give a few bare details of his life, specially as, without some such details, the subsequent portion of my address will be unintelligible to them. Keshub Chandra Sen was born in 1838. He studied English and Philosophy at the Hindu College, but left it without taking any academical degrees or other distinctions. About 1857, he joined the Brahmo Samaj, which was then in the second stage of its progress, under the pious guidance of its second great leader, Maharshi Devendranath Thakur. He helped the Maharshi in strengthening the theological and social foundations of the Samaj and in extending its influence far and wide; but in the course of a few years, differences of a practical nature, on the methods of religious and social reform, grew between the two leaders, and Keshub Chandra separated from his venerable friend with a number of devoted followers. In one word, the point of difference may be said to have been "Caste." Keshub Chandra was for an immediate abolition of caste from the ideal society of Hindu reformers that was forming, whereas the Maharshi was opposed to the adoption of any drastic measures in the matter. The subsequent career of our reformer, as the leader of the Brahmo Samaj of India established by him shortly after his secession from the parent church, is characterized by singular earnestness and activity. The result was the dissemination of his views throughout the country and even in distant Europe, which he visited, and to a certain extent in America also. But according to the laws that govern society, the radical of to-day often proves to be the conservative of to-morrow, and so by and by, through Keshub Chandra's own reforming activity, there grew around him men whose views were in advance of his in matters of reform and church government. These differences culminated on the occasion of the marriage of Mr. Sen's first daughter with the Maharaja of Kuch Behar, and there followed a second schism in the Brahmo Samaj.

Mr. Sen's labours after the establishment of the Sadharan Brahma Samaj by those who differed from him assumed an eminently synthetic and constructive character. He aimed at the formation of a church which should combine and conserve all that is good in the various established churches, and yet should not be a body of wild eclectics without historical foundations to stand and work upon, but should proceed on lines laid down by the collective experience of the nation, so far as these were consistent with liberal ideas. I need not pronounce any judgment upon his success, nor upon his differences with those who opposed him. Suffice it to say that in all that he did, in all that he succeeded or failed in doing, he aimed at the good of his country, which he loved with all his heart and soul, and that for his life-long labours in its service, the country owes him "a debt immense of endless gratitude." These labours, however,—the labours of concentrated thought, of intense devotional exercises, of writing and speaking, of cares for a divided church which, though burdened with the deepest responsibility, yet seemed inadequately conscious of it—were too much for a frame nursed under principles too ascetic and rigorous, and the great reformer passed away in 1884, at the early age of 45.

I have now told you who Keshub Chandra Sen was, I have told you enough that can distinguish him from other individuals and hold out his personality in a prominent manner. I shall now tell you why I call him an apostle. An apostle is one that is sent out on a special mission. Was Keshub Chandra Sen specially sent out by God, and had he really a mission to fulfil? I say yes, and in proof of my assertion I adduce the strongest of all possible evidence—facts. A tree is known by its fruits. When we find a tree producing sweet mangoes, we come to the conclusion that it has God-given powers to do so and is designed by the Author of Nature to discharge this function. Likewise, judge Keshub

Chandra Sen by his work. Trace the ideas he has preached and made like current coin in the country, to their source. See how they have taken root in the mind of educated India, how they are unconsciously guiding even those who are professedly opposed to his views, and how they are effecting a slow but sure change in our thoughts and feelings,our sympathies and antipathies, and in our practical conduct, individual and social. So far as the result of Keshub Chandra Sen's work is concerned, Keshub Chandra Sen is not dead, but is living anew every year, I might say every day; for the work inaugurated by him, the establishment of a reformed and growing society, guided on national lines by free and liberal ideas on religion and society,is daily prospering,—directly by visible addition to the body established by him, and indirectly by the gradual permeation of the great mass of the nation by his ideas. To those who can judge and estimate evidence, this is an unmistakable proof of Keshub Chandra Sen's apostleship.

I have called Keshub Chandra Sen the apostle of Hindu Theism. I shall say a few words in explanation of the word 'Theism', and in that of my calling Keshub Chandra the apostle of Theism. Theism is the doctrine of one God, of one personal God, if 'personal' is the word that expresses his transcendent knowledge, the knowledge that oversteps the limits of space, time and individuality. It is opposed, first, to Atheism, the doctrine of the non-existence of God, secondly to Agnosticism, the view that the cause of the world is unknown and unknowable, thirdly to Polytheism, the notion of a plurality of Divine persons, fourthly to Pantheism, the theory that ignores the transcendent aspect of the Divine nature, that sees no distinction between Divine power as it manifests itself in the form of objects in time and space and the Divine essence beyond Nature, and thus denies the existence of either of these aspects of Reality; and lastly to

Deism, which, ascribing the creation of the world to God, yet denies his direct guidance of Nature and his immediate relation to the human mind. This is Theism, the doctrine of a living, personal God in immediate relation to Nature and man. This is the religion which Keshub Chandra embraced in his early youth, which he felt called upon by God to preach, and for the propagation of which he lived and died. In calling Keshub Chandra Sen the apostle of Theism, I am far from meaning that I hold him to be the only apostle of this religion. This religion has been preached, both in this and other lands, by a host of apostles ancient and modern, and even in the small body of Theistic reformers that Keshub Chandra joined in his early youth, he had two eminent predecessors on the apostolic line, I mean Raja Ram Mohan Ray and Maharshi Devendra Nath Thakur. But I really believe that in certain respects Keshub Chandra was the most eminent of Theistic apostles. The combination of reforming zeal with intense spiritual fervour is a thing extremely rare in religious history, especially in the history of free, rational religion. This rare combination was realized in Keshub Chandra Sen, and in a degree unknown in the history of Theism, both here and elsewhere. Keshub Chandra was a reformer and a saint, and he continued to be so to the end of his life. However conservative he may have seemed to some of us in his latter days, his reforming zeal never left him. What may be described as the most conservative act of his life, his daughter's marriage with the then minor Maharaja of Kuchbehar, was, it must be remembered, an inter-caste marriage,—a most radical step from one point of view. As to his devotional fervour, nothing need be said by me. His opponents believed in it so deeply that they wished he had rather less of it than more. For these reasons, the definite article before "apostle" is not without its significance. It can be said truly that Keshub Chandra Sen preached Theism in a way that no one else did.

I now come to the adjective I have put before the word Theism. What do I mean by 'Hindu Theism,' and in what sense was Keshub Chandra Sen's 'Theism' Hindu and not otherwise? In the most general sense of the term 'Hindu,' 'Hindu Theism' may mean any species of Theistic doctrine preached by a man belonging to the Hindu nation. If any one likes, one may confine the phrase 'Hindu Theism' to this wide meaning and call Keshub's Theism "Hindu Theism" in no other sense than this. But I have called it "Hindu Theisn" in a deeper and more special sense. There have been three distinct types of Theism in the history of religion, and these three types still divide the Theistic thinkers of the world. They are the Hebrew, the Greek and the Hindu types. To put their distinctive features briefly,—Hebrew Theism is the doctrine of an Author and Preserver of the world who has moral relations with the individual soul, but who is nevertheless distinct and apart from the world and the human spirit. Greek Theism,—if we leave out that form of it which, under the name of Neo-platonism, was intimately connected in form, and perhaps in history also, with Hindu Theism,—teaches the existence of an Author of Nature, who, though he guides the world in general, and desires human virtue, has no direct relation to individuals. Thirdly, Hindu Theism believes in an infinite, spiritual Being who manifests his power in the form of Nature and makes the human soul out of his own essence, and is thus immanent in Nature as its very power and substance, and in Man as the Soul of his soul, and guides the latter, through various stages of progress,to final union with him. In various respects, too numerous to be detailed even briefly, this last form of Theism differs from what goes under the same name in Europe and other parts of the word. It has itself various forms according to varying conditions of individual and social progress; but it has characteristics which distinguish it from

the two other forms mentioned, whatever forms it may assume according to the spiritual capacities or surroundings of its believers. In its doctrinal aspect, it clings to a belief in the immanence of God in Nature and Man, and never ventures to think of them as independent of God. In its practical aspects, it is characterized by a hankering after communion with God, and can never bear to keep God far from the soul. The most ancient as well as the most revered literature of this form of Theism are the Upanishads, otherwise called the Vedantas or the Vedanta, and next to them, the works of their numerous commentators and expounders. Hindu Theism is therefore identical with Vedantism, though this latter name has often been wrongly appropriated to a particular interpretation of the religion of the Upanishads. Now, what I would show is that Keshub Chandra Sen's Theism, though it changed its form from time to time according to the laws of spiritual progress, was always of this Hindu or Vedantic type. To make this clear, to answer possible objections to the view I take, it would be necessary to enter into a few details of the history of his own life and of the body to which he belonged.

It may be said at the very outset, that the Brahmo Samaj, though originally a body of Vedantic worshippers, had, even before Keshub Chandra's connection with the body commenced, discarded Vedantism and committed itself to a bare, colourless Theism or some other historical type of Theism than the Hindu. Now, as to this movement, miscalled by Brahmos, and even by Keshub himself, the "discarding of Vedantism," it is necessary to say that it was more the dogma of Vedic infallibility that was overthrown on the occasion than anything else. The then members of the Brahmo Samaj had been believing in their ignorance, that the Vedas, the Vedantas included, could not contain anything repugnant to their enlightened views. A study of the Vedas dissipated this hope and they dis-

carded their belief in the infallible inspiration and authority of the National Scriptures and called this rather mild reform by a too strong name—"the discarding of Vedantism." It is indeed true that while discarding the dogma of Scriptural infallibility, they also spoke a good deal about the Vedantic doctrines of the unity of God and Nature and of God and man, and that of the transmigration of the soul,—doctrines which at that time they were neither intellectually nor spiritually advanced enough to understand,—to separate from the tentative expressions in which they were couched in Vedantic writings. However, what I mean specially to point out is that notwithstanding this formal discarding of Vedantism, the religion of the Brahmo Samaj remained, in spirit, deeply Vedantic, a fact that is proved by the sermons of the venerable leader of the Samaj in those times, and also by the same gentleman's annotated selections from the Vedas, the work entitled *Brahma Dharma*, of which Keshub Chandra says in his lecture on the *Brahmo Samaj Vindicated*, delivered in 1863 :—

"Though the Vedas were no longer regarded as the basis of Brahmoism, and their errors and absurdities were abjured, the good things in the superstructure were retained and continue to this day ; and the *Brahmo Dharma* book of the present day contains the truths of the Vedanta with natural reason for their basis."

Keshub Chandra Sen then, in entering the Brahmo Samaj, and embracing its religion, entered a body of Hindu Theists, and began to profess a species of Hindu Theism. What his later opinion was in regard to this so-called "discarding of Vedantism," will be seen as we go on. In the mean time, his Theism grew in depth and clearness, and in explaining his theory of "Great Men" in 1866, he said :—"If incarnation means the spirit of God manifest in human flesh, certainly every man is an incarnation. And great men are pre-eminently so, for they exhibit a larger measure of the divine

spirit. They are singularly brilliant manifestations of that Eternal Light which all men in some measure reflect."

The Vedantic doctrine of universal incarnation hinted in these lines was developed further as Keshub grew in spirit, and in 1879 it was applied the explication of the Christian doctrine of incarnation. I shall make only one extract—a very significant extract—from the lecture on "India asks—Who is Christ?" in which this exposition is given. "Meanwhile," says Keshub Chandra Sen, "I must beg your acceptance of the truly national solution of the problem I have presented to you. You will find on reflection that the doctrine of divine humanity is essentially a Hindu doctrine, and the picture of life and character I have drawn is altogether a picture of ideal Hindu life."

In the lecture on "*God-vision in the Nineteenth Century*, delivered in 1881, the Hindu or Vedantic form of Keshub's Theism has attained its fulness. *Yoga*, union with God, the Vedantist's highest goal, became, in later life, Keshub's highest object, his very watchword, and he scarcely said anything that did not bear upon this subject. I had marked out many passages from both his Bengali and English discourses, bearing on the point contended for by me, but I shall put them off for want of time and content myself by reading, first a few passages from his essay on "*Yoga*: Subjective and Objective," and then a few from a Bengali sermon preached in the Brahma Mandir.

Speaking of subjective or Vedantic Yoga, in the essay referred to, Keshub Chandra says: "Instead of confronting single foes and vanquishing special vices, he (the Yogi) goes valiantly into the very heart of the enemy's citadel, and tries to overthrow it completely. His ethics is not negative and destructive, but positive and constructive. His ideal of moral and spiritual perfection is not No-sin, No-sensuality, No-worldliness, No-pride, but positive Godliness. He seeks not

retirement from the world, but admission into heaven. He will have no other salvation than the absorption of I, mine and me in the God-head. And this absorption he endeavours to bring about by constant contemplation. So thoroughly does he concentrate his attention in the reality of the Infinite Spirit, that his little unreal self gradually wanes and fades away, like the borrowed and reflected radiance of the moon before the rising sun. When the real comes, the unreal disappears. It is quite clear now that there is no power in self but it is of God ; no wisdom, no love, no holiness, but it is Divine."

I shall next read to you a few extracts (in translation) from a Bengali sermon on "the National Dispensation" preached in the Brahma Mandir and published in the second volume of the series, *Sevaker Nivedan* :—"We shall revere, says the great preacher, "the saints of all nations····but our New Dispensation cannot be a Jewish, Greek or Muhammadan dispensation, it will remain fundamentally a Hindu dispensation......This tree, grown by the Hindu race, must first be deeply rooted in Hindustan, must be nourished with Hindu blood, and then spread its branches on all sides······ The Brahmo of the New Dispensation is the only true Hindu ······It is improper to denounce the Brahmos as anti-Hindu, as men who have forsworn their nationality and religion ; this is not true ; in reality the Brahmos are the only true Hindus."

Keshub Chandra Sen and his disciples must now have felt that the so-called discarding of Vedantism by the Brahma Samaj was a mistake,—that though they could not accept now, any more than at the time of their joining the Somaj, the dogma of Vedantic infallibility—a dogma, which, by the way, is not to be found in the Vedanta itself—they were, in spirit, and in essential doctrines, nothing but Vedantists. It was therefore distinctly declared in the columns of their

journal, the *Liberal,* that the Apostolic body, or the New Dispensation Church, had returned to the Vedanta. This announcement was made on the 7th June, 1885, shortly after Keshub's death, and presumably therefore in his spirit and under the inspiration of his teachings. I shall read to you the passage which contains it: "*Our Return to the Vedanta.*—We need not say very much upon our return to the Vedanta. This is a known fact. The foundation of Brahmoism was laid upon the *Upanishads.* Although we have advanced, the foundation remains the same."

Let it be known and remembered then, in all our controversies, that Keshub's Theism is Hindu Theism, a refined form, suited to the times, of the exalted Theism of India's early Theistic teachers, and that Keshub Chandra was a true descendent of the Rishis, one who deserves the profoundest reverence of the nation as a reviver, purifier, preacher and organizer of their deeply spiritual religion.

প্রত্যক্ষ সাধন।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন। পাশ্চাত্য ঋষি এমারসন্ বলিয়াছেন "The simplest person, who in his integrity worships God, becomes God."—অতি সরল (অর্থাৎ অজ্ঞ) লোক যে, সেও প্রকৃতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিলে ব্রহ্ম হইয়া যায়। এস্থলে সাধকগণ ব্রহ্মে লয় হওয়ার কথা বলেন নাই, উপাসনা-

রাজ্যের—যোগ রাজ্যের—একটী গভীর অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। এস্থলে ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ ব্রহ্মের সহিত গূঢ় একত্বানুভব—ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ, মনের মন, অন্তরাত্মা রূপে উপলব্ধি—তাঁহাকে আত্মাতে মূর্ত্তিমান জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতারূপে অনুভূতি। যতদিন তাঁহাকে এইরূপে উপলব্ধি না করা যায়, ততদিন প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না, প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা সম্ভোগ করা হয় না। জীবনে যতক্ষণ এই গূঢ় ও মধুর একত্ব বোধ থাকে, ততক্ষণই ব্রহ্মযোগের অবস্থা, আত্মার প্রকৃত জাগ্রত অবস্থা, প্রকৃত সুস্থাবস্থা। যে পরিমাণে আমরা এই ভাব উপলব্ধি করি, সেই পরিমাণে আমরা যোগী, উপাসনাশীল, প্রেমিক ও পবিত্র।

উপাসনার তিন অঙ্গ, ব্রহ্মকে জানা বা ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্মকে প্রীতি ও ভক্তি করা বা আরাধনা, ও ব্রহ্মের ইচ্ছাতে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ঢালিয়া দেওয়া বা প্রার্থনা। এই তিন অঙ্গের যে অঙ্গই সাধন করা যাক্ না কেন, ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ জ্ঞান-চক্ষে দর্শনই করা যাক্, আর হৃদয়ের গাঢ় প্রীতিতে আলিঙ্গনই করা যাক্ আর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা সহকারে তাঁহার পবিত্র ইচ্ছার শরণাপন্নই হওয়া যাক্,—তাঁহাকে সত্যরূপেই উপলব্ধি করা যাক্ আর মধুররূপে উপলব্ধি করা যাক্, আর সুন্দর রূপেই উপলব্ধি করা যাক্, উপলব্ধি মাত্রই একত্বব্যঞ্জক। যতক্ষণ একত্ববোধ না হয়, ততক্ষণ উপলব্ধি হয় না, আর যে পরিমাণে একত্ব-বোধ সেই পরিমাণেই উপলব্ধি। কিঞ্চিৎ বিশেষ আলোচনা দ্বারা এই কথার সত্যতা দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপে উপলব্ধি। ব্রহ্ম কেবল সত্য নহেন, তিনি সত্যস্বরূপ, একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যবস্তু। এই সত্যবস্তু জ্ঞানরূপী। জ্ঞানই একমাত্র সত্যবস্তু। জ্ঞান ছাড়া সত্য কিছুই নাই, জ্ঞানের বাহিরে কিছুই নাই। বিষয়-বিষয়ীর প্রভেদ, চেতন-অচেতনের প্রভেদ, সসীম-অসীমের প্রভেদ,—সমুদায়ই জ্ঞানের ভিতর। দেশ, কাল, জড়, চেতন, সমুদায় এক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় জ্ঞান বস্তুতে অবস্থিত রহিয়াছে। এই অনন্ত জ্ঞানবস্তুই ব্রহ্ম। এই জ্ঞানরূপী বস্তুকে খুঁজিতে হয় না, তিনি আমাদের প্রত্যেকের জ্ঞানরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আমার প্রত্যেক জ্ঞানকণিকা তাঁহার জ্ঞান, তিনি জ্ঞানরূপে আমাতে প্রকাশ পাইতেছেন। আমার আত্ম-

জ্ঞান তাঁহার আত্মজ্ঞান, আমার দর্শন তাঁহারি দর্শন, আমার শ্রবণ তাঁহার শ্রবণ, আমার স্পর্শ তাঁহার স্পর্শ। আমার আত্মজ্ঞানকে আমি ক্ষুদ্র বলিয়া ভ্রম করি। ইহার প্রকাশই ক্ষুদ্র, মূলে ইহা ক্ষুদ্র নহে। আমার সম্মুখস্থ বিষয়সমূহে যেমন ইহা বর্ত্তমান, অতি দূরস্থ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রেও ইহা তেমনি বর্ত্তমান। এই মুহূর্ত্তে যেমন ইহা বর্ত্তমান, কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বেও তেমনি ইহা বর্ত্তমান ছিল, কোটী কোটী বৎসর পরেও ইহা বর্ত্তমান থাকিবে। জ্ঞান এক অখণ্ড, অনন্ত দেশকালব্যাপী। আত্মজ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের আধার ও উপাদান। আত্মাকে না জানিয়া আর কিছুই জানা যায় না, সমুদায় জ্ঞানের সঙ্গে আত্ম-জ্ঞান জড়িত, এই অর্থে আত্মজ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের আধার। যাহা কিছু জানি, আমার অনুভব রূপেই জানি, সমুদায় তত্ত্বই—"আমি অনুভব করিতেছি" এই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র, ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ মাত্র, এই অর্থে আত্মজ্ঞান সমু-দায় জ্ঞানের উপাদান। জগৎ জ্ঞানময়, চারিদিকে কেবল জ্ঞানেরই প্রকাশ। সুতরাং জগৎ আত্মময়, চারিদিকে কেবল আত্মারই প্রকাশ। যখন যাহা দেখি তাহা আত্মারই—যাহাকে "আমি" বলি তাহারই—ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সমুদায় দর্শনই আত্মদর্শন, সমুদায় জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। এই আত্মাই আকাশ-রূপী, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্ররূপী, বিচিত্র বৃক্ষলতা ও জীবরূপী, অন্ন জল ও বস্ত্ররূপী, গৃহ পরিবার ও বন্ধুরূপী, যাবতীয় বিচিত্র বস্তুরূপী। তিনি পরমাত্মা, অনন্ত দেশ কাল ব্যাপী, অনন্ত রূপধারী, বিশ্বরূপী, বিরাট পুরুষ। এই সত্য ধ্যানযোগে উপলব্ধি করার নামই ব্রহ্মদর্শন; ইহাই ব্রহ্মোপাসনার প্রথমাঙ্গ। ব্রহ্মের সহিত জ্ঞানে একত্ববোধ, প্রাণে একত্ববোধ, সত্তায় একত্ববোধ, তাঁহাকে প্রাণরূপে, আত্মারূপে, আমার আমিত্বরূপে উপলব্ধি করা—ইহাই জ্ঞানসাধনের সার। এস্থলে বস্তুতঃই "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

(ক্রমশঃ)
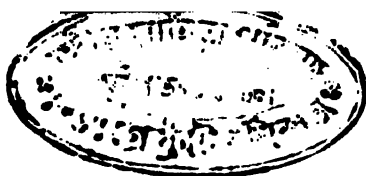
প্রথম ভাগ। ব্রহ্মতত্ত্ব তৃতীয় সংখ্যা।

প্রত্যক্ষ সাধন।

(দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।)

সচরাচর যে সত্যস্বরূপ সাধনের কথা শুনা যায় তাহা এরূপ নহে। প্রচলিত সাধনে ঈশ্বরকে জগৎ কৌশলের কুশলীরূপে বা প্রাকৃতিক কার্য্যের কর্ত্তারূপে, আত্মার স্রষ্টারূপে বা কোন অস্পষ্ট অবোধ্য অর্থে আত্মার আধাররূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা হয়। এরূপ সাধনকে উপলব্ধি বলা যায় না—ইহা ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অস্পষ্ট ও পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। যেখানে কৌশল ও কুশলী, কার্য্য ও কর্ত্তা, সৃষ্ট ও স্রষ্টা, আধার ও আধেয়ের স্বাতন্ত্র্যবোধ রহিয়াছে, একত্ব বোধ জন্মে নাই, সেখানে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন, অসম্ভব। সেখানে কৌশল কুশলীকে ঢাকিয়া রাখে, প্রকাশ করে না; সেখানে কার্য্য কর্ত্তার আবরণ, কর্ত্তার প্রকাশ নহে; সেখানে সৃষ্ট ও আধেয় স্রষ্টা ও আধারের প্রাপ্তি পথের কণ্টক, সহায় নহে। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নহে, ব্রহ্মানুমান মাত্র; এরূপ ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মদর্শন নহে, ব্রহ্মচিন্তা মাত্র; এবং এরূপ জ্ঞান ও চিন্তাতে যাহাকে ভাবনা ও চিন্তা করা হয় তিনি সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড ব্রহ্ম নহেন, তিনি সসীম দেবতা মাত্র।

জ্ঞান-সাধনে যেমন প্রেমসাধনেও তেমনি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ, পার্থক্যব্যঞ্জক ও একত্বব্যঞ্জক, দুটী প্রণালী আছে। যোগ ব্যাপারটা মূলে একই। যেমন প্রত্যেক দর্শনই আত্মদর্শন ও ব্রহ্মদর্শন, তাহা আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, তেমনি প্রত্যেক প্রেমানুভবই ঈশ্বর-প্রেমানুভব, প্রত্যেক প্রীতিই ঈশ্বর-প্রীতি, আমরা তাহা বুঝি আর নাই বুঝি। যেমন আত্মাকে জাগ্রৎ অবস্থায় রাখা, আত্মাকে প্রকৃতরূপে দেখাই ব্রহ্মদর্শনের সার কথা, তেমনি আত্মাকে প্রীতিতে

পূর্ণ রাখা, নিজে প্রেমসাগরে নিমগ্ন হওয়া ও আত্মগত প্রীতিকে ঈশ্বর-প্রীতি বলিয়া উপলব্ধি করাই প্রীতি সাধনের সার কথা। যেমন মূলে আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখি না ও দেখা সম্ভবও নহে, তেমনি আত্মাতে সঞ্চারিত প্রীতি ভিন্ন অন্য কোন প্রীতি প্রকৃত অনুভবের বিষয় নহে—আত্মাতে প্রীতির উদয় না হইলে ঈশ্বরপ্রীতি-উপলব্ধি, ঈশ্বরপ্রীতি-সম্ভোগ সম্ভব নহে। যে পরিমাণে জ্ঞানের একত্ববোধ সেই পরিমাণে ব্রহ্মদর্শন। তেমনি যে পরিমাণে আত্মা স্বয়ং প্রীতিমান হয়, সেই পরিমাণেই ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-ভক্তি সম্ভবপর। একটু বিশেষ ভাবে দেখা যাক্। গভীর, উন্মত্ত, আত্মবিস্মৃত মাতৃপ্রেম ঈশ্বর-প্রেমের নিদর্শন, ঈশ্বরপ্রেমের প্রকাশ,—সকলেই ইহা স্বীকার করেন; কিন্তু এই প্রেম যদি কেবল মাতার হৃদয়েই থাকিত, তবে আমি ইহার কিছুই জানিতাম না। ইহাদ্বারা আমার আত্মার উপকার কিছুই হইত না। যখন মাতৃপ্রেম চিন্তা করি, উপলব্ধি করি, তখন বস্তুতঃ আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়, তখন আমার হৃদয়ে মাতৃপ্রেম সঞ্চারিত হয়, তখন আমার হৃদয় মাতার হৃদয়ের অনুরূপ হইয়া যায়। একটী শিশু সন্তানকে চিন্তা করিয়া যে পরিমাণে ইহার সম্বন্ধে আমার হৃদয় কোমল, মুগ্ধ, উন্মত্ত, আত্মবিস্মৃত ও যত্নপ্রবণ হয়, অর্থাৎ যে পরিমাণে আমি মাতৃরূপী হইয়া যাই, সেই পরিমাণেই আমি মাতৃপ্রেম অনুভব করিতে সমর্থ হই। পরোক্ষ সাধক মাকে চিন্তা করিয়া এবং এই চিন্তার সাহায্যে ঈশ্বরপ্রেম অনুমান করিয়াই পরিতৃপ্ত হন; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী প্রত্যক্ষ সাধক দেখেন, মা কেবল বাহিরে নহেন, মা ভিতরেও, মা কেবল ওখানে নহেন, মা এখানেও রহিয়াছেন। এক সাধারণ মাই এই দুই স্থলে বিদ্যমান। এই দেখিয়া তিনি প্রত্যক্ষ আত্মস্থ মায়ের উপাসনায় মগ্ন হন। এই উপাসনাই একত্বব্যঞ্জক; ইহাতে উপাসক উপাস্যের সঙ্গে একীভূত হইয়া যান। পুনশ্চ, ঈশা বা ঈশার অনুরূপ অন্য কোন সাধুর প্রেমের কথা ভাবুন্। সাধু ভগবৎ প্রেমে মত্ত, নিজের স্বার্থের ভাবনা, সুখ দুঃখের ভাবনা, জীবন মরণের ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, সাধু পরপ্রেমে পাগল হইয়া, পরভাবনার ভাবুক হইয়া, পরের সঙ্গে এক হইয়া পরসেবায় ব্যস্ত রহিয়াছেন। পরের জন্য অম্লান-বদনে সহস্র দুঃখ ভোগ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। হৃদয়ের সমুদায় সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়াছে, হৃদয় সমগ্র জগৎকে আপন বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে।

এই প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের জীবন্ত প্রকাশ। কিন্তু প্রকাশ অর্থ এই নহে যে ঈশ্বর এই প্রেমকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সৃষ্ট প্রেম স্রষ্টার প্রেমের পরিচয় দিতেছে। স্থূলদর্শী পরোক্ষ সাধক ইহার অধিক জানেন না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী দেখেন, এই প্রেম ঈশ্বরেরই প্রেম। প্রেমময় ঈশ্বর স্বয়ং সাধু জীবনে অবতীর্ণ হইয়া এই প্রেমলীলা করিতেছেন। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। যে প্রেম সেখানে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই প্রেমই আবার এখানে আমার হৃদয়ে প্রকাশিত। এই প্রকাশই আমাকে ঐ সকল প্রেমলীলা বুঝাইতেছে, দেখাইতেছে। ইশার প্রেম বুঝিতে গিয়া আমি ইশারূপী হইতেছি। আমি যে পরিমাণে ইশারূপী হইতেছি সেই পরিমাণেই ইশাকে বুঝিতেছি। আমি যখন তাঁহার বৈরাগ্য ও আত্মবিস্মৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হই, তখন আমার হৃদয়ও বৈরাগী ও আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়; আমি তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া যাই। আমি যখন তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমা ও আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়া স্তম্ভিত হই, যখন আমার হৃদয় এই ক্ষমা ও আত্মবিসর্জ্জনকে প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত আলিঙ্গন করে, তখন আমার হৃদয়ও এই ক্ষমা ও আত্মবিসর্জ্জনের ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যায়; আমি ইশার সহিত এবং ইশার ইশাত্ব যিনি তাঁহার সহিত এক হইয়া যাই। তখন দেখি, যে অনন্ত হৃদয় ইশাজীবনরূপ লীলা করিয়াছিল সেই অনন্ত হৃদয়ই আমাতে প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকাশিত হইয়া সেই নির্ম্মল প্রেমজ্যোতি প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে জগতে ঈশ্বর প্রেমের যত উজ্জ্বল প্রকাশ আমরা অবগত আছি,—যত ইশা, যত বুদ্ধ, যত চৈতন্যের কথা শুনি, যত হাওয়ার্ড, যত নাইটইনগেল, যত মিস কার্পেণ্টার, যত ভগ্নী ডোরা, যত ফাদার ড্যামিয়ানের বিষয় অবগত হই,—সমুদায়ের প্রেম উচ্চ সাধনার সময়ে সাধকের জীবনে প্রকাশিত হয়। এক অখণ্ড প্রেমিক হৃদয় এই সকল বিবিধরূপে লীলা করিয়াছিল ও করিতেছে। সেই এক অখণ্ড হৃদয়ই উপাসনা কালে আত্মাতে প্রকাশিত হয়। এখানে গভীর একত্ব, উপাস্য উপাসক গভীর যোগে একীভূত, এক হৃদয়, এক প্রেম, এক ভাব, এক ইচ্ছা, অথচ উপাসনার মধুর আস্বাদন। অন্য সময় কি অনন্ত হৃদয় আমার হৃদয়রূপে বর্ত্তমান থাকেন না? থাকেন, আমার হৃদয়ে যতটুকু প্রেম ততটুকু তাঁহারই, আমার স্বতন্ত্র কিছুই নাই। কিন্তু উপাসনার সময়ে, গভীর প্রেমোচ্ছ্বাসের সময়ে, তিনি যে মধুররূপে প্রকাশিত হন,

অন্য সময়ে সেরূপে প্রকাশিত থাকেন না। এই প্রভেদই সুখ দুঃখ, মিলন বিচ্ছেদ, শান্তি ও সংগ্রামের কারণ।

এইরূপে ইতিহাসে, প্রকৃতি মধ্যে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, ঈশ্বর-প্রেমের যত প্রকাশ, সমুদায়ের প্রত্যক্ষানুভব কেবল আত্মাতেই সম্ভব। বাহিরে কেবল কার্য্যমাত্র দেখি; প্রকৃতি, ব্যক্তিগত জীবন, সাধু-জীবন বহিরিন্দ্রিয়ের পক্ষে কেবলই কার্য্যময়। এই কার্য্যস্রোত যে অক্ষয় প্রেম-প্রস্রবণ হইতে নিসৃত, তাহা অন্তরে ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। যে পরিমাণে আমার হৃদয়ে প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয়, যে পরিমাণে সেই অনন্ত হৃদয় তাঁহার প্রেম লইয়া আমার হৃদয়রূপে প্রকাশিত হন, সেই পরিমাণেই ইতিহাস, প্রকৃতি ও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার প্রেম-ব্যগ্রতা বুঝিতে পারি ও তাঁহার প্রেম স্বরূপের উপাসক হইতে পারি।

পবিত্রতা সম্বন্ধে আর বিশেষরূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। যে পরিমাণে আমার চিন্তা পবিত্র হয়, বাসনা বিশুদ্ধ হয়, মন সত্য চিন্তা করে, রসনা সত্য উচ্চারণ করে, জীবন সত্য ব্যবহার করে; যে পরিমাণে ইচ্ছা প্রবৃত্তির উপর, আলস্য, জড়তা ও ভয়ের উপর, জয়লাভ করিয়া স্বাধীন তেজস্বী, কর্ম্মঠ ও সাহসী হয়, সেই পরিমাণেই ঈশ্বরের পবিত্রতা, তেজ ও শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি, এবং মানব জীবনে তাঁহার পবিত্রতা ও বলের প্রকাশ বুঝিতে পারি। আত্মাতেই যেমন জ্ঞান ও প্রেমের প্রকাশ, আত্মাতেই তেমনি পবিত্রতার প্রকাশ। সত্যম্ ও শিবম্ যেমন অন্তরে প্রকাশিত হন, সুন্দরম্‌ও তেমনি অন্তরে প্রকাশিত হন। যে পরিমাণে আত্মা সুন্দর হয় সেই পরিমাণেই সুন্দরস্বরূপের প্রত্যক্ষানুভব। যতটুকু একত্ববোধ, ততটুকুই প্রকৃত উপাসনা, ততটুকুই গভীর সম্ভোগ।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, সাধনের পথ কি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যময়কে প্রাপ্ত হইতে হইলে, দেখিতে হইলে, সম্ভোগ করিতে হইলে, তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া মুক্তিলাভ করিতে হইলে, জ্ঞানী, প্রেমিক ও পবিত্র হইতে হইবে। প্রতিদিন দেখিতে হইবে কতটুকু জ্ঞান লাভ করিলাম, কতটুকু প্রেমিক হইলাম, কতটুকু পবিত্র হইলাম। আত্মার মোহ যাইতেছে কি না, হৃদয় মানবের জন্য ব্যস্ত হইতেছে কি না, নিঃস্বার্থ ভাবে প্রেমপ্রবণ হইয়া মানবের সেবা করিতেছে কি না, চিন্তা, দৃষ্টি, বাক্য ও ব্যবহার নির্ম্মল,

নিষ্কলঙ্ক হইতেছে কি না, এই ভাবনা জীবনের সার ভাবনা করিতে হইবে। এই সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল—উপাসনার গভীরতা ও মধুরতা বৃদ্ধি, এবং এই গভীরতা ও মধুরতার ক্রমশঃ জীবনময় ব্যাপ্তিলাভ। ঈশ্বর এই মহাসাধনার সহায় হউন্।

সংস্কার-প্রণালী।

(২)

আমরা এখন বিষয়টীর অপরাংশে মনোনিবেশ করিব। কার্য্যতঃ সংস্কারের পথে যে বাধা ছিল তাহা অতিক্রম করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান ইচ্ছা এই যে কি ভাবে এই সংস্কার কার্য্য সম্পাদিত হইবে তাহার প্রণালী নির্দ্দেশ করা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদর্শ ঈশ্বরে নিত্যসিদ্ধ রহিয়াছে। সমাজ সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ভিতরে ঐ আদর্শের বিকাশ অধিকতর সুস্পষ্ট হয় এবং সমাজে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই বিবাদে ব্যক্তিত্বের জয়ই সমাজসংস্কার। এখন আমরা 'সমাজে থাকিয়া সমাজসংস্কার' কথাটার মধ্যে যে সত্য রহিয়াছে তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া যে হিন্দু মনে করেন যে আমি হিন্দুসমাজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, তিনিও আমাদের সমালোচনা-স্থানীয় 'সমাজে থাকিয়া সমাজসংস্কারকারী' অপেক্ষা কম ভ্রান্ত নহেন, উভয়েই একদেশদর্শী, সংস্কারতত্ত্বে অনভিজ্ঞ।

'সংস্কার' অর্থ কোনও পুরাতন বস্তুর রক্ষণযোগ্য ভাগ রক্ষা করিয়া দূষিত ভাগ ত্যাগ করা এবং ঐ রক্ষণীয় ভাগকে পরিবর্ত্তন করা। সুতরাং ঐ প্রাচীন বস্তুটীকে পরিত্যাগ করিলে তাহা সিদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেই জন্য সংস্কারের দ্বারা যে বস্তুটী আমরা পাইব তাহা ঐ পুরাতন বস্তুটীর একটী নবীন আকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নিয়ম সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যেমন কোনও ব্যক্তি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া

ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে স্বীয় নাম পরিত্যাগ করিতে হয় না, তাঁহার ভিতরে হাজার পরিবর্ত্তন সত্বেও সে একই ব্যক্তি থাকে, তেমনই ভারতীয় হিন্দু-প্রধান ব্রাহ্মসমাজ ইহার সহস্র নবীনত্ব সত্বেও হিন্দুসমাজ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। ইহা হিন্দুসমাজেরই একটী উন্নত আকার মাত্র। যৌবন-কালের দেহ-যন্ত্র (organism) যেমন বাল্যকালের যন্ত্রেরই উন্নতি ও পরিণতি, বর্ত্তমান সমাজও তেমনই অতীত সমাজেরই একটী বিশেষ আকার— তাহার সহিত অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ। প্রাচীনের সঙ্গে সকল যোগ কাটিয়া কখনও নূতন সমাজ গঠিত হইতে পারে না। উৎসের সঙ্গে যোগচ্যুত হইলে ঝরণা যেমন মধ্য পথে বিলীন হয়, পরিণামে সম্পূর্ণ নূতন সমাজেরও দশা তাহাই হয়। বিশেষ সময়ে সমাজের আদর্শ নূতন হইতে পারে, কিন্তু সমাজ নূতন হইতে পারে না, ঐ আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়াই সমাজের উন্নতি ও সমাজসংস্কার। জাতীয় জীবনকে ঐ আদর্শের অনুরূপ করিতে হইলে যে আচার পদ্ধতি নিয়ম প্রণালীর (forms and institutions) সঙ্গে জাতীয় জীবন জড়িত সেইগুলিকেই নিয়ন্ত্রিত ও নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাচীন নিয়ম প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া বিজা-তীয় নিয়ম প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলে চলিবে না এবং তাহা করাও যাইতে পারে না। এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে তাহার কোনও কোন অংশ এতদ্দেশে ও কোনও কোনও অংশ য়ুরোপে বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছে এবং তাহা বিশেষ বিশেষ আকার লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, শুধু আদর্শরূপে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে না। যে ভাবটী এদেশে বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, য়ুরোপে বিকশিত করিতে হইলে তাহা অবশ্যই ভিন্ন আকার ধারণ করিবে। ভাব এক হইলেও আকার ভিন্ন হইবে। এক ফল বিভিন্ন স্থানে উপ্ত হইলে তাহা যেমন বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা বিভিন্ন হয় ইহাও সেইরূপ। একই দানশীলতা ভারতে ও ইংলণ্ডে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতীয় দানশীলতার এই বিশেষ আকারটী যেমন হঠাৎ কোনও পরিবর্ত্তন না করিয়া ইংলণ্ডে উপনীত করা যাইতে পারে না, সেইরূপ ইংলণ্ডীয় আকারটীও উহার আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন ব্যতীত ভারতে আনা যাইতে পারে না; আনিলে সে দানশীলতা ও নিষ্ঠুরতা একই পদার্থ

হইয়া দাঁড়ায়। কারণ এক একটী ভাব যে এক একটী আকার ধারণ করিয়াছে তাহা তত্তৎ দেশের অবস্থার দ্বারা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা একদিনে সাধিত হয় নাই। ইহা না বুঝিয়া যাঁহারা য়ুরোপীয় উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা অবিচারিত অসংস্কৃত ভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা এই অনিষ্ট করিয়াছেন যে এখন ভারত দশম শতাব্দীতে যাইবার জন্য মহা প্রাস্থানিক যাত্রার আয়োজন করিতেছেন। আমাদের ঘাড়ে উনবিংশ শতাব্দী চাপাইতে হইবে না, ধীরে ধীরে আমাদিগকে উনবিংশ শতাব্দীতে অগ্রসর হইতে হইবে। সংস্কারকেরা ইহা মনে রাখিয়া কাজ করিলেই আর কোনও গোলযোগ হইতে পারিবে না।

জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংস্পর্শশূন্য হইলে এক দিকে যেমন ব্যক্তিগত জীবন স্রোত উৎস-বিচ্যুত হয়, অন্য দিকে জাতীয় জীবন যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়েরই বিশেষ অপকার সাধিত হয়। অথবা পৃথিবীর সহিত যোগ কাটিয়া বেলুন যোগে আকাশমার্গে উঠিলেও তাহাদ্বারা পৃথিবীর উচ্চতা সাধিত হইতে পারে না। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা এখন প্রাপ্ত হইতেছি। আবহমান কাল হইতে এদেশে ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মসংস্কার বেদান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার উপনীত হইয়াছেন বটে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় সাময়িকআলোকে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মূলতঃ তাঁহারা কেহই বেদান্তমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। বর্ত্তমান যুগের গৌরব রাজর্ষি রামমোহন পূর্ব্ব ও পশ্চিম, অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াও সেই সনাতন পন্থা অনুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার দর্শন বিজ্ঞানালোকিত সুমার্জ্জিত বুদ্ধি বেদান্তকে বর্জ্জন করিয়া না করিয়া স্বীয় ভাবের অনুপ্রাণনে ব্রহ্মসূত্রের নূতন ভাষ্য করিল, তাহার সার নির্ণয় করিয়া সাধারণের বোধসুগমের জন্য তাহাকে নূতন আকার প্রদান করিল এবং বিদেশীয়ের জন্য ইহাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া স্বদেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইল। ইহাই প্রকৃত পথ, সংস্কারের ইহাই চিরন্তন প্রথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পর সময়ে ব্রাহ্মসমাজ এই সনাতন নীতি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিদেশীয় ভাব ও বিজাতীয় শাস্ত্রকে অবলম্বন করিলেন, স্বদেশীয় সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইল, ব্রাহ্মসমাজ

স্বদেশে প্রবাসী হইলেন, বিদেশেও বিশেষ আদৃত হইলেন না। যদি কিছু আদৃত হইয়া থাকেন তাহা খৃষ্টান বলিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া নহে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংস্রব না থাকিলে যে দোষ ঘটা সম্ভব, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে .তাহা ঘটিল। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িতে লাগিলেন। হিন্দুসমাজ প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হইতে কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ যে এক দিকে হিন্দু-সমাজেরই সংস্কারকমণ্ডলী তাহা যেমন ব্রাহ্মসমাজও ভুলিতে লাগিলেন, হিন্দু-সমাজও ইহার উৎকট পাশ্চাত্য ভাবানুরাগ দেখিয়া ইহাকে আর আপনার বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন না। উভয়েই স্বীয় স্বীয় স্বার্থ বিভিন্ন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ সংঘটিত হইল। এই বিচ্ছেদ এক দিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতার কারণ, অন্য দিকে তেমনই আবার হিন্দুসমাজেরও উন্নতি-বিমুখতার নিদান। হিন্দুসমাজের সুখ দুঃখ আর প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মসমাজের সুখ দুঃখ রহিল না। জাতীয় জীবন যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই রহিল। ব্রাহ্মসমাজ যে কিছু অগ্রসর হইলেন না তাহা নহে, কিন্তু সমগ্র জাতিকে লইয়া যদি অগ্রসর হইতে পারিতেন তাহা হইলে ইহা সহস্র গুণে অধিকতর মঙ্গলপ্রদ হইত, কারণ সমগ্র জাতিকে ছাড়িয়া তাহার সামান্য এক অংশের উন্নতি স্থায়ী উন্নতি নহে। সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজকে ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে তাহার জীবন এই সমগ্র জাতির জীবনের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত। তিনি নিজে যতই কেন উন্নতি করুন্ না, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তাহার নিজের ভিত্তি হিন্দুসমাজের উপর এবং ইহার উন্নতি ছাড়া তাহার উন্নতির কোনও মূল্যই নাই। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে কেবল হিন্দুসমাজের অনিষ্ট করিয়াছেন তাহা নহে, স্বীয় পদেও কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এই যে আজ দেশ মধ্যে শাস্ত্রের খোসা লইয়া লোক মাতিয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য কি ব্রাহ্ম-সমাজ দায়ী নহেন? যে সময়ে দেশের পথ প্রদর্শনের ভার ব্রাহ্মসমাজের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল সে সময়ে যদি দেশীয় শাস্ত্রের সদ্ব্যবহার করা হইত, উচ্চ চিন্তার আলোকে শাস্ত্রকে উজ্জ্বল ভাবে লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরা হইত, যদি ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ শাণিত অস্ত্রের দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের আবর্জ্জনা রাশি পরিষ্কৃত

করিয়া শানালীঢ় মণির ন্যায় শাস্ত্রের সার ভাগ শিক্ষা দেওয়া হইত, রাম-মোহনের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক প্রাচীন সাহিত্যকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আজ এই অসার শাস্ত্রাড়ম্বর দেখিতে হইত না। ব্রাহ্মসমাজ যদি পূর্ব্বাপর প্রস্থানত্রয়কে অবলম্বন করিয়া ইহাদিগকে স্বীয় সাহিত্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইতেন তাহা হইলে যে-সে লোক এই অমূল্য গ্রন্থত্রয়কে 'আমার শাস্ত্র' বলিয়া ইহার অবমাননা করিতে সাহসী হইত না। আমি ব্রাহ্মসমাজের যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন স্বদেশে কিম্বা বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নত খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। ইহা যে হিন্দুস্থানে আবির্ভূত, ইহার শরীরে তাহার প্রায় কোনও চিহ্নই ছিল না। সুতরাং খৃষ্টীয় দেশে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের নিশান নীত হইল, তখন তাহা খৃষ্টানধর্ম্ম বলিয়াই গৃহীত হইল, কাজেই তাহার ফল স্থায়ী হইল না। রাম-মোহন 'বেদান্তসার' ও 'ঈশোপনিষদ্'-ভাষ্য ইংলণ্ডে প্রচার করিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ যদি সেই পতাকা ধারণ করিতেন, বেদান্তকে নবভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রচার করিতেন, তাহা হইলে হয়তো বিদেশে ভারতীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের স্থায়ীফল দেখিতে পাইতাম এবং আজিকার দেশব্যাপী এই বেদান্ত-হুজুক দেখিতে হইত না। যাহা ব্রাহ্মসমাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যাহা সম্পন্ন করা তাঁহারই কর্ত্তব্য ছিল, তাহা অন্য হাতে যাইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাতে ইষ্ট না হইয়া দেশের বিশেষ অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে।

এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বেদান্তধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজ বলা যাইতে পারে না, কারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ দুইই বিশ্বজনীন্, ইহারা কোনও জাতির বিশেষ সম্পত্তি নহে। আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি না। "পঞ্চম" যেমন বীণা, সেতার, বেহালা, সারঙ্গ বা এস্রাজের বিশেষ সম্পত্তি নহে, কিন্তু সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইলেও, সকলের আদর্শ স্থানীয় হইলেও, বীণার পঞ্চম বেহালার পঞ্চম নহে, সেতারের পঞ্চম সারঙ্গের পঞ্চম নহে, সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সকল দেশ ও সকল ধর্ম্মের আদর্শ হইয়াও ভারতীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ তুরস্কীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ নহে। আমি যখন বেদান্তকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছিলাম তখন হিন্দুস্থানকেই লক্ষ্য করিতে

ছিলাম, তুরস্ককে নহে। যদি তুরস্ক আমার লক্ষ্য থাকিত, তবে ইহাকে ইস্‌লাম ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতাম,বৈদান্তিক বলিতাম না। বীণাকে পঞ্চমে তুলিতে হইলে যে উপায় অবলম্বিত হইবে,বেহালার পক্ষে তাহা নহে। উদ্দেশ্য এক হইলেও উপায় ভিন্ন। যে উপায়ে মুসলমান সমাজে কাজ হইতে পারে সে উপায়ে কথনও হিন্দু সমাজে কাজ চলিতে পারে না। বিশ্বজনীন ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই আদর্শ, বিভিন্ন উপায় ও বিভিন্ন আকারে সকলে তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে, এখানে একাকার হইতে পারে না। পারে না বলিয়াই হিন্দু প্রধান ব্রাহ্মসমাজ মুসলমান সমাজের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতে-ছেন না। যে সমস্ত মুসলমান ভ্রাতারা ইহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা অনেক পরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা ইস্‌লাম সমাজ উপকৃত হইতেছে না, তাঁহারাও স্বজাতি সম্বন্ধে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়া-ছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি জাতীয় ভাবে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে প্রয়াসী হন, তবে অচিরাৎ শুভ ফল লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ব্রাহ্মসমাজের এ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে মুসলমান সমাজের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব কিছুতেই সংক্রামিত হইতে পারিবে না। কারণ জাতীয় ভাবের শিরা ব্যতীত সমাজ দেহে কথনই কোনও নূতন ভাব প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। স্বীকার করি আর না করি, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, আমাদের ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুভাব-প্রধান হইয়াছে ও হিন্দু আকার পাইয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা হিন্দুসমাজ ভিন্ন অন্য কোনও সমাজই প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হইতে পারে না।

এখন কেহ হয়ত বলিবেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলকে লইয়া এক সার্ব্বভৌমিক মনুষ্যসমাজ সংগঠন; বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন নহে। এখন প্রশ্ন এই যে ইহা কি কথনও সম্ভব? জাতীয় বিশেষত্ব ধ্বংস ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। যদি বিশেষত্ব ধ্বংস করিতে হয় তবে সেরূপ সমাজ মানুষে পশুতেও সম্ভব হইতে পারে। প্রতিবাদকারী হয়ত বলিবেন জগতের ইতিহাসে যাহা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? ঐ খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এখন কথা এই, খৃষ্টান ধর্ম্ম কি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয় নাই?

খৃষ্টানধর্ম্ম অপেক্ষাও মুসলমান ধর্ম্মে একাকারের ভাব প্রবল, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপ জাতীয় বিশেষত্ব হইতে মুক্ত নহে; বিশেষতঃ মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের পক্ষে একজন অভ্রান্ত আদর্শ পুরুষ ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে একটী নূতন সমাজ গঠন সম্ভব হইলেও উক্ত উভয় অস্ত্র-বিরহিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এরূপ চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। পরন্তু পনর শত, দুই হাজার কিম্বা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহা সম্ভব ছিল এখন আর তাহা সম্ভব নহে।

পাঁচ বৎসরের ১০টী বালককে একই ভাবে গঠন করিতে চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ফলবতী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের অতীত ইতিহাস বিভিন্ন, এমন ২০ বৎসরের ১০টী যুবককে এক ভাবে গঠন করা একবারে অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ ও জার্ম্মাণ, যাঁহারা বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিতেছেন, ভারতবাসী, যাঁহারা এখনও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুখে নিদ্রা যাই-তেছেন, অথবা চীন, যাঁহাদের স্বীয় প্রাচীনত্বের ভগ্ন দুর্গের বাহিরে আসিতে বুক দুরদুর্ করে, এবং আমেরিকা, যিনি দ্রুতগতি অশ্বের ন্যায় উন্নতি মার্গে অগ্রসর, এই সকলকে লইয়া এক বিশ্বজনীন মনুষ্য সমাজ সংগঠনের চেষ্টার ন্যায় উৎকট আকাঙ্ক্ষা ও বিকট সাধনা আর কিছু হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের মস্তিষ্ক, বানরের কার্য্যশীলতা, বাঘের মাংসপেশী, শকুনের ঘ্রাণশক্তি ও বিড়ালের তীক্ষ্ণদৃষ্টি লইয়া এক দেহযন্ত্র (organism) নির্ম্মাণের চেষ্টা বোধ হয় ইহা অপেক্ষা বেশী অদ্ভুত নহে।

এখন কথা এই, তবে কি বিশ্বজনীন সমাজ কথাটীর কোনও অর্থ নাই? অর্থ অবশ্যই আছে। ঐ যে আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ, যাহার দিকে সকল জাতিই অগ্রসর হইতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌমিক, তাহা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। তাহা নির্ব্বিশেষ, সেখানে বিশেষত্ব নাই। বিশেষত্ব প্রকাশে, আদর্শে নহে। এই যে আদর্শের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ, এই প্রকাশের সমষ্টিকে আমরা এক বিশ্বজনীন সমাজ বলিতে পারি। ঈশা বলিয়াছিলেন, "আমার পিতার ভবনে অনেক গৃহ আছে।" এই সমস্ত গৃহের সমষ্টিই পিতার ভবন, ইহাই পিতার সার্ব্বভৌমিক সমাজ। এই প্রত্যেক গৃহই রক্ষা করিতে হইবে। ইহাদিগকে ভাঙ্গিয়া এক গৃহ করিতে গেলে পিতার ভবনও ভাঙ্গিয়া যাইবে।

এখন কেহ হয়ত বলিবেন যে যদি বিভিন্ন সমাজের সমষ্টিই সার্ব্বভৌমিক

সমাজ হয়, তবে তাহাতো জগতে আছেই, সেজন্য এত আয়োজন কেন? জগতে অনেক গৃহ রহিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করে না, কিন্তু তাহা এক ভবনের নহে। ঐকতান বাদনে যন্ত্র বিভিন্নাকারের হইলেও সকলকেই যেমন এক সুর ও এক তালে বাদিত হইতে হয়; সেতার পঞ্চমে, বীণা সপ্তমে, বেহালা মধ্যমে বাজিলে যেমন চলে না, এখানেও তেমনি বিভিন্ন আদর্শ লইয়া একত্র হইলে হইবে না, একই আদর্শ লইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে। আকার ভিন্ন হইলেও সুর বাজিবে এক। একতা সুরে ও তালে, আকারে নহে। যিনি মনে করেন সকল যন্ত্রগুলিকে ভাঙ্গিয়া এক যন্ত্রে পরিণত না করিলে এক সুর পাইব না, তিনি ভ্রান্ত। মানুষ যত দিন না পূর্ণ ঈশ্বরত্ব লাভ করিতেছেন, তত দিন একাকারের সম্ভাবনা নাই। আর বস্তুতঃ ঐশ্বরিক একতা বিচিত্রতা-বিরুদ্ধ নহে, বরঞ্চ বিচিত্রতার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য।

এখন আমরা আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছি। জগৎকে এই আদর্শ লওয়ান, জগতের গতিকে এই আদর্শমুখী করাই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মহা আয়োজনের উদ্দেশ্য, বিধাতা সেই জন্যই ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের দৃষ্টান্ত স্থানীয় বাদ্য যন্ত্রগুলির কেহই যেমন কর্ণমর্দ্দন ব্যতীত অভীষ্ট বোল বলে না, জগৎও যে বিশেষ শ্রোত্রাকর্ষণ ব্যতীত এই আদর্শ গ্রহণ করিবেন তাহা বোধ হয় সম্ভব নহে। সুতরাং আয়োজন নিরর্থক নহে। যে দিন একই আদর্শ লইয়া সকল গৃহ একত্রিত হইবে সেই দিনই প্রকৃত পক্ষে পিতার ভবন প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই দিনই জগতে বিশ্বজনীন ধর্ম্মসমাজ সংস্থাপিত হইবে যে দিন বিভিন্ন গৃহ হইতে এক সুরে ও এক তালে সংগীত-ধ্বনি উত্থিত হইবে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

পাশ্চাত্য ঋষি স্পিনোজা।

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ডেকার্ট্ (১৫৯৬-১৬৫০)। তিনি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা—সমুদয় শ্রুতিমূলক বিশ্বাস পরিত্যাগ—প্রচার করিয়া এবং আত্মজ্ঞানের উপর সমুদয় জ্ঞান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া, দর্শন সম্বন্ধে নূতন প্রণালী আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক মত বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও আমরা এস্থলে বিশেষ ভাবে তাহা ব্যাখ্যা করিব না, তাঁহার প্রদত্ত মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া ঋষি স্পিনোজা দার্শনিক সত্যাবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা তদীয় নামোল্লেখ করিলাম। ডেকার্টের অব্যবহিত শিষ্য ফরাসী পুরোহিত মেল্‌ব্রান্‌শ্ (১৬৩৮-১৭১৫)। ডেকার্ট্ জড় ও চৈতন্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। মেল্‌ব্রান্‌শ্ এই কল্পনা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, জড় যখন আত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, তখন আত্মা কিরূপে জড়ের জ্ঞান লাভ করে? জড়ের সহিত সাক্ষাৎ যোগ আত্মার পক্ষে অসম্ভব। আত্মা যাহা লাভ করে তাহা জড় সম্বন্ধীয় পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র, চিন্তামাত্র; এই সকল চিন্তা আত্মা কিরূপে লাভ করে? আত্মা যখন সসীম, তখন নিজবলে এই সকল চিন্তা উৎপাদন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আত্মা নিজ বলে যাহা উৎপাদন করে তাহা বাহ্যবস্তুর অনুরূপ হইবার কথা নহে। বাহ্যবস্তু স্বয়ং এই সকল চিন্তা উৎপাদন করে, ইহাও সম্ভবপর নহে। অচেতন জড় চৈতন্যের উপর এই সকল বিজ্ঞান উৎপাদন করে, ইহা অভাবনীয়। সুতরাং একমাত্র যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত এই যে ঈশ্বরই এই সকল বিজ্ঞানোৎপাদনের কারণ। তিনি জড় ও চৈতন্য উভয়েরই আধার; তিনিই একমাত্র স্বাধীন বস্তু। জড়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে; সমগ্র জড় জগৎ তাঁহার সাক্ষাৎ জ্ঞানে বর্ত্তমান। তিনিই আবার আত্মার আধার। আমাদের ইচ্ছা ও বিজ্ঞান সমুদয়ই তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে। জড় ও চৈতন্য পরস্পর পৃথক হইয়াও তাঁহাতে একত্রীকৃত। সুতরাং আমরা যাহা কিছু

দর্শন করি, যাহা কিছু জ্ঞাত হই, সমুদয়ই তাঁহাতে দর্শন করি, তাঁহাতেই জ্ঞাত হই।

মেল্‌ব্রান্‌শের একীকরণ-প্রণালী কৃত্রিম ও অসন্তোষকর, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জড় ও চৈতন্য যদি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তুই হইল, তবে আর ঈশ্বরেই বা ইহারা কিরূপে মিলিত হইল? ইহাদের মধ্যে মৌলিক একতা না থাকিলে মিলনও অসম্ভব। এই একতা ডেকার্ট্‌ ও মেল্‌ব্রান্‌শ্‌ কেহই স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। কিন্তু ডেকার্ট্‌ ইহা দর্শনের পথ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরই একমাত্র স্বাধীন স্বাবলম্বন বস্তু। কিন্তু এই কথা বলিয়াও—জড় ও চৈতন্যের স্বাধীন সত্তা অস্বীকার করিয়াও—ডেকার্ট্‌ বলিয়াছেন ইহারা পরস্পরের সম্বন্ধে স্বাধীন বস্তু। এই মত স্ববিরোধী। মেল্‌ব্রান্‌শ্‌ এই বিরোধ কিয়দংশে দূর করিয়া এক প্রকার অসম্পূর্ণ অদ্বৈত মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাজ্ঞানী স্পিনোজা এই বিরোধ সম্পূর্ণরূপে ভঞ্জন করিয়া, জড় ও জীবের স্বাধীন সত্তা, সুতরাং প্রকৃত বস্তুত্ব, অস্বীকার করিয়া একটী পূর্ণাঙ্গ অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন।

য়ুরোপীয় দর্শন রাজ্যে স্পিনোজার স্থান অতি উচ্চ। ডেকার্ট্‌-রোপিত চিন্তা বৃক্ষের পরিপকতম ফল তাঁহারই যত্নে উৎপন্ন হয়। ডেকার্ট্‌-প্রবর্ত্তিত প্রণালীকে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই স্পিনোজা-প্রচারিত মত গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা স্পিনোজার মীমাংসা দেখিয়া ভীত ও পশ্চাৎপদ হন, তাঁহাদের পক্ষে অভিনব চিন্তা-প্রণালী আবিষ্কার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সুতরাং স্পিনোজার দর্শনাবির্ভাবে য়ুরোপীয় চিন্তা জগতে একটী বিপ্লব উপস্থিত হইল। অনেকে তাঁহার মত গ্রহণে অনিচ্ছুক অথচ তাঁহার অকাট্য যুক্তিশৃঙ্খল ছেদনে অসমর্থ হইয়া দার্শনিক চিন্তাকে ভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিপ্লবের বিশেষ বর্ণনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবল স্পিনোজার মহত্ত্ব ইঙ্গিতীকরণাভিপ্রায়ে ইহার উল্লেখ করিলাম। আধুনিক সময়ে য়ুরোপে দুই প্রকার অদ্বৈত মত প্রচলিত। এক প্রকার মতের প্রধান গুরু স্পিনোজা, অপর মতের প্রধান ব্যাখ্যাকার হেগেল। এই দুই মতের প্রণালী ও প্রকৃতিতে প্রভেদ, এবং এতদ্দেশীয় দুটী প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে।

বেনিডিক্ট্ দি স্পিনোজা ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে আম্‌স্টারডম্ নগরে ইহুদি বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে তদীয় স্ববংশীয়গণ তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে সমাজচ্যুত এবং নানা প্রকারে উৎপীড়িত করেন। প্রাণভয়ে তিনি "দিহেগ্" নগরে পলায়ন করেন ও আজীবন সেখানে বাস করেন। উচ্চ পদ ও ধনসম্পত্তি প্রাপ্তির সুবিধা সত্ত্বেও তিনি তৎসমুদায়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে, অতি দরিদ্র ভাবে, জ্ঞানালোচনায় জীবন যাপন করেন। কাঁচ-নির্ম্মিত বীক্ষণ যন্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সমূহে যে সকল সদ্‌গুণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্ত গুণ তদীয় চরিত্রে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বৈরাগ্য, সন্তোষ, শম, দম, দয়া, শান্তি, আর্জ্জব প্রভৃতি উচ্চ গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার শরীর রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিল, সুতরাং অকালে, ৪৪ বৎসর বয়সে, তাঁহাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়।

স্পিনোজার প্রধান গ্রন্থের নাম "এথিকা"। এই গ্রন্থ লাটিন ভাষায় লিখিত। নীতি সাধনের দার্শনিক ভিত্তি প্রদর্শনের উদ্দেশেই এই গ্রন্থ লিখিত হয়। স্থূল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ন্যায় অদ্বৈতবাদকে নীতি-বিনাশক মনে করা দূরে থাকুক, স্পিনোজা অদ্বৈতবাদের উপরই উচ্চ নীতিবিজ্ঞান স্থাপন করিয়াছেন। যাহা হউক,আমরা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যায় উক্ত পুস্তকের হোয়াইট্ সাহেবকৃত ইংরাজী অনুবাদের কোন কোন অংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিব, এবং কোন কোন অংশ প্রয়োজন মত নির্দ্দেশ করিব।

১। জ্ঞানের শ্রেণী-বিভাগ। স্পিনোজার মতে জ্ঞান ত্রিবিধ। প্রথম এবং নিম্নতম শ্রেণীর জ্ঞান ইন্দ্রিয়বোধ ও স্মৃতি-ঘটিত। এই জ্ঞান অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ, এবং সর্ব্বপ্রকার ভ্রম ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান বুদ্ধি-ঘটিত। বুদ্ধি বস্তুগুণ সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব ও সম্যক্ ধারণা লাভে সমর্থ। ইহার লব্ধ মূলতত্ত্ব সমূহ অবশ্যম্ভাবিতা গুণযুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান অনুভব-ঘটিত। এই জ্ঞানের বিষয় বস্তুর মূল স্বরূপ। ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের উপায়। [দ্বিতীয় অংশের ৪০তম প্রতিজ্ঞা দ্রষ্টব্য।] এই জ্ঞান লাভ করিতে যাইয়া আত্মা অনন্তের পদবীতে আরোহণ করে এবং ব্রহ্মের সহিত একত্বানুভব করে। [পঞ্চমাংশের ৩০ ও ৩১তম প্রতিজ্ঞা দ্রষ্টব্য।]

২। ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ-লক্ষণ। ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সমুদয় সসীম ও অনিত্য। এক পদার্থ অপর পদার্থের আশ্রিত এবং সমুদয়ই উৎপত্তি বিনাশের অধীন। এই সসীম ও অনিত্য ভাবের মধ্যে অসীম নিত্য বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সসীম জড় পদার্থের ভাবনায় অসীম দেশের ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। সসীম চিন্তাতে অসীম চিন্তার ভাব নিহিত। জড় ও চৈতন্যের প্রভেদ ভাবিতে যাইয়া অবশ্যম্ভাবিরূপেই এমন এক বস্তু ভাবিতে হয় যাহা এই প্রভেদের অতীত ও এই প্রভেদের হেতু। এইরূপে দেখা যায়, সমুদয় পর-সাপেক্ষ সসীম বস্তু এক স্বতন্ত্র, পর-নিরপেক্ষ, অসীম বস্তুর উপর নির্ভর করে। এই যে বস্তু, যাহা না থাকিলে অপর কিছু থাকিতে পারে না, যাঁহাকে না ভাবিলে অপর কিছু ভাবা যায় না, অপর দিকে—যাঁহার অস্তিত্বের জন্য অপর কিছুর অস্তিত্ব আবশ্যক নহে, যাঁহাকে ভাবিতে হইলে অপর কিছুর ভাবনা প্রয়োজন নহে, এই বস্তুই প্রকৃত বস্তু নামের উপযুক্ত এবং এই অনন্ত বস্তুই ব্রহ্ম। পর-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু অবশ্যম্ভাবিরূপেই এক, অদ্বিতীয়; কারণ দ্বিতীয়ের অস্তিত্বে ইহার নিরপেক্ষতায় আঘাত পড়ে। ইহা অবশ্যম্ভাবিরূপেই অনন্ত; কারণ যাহা কিছু ইহাকে সীমাবদ্ধ করিবে তাহা ইহার নিরপেক্ষতায়, ইহার স্বতন্ত্রতায়, আঘাত করিবে। কেবল অসীম বস্তুই স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ হইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত বস্তু এক, অনন্ত। সসীম বহু বস্তু কেবল এই এক অনন্ত বস্তুর সত্তায় সত্তাবান্—এই এক অনন্ত বস্তুর খণ্ডাকার প্রকাশ মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের লক্ষণা করা অসম্ভব। কোন বস্তুর লক্ষণা করিতে হইলেই উহাকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিতে হয়, অন্য বস্তুর সহিত ইহার ভেদ নির্দ্দেশ করিতে হয়। সুতরাং সসীম বস্তুর সম্বন্ধেই লক্ষণা সম্ভব। ব্রহ্ম যখন সর্ব্বাশ্রয়, অনন্ত, অদ্বিতীয় বস্তু,তখন তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ লক্ষণা অসম্ভব। এমন কোন বস্তু নাই যাহা হইতে তাঁহাকে ভিন্ন করা যাইতে পারে এবং যাহাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন করা যায়। তবে তিনি নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা, এই সংজ্ঞা যে যে শব্দে প্রকাশ পায়, সেই সকল শব্দদ্বারা তিনি নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, এই মাত্র। সুতরাং আমরা তাঁহাকে অনন্ত, নিত্য, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভূ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু যে সমস্ত লক্ষণে

এই বুঝায় যে তাঁহার অতীত, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, আর কোন বস্তু আছে, সে সমস্ত লক্ষণ নিশ্চয়ই কল্পনা-প্রসূত, সুতরাং তাঁহার প্রতি অপ্রযুজ্য।

৩। **ব্রহ্মের আরোপ-লক্ষণ।** ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ ছাড়া স্পিনোজা তাঁহার অসংখ্য তটস্থ বা আরোপ-লক্ষণ স্বীকার করেন। জীবের বুদ্ধি ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভাবিতে যাইয়া তাঁহাকে যেরূপ ভাবে,—অবশ্যম্ভাবিরূপেই ভাবে,—তাহারই নাম আরোপ-লক্ষণ। স্পিনোজা বলেন জীবের বুদ্ধি যখন অসংখ্য প্রকার হইতে পারে, তখন ব্রহ্মের আরোপ-লক্ষণও অসংখ্য। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি দুটী মাত্র আরোপ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১) ব্যাপ্তি; (২) জ্ঞান। জগতের যাবতীয় পদার্থ ব্যাপ্তি ও জ্ঞান এই দ্বিবিধ আকারে বর্ত্তমান। সমুদয়ের মূল ভাগ এই দুটী মূল বস্তু। ব্রহ্ম এই দুই ভাবে আমাদের বুদ্ধিতে প্রকাশিত। বুদ্ধির সমুদয় তত্ত্বের মধ্যে এই দুটীই সর্ব্বোচ্চ। এই তত্ত্বদ্বয়ই সমুদায় তত্ত্বের মূল এবং কেবল এই দুটীই অসীম সত্তা প্রকাশে সমর্থ। ব্যাপ্তি ও জ্ঞান পরস্পর হইতে ভিন্ন বটে, কিন্তু ইহাদের মূল এক, কারণ উভয়ই এক মূল বস্তুর প্রকাশ মাত্র। জগতের প্রত্যেক বস্তুরই দুটী রূপ—ব্যাপ্তিরূপ ও জ্ঞানরূপ। যাহা কেবল বাহ্য আয়তনশালী ব্যাপ্ত বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তাহারও একটী জ্ঞানরূপ আছে, তাহাও এক দিকে জ্ঞানের আশ্রিত মানস ব্যাপার। পুনশ্চ, যাহা কেবল মানস ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় তাহারও একটী বাহ্য ব্যাপ্ত রূপ আছে। জ্ঞানজগৎ ও ব্যাপ্তিজগৎ দুটী অনন্ত সমান্তরাল রেখার ন্যায়। ইহারা এক নহে, পরস্পর মিলিতও নহে, অথচ এমন ভাবে সম্বদ্ধ যে যাহা কিছু অন্তশীল বাহ্যরূপে অবস্থিত, তাহাই আবার আত্মজ্ঞানের একতায় একীভূত হইয়া জ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত। যাহা শরীররূপে দেশে অবস্থিত, তাহার এবং তৎসম্পর্কিত পদার্থ সমূহের জ্ঞানই আবার জীবাত্মারূপে প্রতিভাত। যাহা বৃত্তরূপে দেশে বর্ত্তমান তাহাই বৃত্তের চিন্তারূপে জ্ঞানে প্রতিভাত। এই রূপে সমুদায় জাগত বস্তুই,—জড় ও চেতন উভয় প্রকার বস্তুই—ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ। মূলে ভেদ নাই। বুদ্ধিতে যে সেই বস্তুর প্রকাশ, সেই প্রকাশেই ভেদ—জড় ও চৈতন্যের মৌলিক ভেদ এবং অন্যান্য অবান্তর ভেদ।

৪। **ব্রহ্মের 'প্রকার'।** জগতের বিবিধ সচেতন ও অচেতন বস্তু জ্ঞানরূপী ও ব্যাপ্তিরূপী ব্রহ্মের সসীম 'প্রকার' মাত্র। এই সমুদায়ের কোন

স্বাধীন সত্তা নাই। এই সমস্ত ব্রহ্মবস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, এই সমুদায় প্রকারের সহিত ব্রহ্মের সেই সম্বন্ধ। ইহারা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, বিনাশশীল। ব্রহ্মবস্তু ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের হেতু। ইহারা যেমন ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, তেমনি পরস্পর হইতেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, পরস্পরের সহিত অশেষ কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কেবল মূল অনন্ত বস্তুই স্বাধীন; সসীম জগতে স্বাধীনতা নাই, সমুদয় সসীম বস্তুই অচ্ছেদ্য নিয়তি-সূত্রে গ্রথিত। কেবল, যে বস্তু ব্রহ্মের শক্তি যে পরিমাণে লাভ করিয়াছে, সেই বস্তু সেই পরিমাণে আপেক্ষিক স্বাধীনতা-শালী, সেই পরিমাণে আপন সত্তা রক্ষায় ও উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম।

৫। সসীম ও অসীম 'প্রকার'। দুটী 'প্রকার' সম্বন্ধে স্পিনোজা কিছু বিশেষ কথা বলিয়াছেন। 'প্রকার' সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা সেই দুটী 'প্রকার' সম্বন্ধে খাটে না। ব্যাপ্তি অর্থাৎ জড়রূপী ব্রহ্ম নানা জড় বস্তুরূপে প্রকাশিত হন এবং জ্ঞানরূপী ব্রহ্ম নানা সচেতন বস্তুরূপে প্রকাশিত হন। এই সমস্ত জড় ও সচেতন বস্তু সসীম সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যাপ্তি যে গতি ও বিরামরূপে প্রকাশিত হয়, এই প্রকাশক্রমের আরম্ভ নাই, শেষও নাই। গতি ও বিরামের বিশেষ বিশেষ ফল যাহা, তাহার আরম্ভ আছে, শেষও আছে, এবং এরূপ প্রত্যেক ফল অপর প্রত্যেক ফলের দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু গতি ও বিরামরূপ ব্যাপার—যাহা সমুদয় ব্যাপারের কারণ—তাহা অপর কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। ইহা বস্তুর অধীন, এবং ইহা ব্যাপার মাত্রেরই কারণ নহে; সুতরাং ইহা সর্ব্বোচ্চ অর্থে অসীম নহে। কিন্তু নিজ রাজ্যে ইহা অসীম, সুতরাং ইহাকে ব্রহ্মবস্তুর একটী 'অসীম প্রকার' বলা যাইতে পারে। তেমনি জ্ঞানজগতে বুদ্ধি অসীম প্রকার। সমুদয় জ্ঞানের বিষয়কেই বিষয়ীর অধীন, বুদ্ধির অধীন, ভাবিতে হয়। এই ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের বিষয় সমূহ পরস্পরের অধীন বটে এবং সমুদয়ই বিষয়ীর অধীন বটে, কিন্তু বিষয়ী অপর কিছুর অধীন নহে। সুতরাং সমুদয় বিষয়-জগৎকেই একটী অসীম সর্ব্বাধার বুদ্ধির অধীন বলিয়া ভাবিতে হয়। এই রূপে দেখা যায় শক্তি ও বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ না হইলেও ইহারা ব্রহ্মের 'অসীম প্রকার'। অতএব ব্রহ্মকে অনন্ত শক্তিশালী এবং অনন্ত বুদ্ধিশালী বলিয়া ভাবিতে হইবে।

এখন স্পিনোজা-ব্যাখ্যাত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। স্পিনোজার মতে ব্যাপ্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি,শক্তি এই সমুদয় ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ নহে। এই সমস্ত ব্রহ্মেতে মানববুদ্ধি-কর্ত্তৃক আরোপিত লক্ষণ মাত্র। অথচ এই সমস্ত লক্ষণ অবশ্যম্ভাবী। এরূপ মত বিশেষরূপে অবোধ্যতা-দোষে দূষিত। প্রথমতঃ, বুদ্ধি—জ্ঞানের 'প্রকার' মাত্র,জ্ঞান হইতে সৃষ্টি ক্রমানুসারে এক সোপান নিম্নে, অথচ স্পিনোজা বলিতেছেন, জ্ঞান বুদ্ধিকর্ত্তৃক আরোপিত লক্ষণ, অর্থাৎ কারণ কার্য্য হইতে উৎপন্ন! পুনশ্চ, শক্তি অনাদি, অনন্ত, ও ইহার কারণ ব্যাপ্তি সহ জ্ঞান ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, অথচ আরোপ-লক্ষণের সংজ্ঞা অনুসারে ব্যাপ্তি ও শক্তি উভয়ই বুদ্ধিকর্ত্তৃক আরোপিত লক্ষণ মাত্র,—বুদ্ধিরই ব্যাপার মাত্র! অবশেষে, স্পিনোজা বলিয়াছেন, অনন্তের পদবীতে দাঁড়াইয়া দেখিলে, অনন্তের প্রকাশরূপে দেখিলে, বুদ্ধি আর সসীম বস্তু থাকে না, অসীম বস্তু বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এমন কি, অনুভবঘটিত জ্ঞানের পদবী হইতে কোন বস্তুই সসীম নহে। সমুদয়ই অসীম, কারণ অসীম ব্যতীত আর বস্তুই নাই। এখন, বুদ্ধি যদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশই হইল, মূলে অনন্ত বস্তুই হইল, আর ইহার তত্ত্ব-সমূহ অবশ্যম্ভাবীই হইল, তবে ইহার প্রদত্ত ব্রহ্মলক্ষণ-সমূহকে কেবল আরো-পিত, কল্পিত বলিয়া অগ্রাহ্য করা কত দূর যুক্তিসঙ্গত? বুদ্ধিজাত তত্ত্বসমূহ ভেদাত্মক, দ্বৈতভাবাত্মক, এই দেখিয়া স্পিনোজা এই সমস্তকে নিম্ন স্থান দিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই ব্রহ্মকে নিরবচ্ছিন্ন অভেদ অদ্বৈতরূপে ব্যাখ্যা করাতে তাঁহার পক্ষে ভেদব্যঞ্জক লক্ষণসমূহকে কল্পিত বলিয়া বর্ণন করা অবশ্য-ম্ভাবী হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে ভেদ না হইলে স্পিনোজার চলে না। ভেদের ভাব অবলম্বন না করিলে অদ্বৈত অভেদ বস্তু নিষ্ক্রিয়ই থাকেন, একাকীই থাকেন। তাঁহা হইতে জড় ও চেতন জগতের বিচিত্র বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয় না। ভেদ ব্যতীত চলা দূরে থাকুক, ভেদব্যঞ্জক বুদ্ধি ও শক্তিকে অনন্ত, অনাদি বলিয়া বর্ণনা করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইল। সুতরাং প্রথম হইতেই অদ্বৈত অনন্ত বস্তু হইতে দ্বৈত ও সসীমকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক না করিয়া দুই দিকের সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। এই সামঞ্জস্য হেগেল দর্শনে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হয়। এই সামঞ্জস্যের প্রশ্ন বেদান্ত দর্শনে কিরূপে বিচারিত হইয়াছে তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইব। সূক্ষ্মভেদে না

যাইয়া মোটের উপর বলা যায় য়ুরোপীয় ব্রহ্মবাদে স্পিনোজা ও হেগেলে যে প্রভেদ, বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে শঙ্কর ও রামানুজে সেই প্রভেদ। স্পিনোজার মত য়ুরোপীয় বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, হেগেলের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

৬। মঙ্গলামঙ্গল। আত্মরক্ষাই মঙ্গল, আত্মবিনাশই অমঙ্গল। যে কার্য্যদ্বারা আত্মরক্ষা হয় তাহাই পুণ্য কার্য্য। যদ্দ্বারা আত্মার শক্তি ক্ষয় হয় তাহাই পাপ কর্ম্ম। পুণ্য কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল সুখ, পাপ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখ। প্রকৃত আত্মরক্ষা কি তাহা বুঝা জ্ঞানের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। সম্যক্ জ্ঞানই আত্মরক্ষার হেতু এবং পরমানন্দের নিদান, সুতরাং সম্যক জ্ঞানই প্রকৃত মঙ্গল।

৭। বন্ধন ও মুক্তি। আত্মা যত দিন উপরি-উক্ত প্রথম শ্রেণীর অস্পষ্ট জ্ঞানের অধীন থাকে, তত দিন নিজের প্রকৃত মঙ্গল বুঝিতে পারে না এবং তত দিন প্রকৃত সুখও লাভ করিতে পারে না। এই অবস্থায় আত্মা আপনাকে একটা ক্ষুদ্র সসীম বস্তু বলিয়া মনে করে, এবং অন্যান্য বস্তুকে বাহ্যবস্তু বলিয়া বিশ্বাস করে। এই ধারণাতে ইহা কাম ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তির অধীন হয় এবং নিষ্ক্রিয়-ভাবে বাহ্যবস্তু সমূহের প্রভাব গ্রহণ করে। এই প্রভাব-জনিত সুখকেই ইহা পরম মঙ্গল বলিয়া মনে করে, আত্মবল পরিচালনার সক্রিয় সুখ ইহার ভাগ্যে ঘটে না। ইহা আত্মার বন্ধনদশা। বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবে এই দশা অতিক্রম করাই মুক্তি।

৮। আংশিক মুক্তি। বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা আত্মা জানিতে পারে যে জগৎ অবশ্যম্ভাবী অনতিক্রমণীয় নিয়মের অধীন, জগতের কিছুই আকস্মিক নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষের চঞ্চল ইচ্ছা-জনিত নহে। বুঝিতে পারে যে সমুদয়ই পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরের অটল বিধান ও ইচ্ছার ফল এবং সেই পূর্ণস্বরূপ আত্মারূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন ও কার্য্য করিতেছেন। বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মবস্তুই সমুদয় কার্য্যের মূল, তিনিই একমাত্র স্বাধীন বস্তু; আর কোন বস্তুর স্বাধী-নতা নাই, শক্তি নাই। এই জ্ঞানোদয়ে আত্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়। চিত্তাকর্ষণকারী জাগত বস্তু সমূহ অসার, নিঃশক্তি, এই জ্ঞান জন্মিলে তাঁহাদের আকর্ষণ-শক্তি মন্দীভূত হইয়া যায়। কোন কার্য্যই সসীম বস্তুর কার্য্য নহে, ব্যক্তিগত ইচ্ছার ফল নহে, সমুদায়ই অচল নিয়মাধীন, এই বিশ্বাসোদয়ে ক্রোধ, ঘৃণা, ভয়,

আশা, নিরাশা প্রভৃতি প্রবৃত্তি প্রশমিত হয়। প্রকৃত পক্ষে সসীম অনিত্য বস্তু নাই, সমুদায়ই অসীম নিত্যবস্তুর প্রকাশ, এই বিশ্বাসে বুদ্ধি ক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে ধাবিত ও তৎপ্রযুক্ত অস্থির ভাবের বশ না হইয়া অনন্তের অভিমুখী হয় এবং ক্ষুদ্র বিষয়-জনিত সুখে তৃপ্তি লাভ না করিয়া ঈশ্বরের অচল বিধানের অধীন হওয়া, অচল নিয়মের অনুসরণ করারূপ বিশুদ্ধ আনন্দ আস্বাদন করে।

৯। পূর্ণ মুক্তি। সাক্ষাৎ অনুভবের অবস্থায় এই মুক্তি পরাকাষ্ঠা লাভ করে। এই অবস্থায় ভ্রমজনিত দ্বৈতবোধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহ্যবস্তুর অধীনতাবোধ দূর হয়। তখন দেখা যায় সমুদয় কার্য্যই ব্রহ্মের কার্য্য, এবং ব্রহ্ম আত্মারূপে প্রকাশিত। তখন প্রকৃতির অধীনতা-প্রসূত নিষ্ক্রিয় সুখের অবসান হইয়া স্বাধীনক্রিয়া-জনিত প্রকৃত নির্ম্মল সুখের উদয় হয়। বলের তারতম্য অনুসারে সুখের তারতম্য। এই অবস্থাতে আত্মবলে পূর্ণ বিশ্বাস বশতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আত্মবলের উদয় হয়। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত সুখও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। এই আনন্দে কিছুমাত্র প্রবৃত্তির মিশ্রণ নাই, দ্বৈতবোধ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছে, অথচ এই আনন্দের সহিত অপর কোন আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। ঈশ্বরানুভব-জনিত এই যে আনন্দ, ইহারই নামান্তর ঈশ্বর-প্রীতি। ইহাকে "জ্ঞানগতা ঈশ্বরপ্রীতি" বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের নিজের প্রতি নিজের অনন্ত প্রীতি বর্ত্তমান ; মানবাত্মা যখন ঈশ্বরেরই প্রকাশ, তখন মানবের এই ঈশ্বরপ্রীতিকে ঈশ্বরের আত্মপ্রীতির প্রকাশ বলা যাইতে পারে। আর, ঈশ্বরের আত্মপ্রীতি যাহা, তাহাই মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রীতি। এই বিষয়ে স্পিনোজা "এথিকার" পঞ্চমাংশের ৩৬তম প্রতিজ্ঞায় বলিয়াছেন,—"অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ঈশ্বর আপনাকে প্রীতি করিতে যাইয়া মানবকে প্রীতি করেন ; সুতরাং মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রীতি এবং ঈশ্বরের প্রতি মানবাত্মার প্রীতি একই বস্তু। অতএব আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি যে ঈশ্বরের প্রতি মানবের অবিরত নিত্য প্রীতি, অথবা মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রীতিই আমাদের মুক্তি, পরমানন্দ বা স্বাধীনতা।"

১০। অমরত্ব। অমরত্ব সম্বন্ধে স্পিনোজার মত সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু তাঁহার কোন কোন উক্তি দেখিয়া বোধ হয় তিনি

অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে মানবাত্মার ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও কল্পনাই বিনাশশীল; আত্মার যে জ্ঞান অনন্তের ভাব লাভে সক্ষম, সেই ভাগ অবিনাশী। উক্ত গ্রন্থের পঞ্চমাংশের ২২ তম প্রতিজ্ঞা এই,—"মানবাত্মা শরীরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে পারে না,ইহার কতকাংশ থাকে,সে অংশ অক্ষয়"। এই প্রতিজ্ঞার শেষ ভাগে স্পিনোজা বলিয়াছেন,—"অতএব যদিও শরীরের পূর্ব্বে আমরা ছিলাম, এই কথা আমাদের স্মরণ নাই, তথাপি আমরা অনুভব করিতেছি যে মানবাত্মা বলিতে যখন নিত্যত্বের আকারে শরীরের সার (অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়-লব্ধ বিজ্ঞানের সমষ্টি) বুঝায় তখন ইহা নিত্য, এবং আত্মার এই অস্তিত্ব সময়দ্বারা সীমাবদ্ধ বা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। অতএব যে পরিমাণে আত্মার অস্তিত্বে শরীরের বাস্তব অস্তিত্ব বুঝায়, সেই পরিমাণেই আত্মাকে কালাধীন বলা যায় এবং ইহার স্বরূপকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ করা যায়"। সসীমও উন্নতিশীল মানব-জীবনের পক্ষে কালশূন্য নিত্য অস্তিত্ব,নিস্তরঙ্গ অমরত্ব, কীদৃশ ব্যাপার, ইহাতে স্পিনোজা কি বুঝিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

THE THEISM OF THE UPANISHADS.

The writers of the *Upanishads* seem to have clearly seen the distinction between dogmatic and rational Theism,—the Theism that is based on mere traditional or instinctive belief, and the higher faith that comes out of insight and deep reflection on the nature of the world and of the soul. Having seen this distinction, they could not but further see that the passage from the one to the other was not an easy one. Every one that professed to be a believer and worshipper of God and felt a curiosity to know God, could not be admitted into the privileges of a theological student. Notwithstanding his belief and inquisitiveness, he might not possess the moral and

spiritual attainments necessary for a successful student. His mind might be too restless and too much taken up with things external to be able to fix itself upon super-sensuous realities, and if, by mere dint of intellectual concentration, he succeeded in understanding the nature of the Deity, his heart, unless purified and warmed by devotional exercises, would fail to establish itself in God, and would not thus truly find him. Our Theologians, therefore, insisted upon their pupils going through a long course of moral and spiritual exercise before they were admitted as regular students of the science of God. In the *Prashnopanishad*, we find the *Rishi* Pipalada sending away six inquirers after God,—inquirers who are described as worshippers of God, - sending away even such men for another year of disciplinary exercises before undertaking their regular instruction. In the *Chhandogya Upanishad*, Satyakama Jabala is turned out to tend his teacher's cattle, which not only tests his theological ardour and teaches him to be dutiful and obedient under the most trying circumstances, but further brings him in direct contact with Nature, and gives him special opportunities for cultivating habits of solitary reflection, so essential to the kowledge of things divine, so that, after his long and rigorous course of apprenticeship, he is enabled to know God with only a little help from his master. In the *Kathopanishad*, Mrityu consents to instruct Nachiketa in the mysteries of the soul only when, after offering him all the attractions of his divine palace, including all that men value most, he saw that the young man was insensible to them, and would not be satisfied by anything else than the knowledge he sought. The same *Upanishad* says :—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ !

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

"'He who has not given up bad habits, whose mind is not tranquil and used to spiritual concentration, cannot find him (*i. e.* God) even by knowledge," (II. 24.) showing that

knowledge, which is so essential to the finding of God, is not in itself sufficient to lead to him. We need not multiply instances. The following quotation indicates briefly how very difficult the rishis considered the passage from the religion of mere belief to that of philosophical or spirtual insight to be :—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

"Arise, awake, seek competent instructors and try to know God. The wise say that that way is as difficult to be passed as the sharp edge of a razor." (*Katha*, III. 14.)

Once admitted into the privileged circle of Theistic inquries, the pupil must have been made to go through prescribed courses of meditation and reasoning. What the lines of thought were which he followed in his attempt to reach rational or philosophical Theism, it is scarcely possible for us to discover with any amount of certainty. The instruction imparted must have been largely, if not exclusively, oral. The art of writing, even if introduced at all, must have been in its infancy, so that no records, properly so called, remain of the teachings of those who founded the philosophy of the *Upanishads*. The *Upanishads*,however, are not systematic treatises on Philosophy. They contain,like the Bible and other ancient scriptures,exhortations on ethical and spiritual life, anecdotes, stories, poetry,psychology and devout utterances which are as often poetical as philosophical. But notwithstanding their unsystematic character, they contain the elements of a system,—a profound and magnificent system of Philosophy. Being the product of various authors and even of different ages,they are not free from contradictions even on important matters, though the philosophical reader, accustomed to the tentative expressions of apparently conflicting but really complementary aspects of the same truth in philosophical literature, will find fewer contradictions in them than the ordinary reader.

Though, however, a strictly self-consistent system can no more be gathered from the *Upanishads* than from any body of "sacred books," a general current of thought towards certain philosophical doctrines may clearly be traced in them. This general current of thought in the writers of the *Upanishads* is all that we mean by the "Philosophy of the *Upanishads*." Though, as we have already observed, we have no proper record of the lines of thought which our old Theistic thinkers followed in reaching their conclusions, the conclusions themselves, and often the language in which they are clothed, indicate, with sufficient clearness, the method adopted by them. There are, besides, here and there, passages containing more or less luminous philosophical analyses which throw much light on the logical processes through which the minds of the rishis moved. Gathering these scattered fragments of light, we shall give a rough idea of the Theistic philosophy of the *Upanishads*.

On the subject of the relation of mind and matter, all indications lead us to conclude that the writers of *Upanishads* were Idealists. To them, as much as to Berkeley and Malebranche, Fichte and Hegel, and their followers, the world is through and through a mental construction. Whether manifested or unmanifested, it rests in mind. Objects, to them, as to the European Idealist, are essentially related to knowledge and can therefore exist only in knowledge. The *Aitareya* enumerates the various classes of objects, animate and inanimate, including even the highest gods, and says :—

সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং।
প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।

"All is produced by Reason and rests on Reason. The world is produced by Reason and rests on Reason, and Reason is Brahma. (III. 3.) The *Katha* says,—

তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।

"In him rest all worlds, and none are apart from him." (VI. 1.) The *Prashna* says,

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥

"As, my dear, birds rest on trees, so all rests on the Supreme Self." (IV. 7.) These and innumerable other passages of similar import can be explained only in the light of Idealism. What can the resting of all things on the Supreme Mind mean but the correlation of subject and object. The rishis must have seen that objects, with all their qualities, appear in mind, in knowledge, and that they can be believed in and thought of only in relation to mind. As the *Mundaka* says—

যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্

"In whom, the luminous one, all things rest and shine," (III. 2. 1.) and elsewhere,—

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

"Him, the shining, one, all things shine after; all shine through his light." (II. 2. 10.)

Such utterances may seem to some to indicate a Being whose existence is inferred from the indications of law and order in the world, a Being whose relation to Nature cannot be explained by the familiar relation of subject and object, and who, if he is directly cognisable at all, is so only in supreme moments of mystical insight. But the authors of the *Upanishads*, unlike the Natural Theologians of Europe, made little use of the Design Argument. The Reason in which they saw the world shine is not one of which they had any need to go in search of by the aid of ingeniously constructed arguments. They found it in themselves. It is identical with what every one calls his own Reason, his own Self. It is that which is the subject of knowledge in us,—that in relation to which all objects appear and exist for us. Let us hear how

the *Kenopanishad* distinguishes subject and object and identifies God with the former :—

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

"That which is not manifested by speech, but by which speech is manifested,—know that to be Brahma, and not this which people worship, *i.e.*, not anything that belongs to the world of objects. That which people do not think with the *manas* (*i.e.*, with the faculty of forming mental images of things), but that by which the *manas* itself is thought, (*i.e.*, made an object),—know that to be Brahma, and not what people worship. That which people do not see with the eye, but that by which people see visual objects,—know that to be Brahma, and not what people worship. That which people do not hear with the ear, but by which the ear is heard, (*i.e.*, made an object),—know that to be Brahma, and not what people worship. That which people do not smell, but by which the power of smelling is led to its object,—know that to be Brahma, and not to what people worship." (I. 4–8).

But by identifying Brahma with the subject or self in each person, do not the *Upanishads* make Brahma limited and plural ? They would indeed do so if by the 'Self' they meant anything that is, in its very nature, individual, particular.

But by 'Self' the *Upanishads* do not mean any such thing. They mean, by it, something that is, in its very nature, universal, that is common to all thinking individuals, the common basis of all objects, animate and inanimate,—of thinking persons themselves considered as particular objects. Thus *Katha*, in a deeply suggestive passage, (III. 10, 11.) says that objects are greater than the senses, and the *manas* greater than objects, the intellect greater the manas, and the soul greater than the intellect; the invisible power that produces the world of time and space is greater than the soul, and the Supreme Person, greater than that power, and that there is nothing greater than the Supreme Person, who is our ultimate goal. At each step of this analysis, the rishi names a category which comprehends the lower categories till he comes to the highest category—the Supreme Self, which transcends not only the sensorium and the intellect, where time and space end, but also that centre of spiritual activity to which, as a substance, intellect itself is refered as a mode or attribute. By the Supreme Person or Self therefore, the *Upanishads* mean something that trancends time, space and quantity, which belongs not only to me, a particular centre of spiritual activity, but to all such centres.

As the same *Upanishad* says,—

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

"What is here is there; what is there is here. He who sees plurality in this goes from death to death." (IV. 6) This is made much more clear in the dialogue between Narada and Sanatkumara in the *Chhandogya Upanishad*. Sanatkumara enumerates a number of categories, coming to a higher one at each step as Narada feels dissatisfied with each last, and at last he comes to Prana. Narada seems satisfied, as he cannot think of a higher category than life, with the departure of which every activity in us ceases.

But Sanatkumara, leads him to the highest category. where alone final satisfaction can be obtained, and that is the Infinite (Bhuma). But Narada, like all minds in which the highest enlightenment has not dawned, asks, "Where doth the Infinite abide, O Lord ?" just as we ask, "Where is the Self" ? or say, "The Self is here," thus making space a higher category than Self. Sanatkumara at first says, "The Infinite abideth in its own glory," but as if in anticipation of Narada's question, "Where is that glory ?" Sanatkumar withdraws even this seeming limitation of the Infinite and says, "It doth not abide in its glory." This Infinite, which comprehends all space, and so cannot be anywhere in particular, is then identified with the Self, and the infinitude of the Self described in the words—"Verily I extend from below, I extend from above, I extend from behind, I extend from before, I extend from the South, I extend from the North. Of a truth I am all this." It is then said that all the categories or objects enumerated above are products of the Self.

No demonstration, in the ordinary sense of the term, is offered of this apparently startling position that the Self in us—that which makes us knowing, thinking beings, is infinite and one in all. This may be partly due to the *rishis* not being perfect masters of the art of exposition, but it seems also, in part, due to the fact that the truth appeared to them too plain to require any formal demonstration. To us it seems that when one has brought together all the scattered rays of light the *rishis* have thrown on the problem to a focus, it strikes one as a real demonstration, if 'demonstration' is the word for the revelation of a truth which forms the background of all knowledge, all thinking, all demonstrations. In thinking of objects, we necessarily think of a subject. In knowing and thinking of the limitations of objects, even of mutually exclusive thinking objects or minds, we necessarily do so from the standpoint of a subject which

transcends all limitation,—we do so only by identifying ourselves with a Universal, which, since it is the condition of knowing and thinking limits, cannot itself be limited. In other words, it is not any individual,—any particular centre of spiritual activity as distinguished from other centres,—that knows and thinks limits as such, but the Infinite itself that does so; and in as much as the Infinite thinks my thoughts for me, I am one with it.

But if this is the Upanishadic view of the relation of Brahma and Jiva, if Jiva is one with Brahma, how is it that these very writings inculcate the worship of God on the part of man, and teach man to seek salvation through union with God? If the union is already real, what is there for us to aspire after? The answer to this question, from the standpoint of the *Upanishads*, is that Jiva as worshipper, as seeking deliverance, is not the same as Brahma. Jiva as worshipper, is identified not with the universal subject which is the condition of all thought and action, but with one of the many objects dependent upon that subject. Leaving apart the grosser objects,—matter, life and sensorium, with which, in the lower stages of his spiritual life, man identifies himself, his identification with the understanding, or a substance conceived of as the seat of the understanding, may be said to be, in a sense, final. In the highest stage of his spiritual life, he indeed realises the truth both theoretically and practically, that his true self is the Infinite. But even this realisation of ultimate unity with the Infinite implies a sort of duality, for, though the unity itself is eternal, the realization of it on the part of the worshipper is an event in time and thus belongs to a finite being. We are prepared to prove from quotations from the *Upanishads* that this duality the worshipper and the worshipped will never cease. But there are also passages of a doubtful import in these writings—passages which seem to teach the utter

annihilation of all that is finite and objective. Much depends upon how these passages are interpreted. We think, however, that spiritual experience confirms the interpretation which construes such 'annihilation' into the ideal subsumption of the finite into the infinite—the full consciousness on the part of the finite that in itself it is nothing,—the Infinite is all in all.

বন্ধন ও মোক্ষ।

নিজের ও পার্শ্ববর্ত্তিদিগের হৃদয়ে মোক্ষাকাঙ্ক্ষার ক্ষীণতা দেখিয়া, মোক্ষবিষয়ক প্রসঙ্গদ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মোক্ষার্থীর পক্ষে বন্ধন ও মোক্ষ উভয় বিষয়ে স্পষ্ট অনুভব থাকা আবশ্যক। 'আমি বদ্ধ', এই ধারণা স্পষ্ট না থাকিলে মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আবার, 'মোক্ষ অর্থ এই', 'এই অবস্থা আমার প্রাপ্য', মোক্ষের আদর্শ এরূপ স্পষ্টভাবে সম্মুখে না থাকিলেও মুক্তিপিপাসা প্রবল থাকিতে পারে না। রোগ-যন্ত্রণা তীব্ররূপে অনুভব করিলেই আরোগ্য চেষ্টা হয়; আবার 'ঔষধ বা চিকিৎসার উপায় এই—এবং চেষ্টা করিলেই ইহা লাভ করা সম্ভব' এরূপ স্পষ্ট বিশ্বাস না থাকিলেও চিকিৎসায় প্রয়াস ও চেষ্টা হয় না।

আমরা বন্ধন অনুভব করি এবং মোক্ষ কি তাহাও জানি,—ইহাই বুদ্ধিজীবী ও ধর্ম্মপ্রাণ জীবের বিশেষত্ব, মানবপ্রকৃতির মহত্ত্ব,—জীবত্ব ও দেবত্বের একত্র সমাবেশ। যে জীব কেবলই বদ্ধ, সম্পূর্ণরূপেই বদ্ধ, তাহার পক্ষে বদ্ধনানুভব অসম্ভব; সে জানে না যে সে বদ্ধ। বন্ধনানুভবেই মুক্তাবস্থার আভাস বর্ত্তমান। পুনশ্চ, যে মোক্ষ কি তাহা জানে, সে বদ্ধ হইলেও মোক্ষ-

প্রাপ্তির জন্য অভিপ্রেত, তাহার বদ্ধভাব সাময়িক,—তাহার মূল মুক্ত প্রকৃতির অস্থায়ী বিকৃতি মাত্র। পক্ষান্তরে যিনি চিরমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ, তাঁহার পক্ষে বন্ধন-যন্ত্রণা নাই, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টাও নাই। যে বদ্ধ হইয়াও বন্ধন অনুভব করে এবং মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করে, সে সসীম হইলেও অসীমত্বের অধিকারী, সে অসীমকে হৃদয়ে বহন করে, অসীমের গুরুভার অনুভব করে। পুনশ্চ, যিনি চিরমুক্ত হইয়াও বদ্ধকে মুক্ত করিতে ব্যস্ত, জীবকে বন্ধন হইতে মোক্ষে লইয়া যাওয়া যাঁহার নিত্য কার্য্য, তিনি অসীম হইলেও নিশ্চয়ই তাঁহার প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহার সহিত সসীমত্বের অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ।

এই কথাগুলি জীবনের অভিজ্ঞতাসংশ্লিষ্ট দৃষ্টান্তযোগে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। আমি চাই কামনাকে বশীভূত করিতে, কিন্তু কামনা যখন-তখনই আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলে। আমি চাই প্রেমিক, কোমল, ক্ষমাশীল হইতে, কিন্তু ক্রোধ আসিয়া আমার প্রেমচক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলে। আমি চাই নিঃস্বার্থ পরসেবক হইতে, কিন্তু স্বার্থপরতা আসিয়া আমার হৃদয় ও হস্তকে অসাড়, জড়ীভূত করিয়া ফেলে। আমি চাই বিনীত নিরহঙ্কারী হইয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে, কিন্তু অহঙ্কার আসিয়া আমাকে আত্মগৌরবে গর্ব্বিত করে। এই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় বদ্ধ ও মুক্তভাব, সসীম ও অসীমভাব, দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান ও তৎপ্রতিবন্ধক অবিদ্যার আশ্চর্য্য মিশ্রণ বর্ত্তমান। কামনার বশীভূত হইতে যাইয়া আমি ক্ষণকালের জন্য কামনাতৃপ্তিকে আমার প্রকৃত মঙ্গল বলিয়া স্বীকার করি, ক্ষণস্থায়ী ভোগকে অন্বেষণ ও প্রয়াসের উপযুক্ত বিষয় বলিয়া গ্রহণ করি, কতিপয় স্থূল এবং জরা, ব্যাধি ও বিনাশাধীন ইন্দ্রিয়কে তর্পণীয়, সেবনীয় বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করি,—যাহা বিষয় মাত্র, আত্মার আশ্রিত অধীনস্থ ব্যাপার মাত্র, তাহাকে আত্মবস্তু বলিয়া ভ্রম করি। ক্রোধেও এই অজ্ঞানতা, এই আত্মবিস্মৃতি বর্ত্তমান। নিজে ঘোরতর অপরাধী হইলেও আপনাকে কাহারো ত্যাজ্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, নিজের অপরাধকে পরিতাপ ও সংশোধনেচ্ছা ব্যতীত অপর কোন ভাবের বিষয় বলিয়া মনে করি না, কিন্তু অন্যের পাপ আমার অসহ্য হয়, পাপকারীকে নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণা, বিরাগ ও বর্জ্জনের উপযুক্ত বিষয় বলিয়া মনে হয়; আমি ঈশ্বরের পক্ষে যাহা,

ঈশ্বরের চক্ষে যাহা, সেও তাহাই, মূল কারণের একত্বে আমি ও সে একই, "অভেদঃ পরমাত্মনি"—এই কথা ভুলিয়া যাই, এবং ভুলিয়া যাই বলিয়াই ক্রোধের অধীন হই। স্বার্থ পরার্থের বিরোধেও এই কথা। আমি মনে করি আমার ও আমার প্রতিবেশীর স্বার্থ ভিন্ন, আমি ও সে পৃথক্, বিচ্ছিন্ন, আমি ও সে এক সূত্রে গ্রথিত নহি, তাহার মঙ্গল না হইলেও আমার মঙ্গল হইতে পারে। ইহাতে কেবল আমার মূর্খতার একশেষই প্রকাশ পায়। অহংকারেও এই মূর্খতারই উদ্দাম প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি যে আমার কৃতকার্য্যতায় স্ফীত ও গৌরবান্বিত হই, ইহাতে কেবল আমার একটা অতি ভ্রান্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকাশ পায়। আমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া মনে করি আমার বিদ্যাবুদ্ধি, বলবীর্য্য অনন্ত হইতে পৃথক্ বস্তু, অনন্তের আশ্রিত, অঙ্গীভূত, অংশীভূত নহে। এরূপ ধারণা অজ্ঞানতার পরাকাষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপাসনা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি গভীরতর ব্যাপারেও এই অজ্ঞানতা, এই অসম্যক্ দৃষ্টি, এই ভ্রান্ত স্বাতন্ত্র্যবোধই মূল অন্তরায়। 'প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র বস্তু,' এই ভ্রান্ত বুদ্ধি বশতঃই ঈশ্বর প্রকৃতিদ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। 'আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন বস্তু,' এই মিথ্যা সংস্কারই আত্মাতে পরমাত্ম-দর্শনের প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক না ঘুচিলে উচ্চ প্রেম, ভক্তি, সেবা ও আনুগত্য অসম্ভব।

সুতরাং দেখা যাইতেছে অবিদ্যাই বন্ধনের হেতু। বিষয়কে বিষয়ী বলিয়া মনে করা, ব্যক্তিকে সমাজ হইতে পৃথক্ বলিয়া বিশ্বাস করা, জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া ভ্রম করা, নিজ মঙ্গলকে জ্ঞানের শুদ্ধ আলোকে সমাজের সহিত একতা, ব্রহ্মের সহিত একতারূপ অতি প্রশস্ত বস্তুরূপে না দেখিয়া বাসনার আলেয়ায় ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ভোগ বলিয়া মনে করা—ঈদৃশ অজ্ঞানতাই বন্ধনের কারণ, এবং এই অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলেই মোক্ষ প্রতিবন্ধক-শূন্য হয়।

তবে কি জ্ঞানই মোক্ষ? জ্ঞানলাভেই কি মোক্ষের পর্য্যবসান? এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আধ্যাত্মিক জীবনের বিচিত্র ব্যাপার সমূহকে একটি মাত্র নামে অভিহিত করাতে কেবল ভ্রমের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়; সুতরাং আমি ইহার পক্ষপাতী নহি। 'জ্ঞান' বলিতে যদি কেহ প্রেম ও পুণ্যের অভাব বুঝেন,—এবং এরূপ বুঝাই সাধারণ,—তবে আমি মুক্তাবস্থাকে কেবল

'জ্ঞান' বলিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি 'জ্ঞান' বলিতে জ্ঞানের সহিত অবস্থাবিরূপে সম্বদ্ধ প্রেম পুণ্যও বুঝা হয়,তবে মোক্ষকে দিব্যজ্ঞানের অবস্থা বলিতে আমার কোন আপত্তি নাই। আত্মার শক্তিসমূহকে ব্যাবহারিক প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন শক্তি অপর কোন শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; কারণ সমুদায় শক্তিই এক অখণ্ড মূল বস্তুর প্রকাশ মাত্র। বিশেষতঃ, জ্ঞান সম্বন্ধে এই কথা বিস্মৃত হওয়া কখনই নিরাপদ নহে যে ইহা অত্যন্ত মৌলিক বস্তু, ইহা সমুদায় আধ্যাত্মিক শক্তির ভিত্তি ও পরিচালক, ইহাকে ছাড়িয়া কোন আধ্যাত্মিক শক্তিই কার্য্য করিতে পারে না। ধর্ম্মজগতে অনেক সময় নামমাত্র জ্ঞানের সহিত, অথবা কার্য্যতঃ অজ্ঞানতার সহিত, বহুল পরিমাণ প্রীতি, ভক্তি ও কার্য্যশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ বস্তুকে আধ্যাত্মিক জীবনের অগঠিত উপকরণ বলিয়া মনে করা যায়; কিন্তু ইহাকে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া ভ্রম করা অতীব বিপদজনক। যাহা হউক, মোক্ষকে কেবল 'জ্ঞান' নামে অভিহিত করা হউক আর নাই হউক, ইহা নিশ্চিত কথা যে বিশুদ্ধ ও স্থায়ী জ্ঞানের সহিত প্রেম, পুণ্য, কার্য্যশীলতা প্রভৃতি অন্যান্য আধ্যাত্মিক বস্তুর অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ। দিব্য ও স্থায়ী জ্ঞানের আবির্ভাবে স্বতঃই এই সকল বস্তুর প্রকাশ হয়। এই বিষয়েও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা শুনা যাক্।

বুদ্ধির মীমাংসা, বুদ্ধিসহ চিন্তা, জ্ঞানের নিম্নতম সোপান মাত্র। এই সোপানের জ্ঞান কখনও মোক্ষের হেতু হইতে পারে না। এই নিম্নতম জ্ঞানের শাস্ত্রীয় নাম 'ধ্যান' অর্থাৎ চিন্তাপ্রবাহ। ইহার উপরে 'ধারণা', অর্থাৎ মীমাংসিত, চিন্তিত সত্যে চিত্তকে স্থিত করিবার চেষ্টা। ধারণার উপরে 'সমাধি' অর্থাৎ পরম তত্ত্বের উপর চিত্তের পূর্ণরূপে স্থিতি। এই সমাধিগত জ্ঞানই উচ্চতম, প্রকৃততম জ্ঞান। ইহাই মোক্ষের হেতু। এই দিব্যজ্ঞানরূপ সমাধি প্রত্যেক উপাসকের লক্ষ্য ও সাধনের বিষয়। যিনি যে পরিমাণে এবং যতক্ষণ ঈশ্বরোপলব্ধি করেন, তিনি সেই পরিমাণে এবং ততক্ষণ সমাধি বা প্রকৃত উপাসনা ভোগ করেন,—তিনি সেই পরিমাণে এবং ততক্ষণ মুক্তাবস্থা আস্বাদন করেন। উচ্চ উপাসনার অবস্থায় জড়ের জড়ত্ব দূর হয়, আমরা জড়কে ঐশীশক্তি বলিয়া উপলব্ধি করি। আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, ত্রিজগৎ ব্রহ্মাবির্ভাবে

পূর্ণ হয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টের ভেদবোধ চলিয়া যায়, সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাক্ষাৎ লীলা, সাক্ষাৎ প্রকাশ, বলিয়া অনুভব করা যায়। অন্তর্জগতেও এই ব্রহ্মাবির্ভাব,—বরঞ্চ আরও গাঢ়তর, মিষ্টতর রূপে। সাক্ষাৎ অনুভবে বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মৌলিক একত্ব অনুভূত হয়। যিনি ব্রহ্মকে অনুভব করেন, ব্রহ্ম যাঁহার অনুভবের বিষয়ীভূত হন, তাঁহার পক্ষে অনুভবকর্ত্তা, অনুভবশক্তি ও অনুভবের বিষয়, এই তিনের মধ্যে—আপাত-তিনের মধ্যে—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে—ভিন্নতাবোধ অসম্ভব। তিনি যেমন বহির্জ্জগৎ তেমনি অন্তর্জ্জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন, অনন্ত ব্রহ্ম-জলধিতে ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছুর স্থান দেখিতে পান না। তাঁহার পক্ষে অন্তর বাহিরের প্রভেদও থাকে না; অন্তর বাহিরের প্রভেদও অবিদ্যাজাত, ব্যাবহারিক মাত্র বলিয়া অনুভূত হয়। এরূপ ব্রহ্মোপলব্ধিতে বিচিত্রতাবোধ নষ্ট হয় না; কিন্তু সমুদয় বিচিত্রতার মধ্যে এক অখণ্ড অদ্বিতীয় বস্তু উপলব্ধি হয়। বিচিত্রতা একত্বের বিরুদ্ধ বোধ না হইয়া একত্বের আশ্রিত, অধীনস্থ তত্ত্ব বলিয়া অনুভূত হয়। সমগ্র জগৎ, সমগ্র অস্তিত্ব, লীলাময় ব্রহ্মের বিচিত্র লীলারূপে উপলব্ধ হয়।

এই দিব্যজ্ঞানের অবস্থা গভীর প্রেম, আনন্দ ও পুণ্যের অবস্থাও বটে। এই অবস্থা লইয়া যতক্ষণ সংসারে বিচরণ করা যায়, ততক্ষণ চিন্তা, বাক্য বা কার্য্যে অপ্রেম অপবিত্রতার লেশ মাত্র থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় আত্মা যোগানন্দে পরিতৃপ্ত, ইহাতে বিষয় বাসনার আকর্ষণ অসম্ভব। ইহাতে ক্রোধের উদ্রেক সম্ভব নহে, কারণ সর্ব্বময় ব্রহ্মোপলব্ধিতে আত্মপর সমান হওয়াতে ক্রোধের বীজ নষ্ট হইয়াছে। ইহাতে স্বার্থ পরার্থের বিবাদ অসম্ভব, কারণ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিতে, আত্মবোধের অসীম প্রসারে স্বার্থ পরার্থ এক হইয়া গিয়াছে, প্রত্যেক জীবের স্বার্থ ই সাধকের স্বার্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় অহঙ্কার সম্ভব নহে; এক অখণ্ড অনন্ত অহ-মের উপলব্ধি সাগরে অবিদ্যাজাত স্বতন্ত্র অহংবোধ নিমগ্ন হইয়াছে। ইহাতে আলস্য, জড়তা, নিষ্ক্রিয়ভাবও অসম্ভব, কারণ ইহাতে যে বস্তুর সহিত সাধক একত্বানুভব করেন, সে বস্তু নিত্য ক্রিয়াশীল, সে বস্তু প্রতিনিয়ত জগতের অজ্ঞানতা, অপ্রেম, অপবিত্রতা ও দুঃখ দূর করিয়া জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আনন্দের রাজ্য স্থাপনে ব্যস্ত রহিয়াছে।

সুতরাং অবিদ্যাই বন্ধনের হেতু, এবং জ্ঞানই মোক্ষের হেতু, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বন্ধনকে কেবল অবিদ্যার অবস্থা বলিলে ভ্রম জন্মিতে পারে। ইহাকে কেবল অবিদ্যার অবস্থা বলিয়া অনেকে অতৃপ্ত হইতে পারেন। মনে হইতে পারে ইহাকে অজ্ঞান, অপ্রেম, অপবিত্রতার অবস্থা না বলিলে যথেষ্ট বলা হইল না। তেমনি মোক্ষের অবস্থাকে কেবল জ্ঞানের অবস্থা না বলিয়া জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার অবস্থা বলা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বন্ধনের মূলে অবিদ্যা, এবং মোক্ষের মূলে দিব্য জ্ঞান বিদ্যমান। জ্ঞানাবির্ভাবে অবিদ্যা ধ্বংস হইলেই মোক্ষের অবস্থা—নিত্য প্রেম, নিত্য পুণ্য ও নিত্যানন্দের রাজ্য আরব্ধ হয়। সুতরাং মোক্ষার্থীর পক্ষে জ্ঞান লাভই মূল লক্ষ্য। অবিদ্যা বীজ বিনষ্ট না হইলে বন্ধনরূপ বিষবৃক্ষ সমূলে বিনষ্ট হয় না। জ্ঞানবীজ রোপিত না হইলে মধুর ফলশালী মোক্ষ-পাদপাবির্ভাবের আশা নাই।

বন্ধন ও মোক্ষের অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—অবিদ্যা নাশের সঙ্গে সঙ্গে, মোক্ষাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবের জীবত্ব বিনষ্ট হয় কি না? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এক অর্থে বস্তুতঃ তাহাই হয়। অবিদ্যা বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রকৃত বস্তুর বিনাশ হয় না। 'মোক্ষ' অর্থ বন্ধন-মোচন, বন্ধন মোচনে বস্তুর বিনাশ হওয়া দূরে থাকুক, বরং এক অর্থে নবজীবন লাভই হয়, সুতরাং ইহাকে কোন প্রকৃত বস্তুর বিনাশ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু অবিদ্যা বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহা অবিদ্যানাশের পূর্ব্বেও প্রকৃতপক্ষে ছিল না, পারমার্থিকভাবে ছিল না, কেবল অবিদ্যার পক্ষেই ছিল, অবিদ্যাজাত কল্পনার পক্ষেই ছিল, অবিদ্যাশাসিত ব্যাবহারিক রাজ্যেই ছিল,—অবিদ্যা নাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেই বস্তু কি? সেই বস্তু ভ্রান্ত জীবভাব, জীবের কল্পিত স্বাতন্ত্র্য। অবিদ্যাযুক্ত জীব মনে করে—আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র একটী বস্তু। তিনি যেমন একটী বস্তু, আমিও তেমনি একটী বস্তু। তাঁহার যেমন জ্ঞান, ভাব, শক্তি আছে, আমারও তেমনি নিজস্ব জ্ঞান, ভাব, শক্তি আছে। তিনি এক জন ব্যক্তি, আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন একজন ব্যক্তি; তবে, তিনি বৃহৎ, অনন্ত, আমি ক্ষুদ্র, সান্ত, এই মাত্র প্রভেদ। দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাবে এই স্বাতন্ত্র্য-

বোধের ভ্রম উপলব্ধ হয়। ইহার আলোকে দেখা যায় আমার স্বতন্ত্র জ্ঞান নাই, ভাব নাই, শক্তি নাই, সুতরাং স্বতন্ত্র বস্তুত্ব নাই, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই। আমার আত্মত্ব, আমার বস্তুত্ব, আমার ব্যক্তিত্ব অনন্ত আত্মা, বস্তু ও ব্যক্তির অঙ্গীভূত। অবিদ্যার অবস্থায় জীব বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলাম, অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র বস্তু, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ বস্তু নাই। বস্তু যাহা দেখিতেছি, যাহা জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অনন্ত ব্রহ্মবস্তু; ইহার অতিরিক্ত জীব বলিয়া কোন বস্তু নাই। সুতরাং এই অর্থে অবিদ্যানাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও বিনাশ হইল,—কল্পনাজাত বস্তু কল্পনার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইল। দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাবে জ্ঞানালোক-প্রকাশিত, বিচিত্র স্বরূপময়, অনন্ত, অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু একমাত্র বস্তুরূপে রহিলেন; অবিদ্যার বিষয়ী-ভূত জীব এই ব্রহ্মবস্তুতে বিলীন হইল।

বিষয়টা এই পর্য্যন্ত বুঝিলে,—'বুঝিলে' বলা ঠিক নয়,—এই পর্য্যন্ত বলিলে, আপাততঃ মনে হয় মোক্ষ ব্যাপারটা কেবল বিনাশেরই ব্যাপার। ইহা নামে মোক্ষ, কাজে বিনাশ। ইহাতে জীব বা ব্রহ্ম কাহারোই কিছু লাভ নাই। ব্রহ্মের কিছু লাভ নাই; কারণ তিনি পূর্ব্বেও অনন্ত, পরেও অনন্ত; জীব তাঁহাতে লীন হইবার পূর্ব্বে তিনি যাহা ছিলেন, জীব তাঁহাতে লীন হই-লেও তিনি তাহাই থাকেন; তাঁহার কিছু কমেও না, বাড়েও না। ইহাতে জীবেরও কিছু লাভ নাই, বরং ক্ষতি; কারণ ইহাতে এই দাঁড়ায় যে জীব মরিবার জন্যই জন্মে, মরিবার জন্যই বাঁচে, মরণই তাহার জীবনের লক্ষ্য। আর, ইহাতে এই সিদ্ধান্তও হয় যে মোক্ষের সাধক প্রকৃত পক্ষে কেহ নাই; মোক্ষের একমাত্র সাধক অবিদ্যা-কল্পিত জীব। এই জীব অবিদ্যা-প্রভাবে জন্মে, অবিদ্যা বশে মোক্ষ লাভে প্রয়াস করে, এবং নিজের বীজভূত অবিদ্যার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বস্তুতঃ মোক্ষ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রমমূলক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অবিদ্যানাশে প্রকৃত বস্তু কিছুই বিনষ্ট হয়না, অবিদ্যাকল্পিত বস্তুই বিনষ্ট হয়। অবিদ্যানাশের পূর্ব্বেও আত্মবস্তু ছিল, জ্ঞাতা ছিল, জ্ঞান ছিল, জ্ঞেয় ছিল, এখনও—অবিদ্যানাশের পরেও—আছে। পরিবর্ত্তন এইমাত্র হইয়াছে যে এই তিনকে পরস্পর ভিন্ন মনে না হইয়া, একই বস্তুকে দেখিবার

তিনটী প্রকার বলিয়া বুঝা হইয়াছে। মোক্ষের সাধক যে সাধনা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছেন তাহা নহে; সাধক কেবল সাধনা-প্রভাবে অবিদ্যা-কল্পিত স্বাতন্ত্র্যবোধ ও তজ্জনিত অপ্রেম ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইয়া নিজ নির্ম্মল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই মাত্র। অবিদ্যার সহিত সংগ্রাম শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মপ্রীতি, ব্রহ্মসেবা, কিছুরই শেষ হয় নাই। অবিদ্যা-কল্পিত জীবভাব বিনষ্ট হইয়াছে বটে, এখন এক অখণ্ড পরমাত্মা ব্যতীত আর আত্মা নাই বটে, কল্পিত ভেদ তিরোহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একত্বের আশ্রিত, একত্বের অধীনস্থ বিচিত্রতা, অভেদের অবিরুদ্ধ ভেদ, তিরোহিত হয় নাই, এবং এই বিচিত্রতা, এই ভেদাভেদ থাকাতে মূল প্রকাশ ও অনুপ্রকাশের সম্বন্ধ, উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ, সেব্য ও সেবকের সম্বন্ধ, পূর্ণ ও অপূর্ণের সম্বন্ধ, সমস্তই অব্যাহত রহিয়াছে। সুতরাং অবিদ্যা-কল্পিত স্বতন্ত্র জীব বিনষ্ট হইয়াছে বটে,—এক, অখণ্ড, অনন্ত ব্রহ্মসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে,—কিন্তু ব্রহ্মের লীলারূপী, অবিদ্যামুক্ত, নির্ম্মল জীব বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক্, বরঞ্চ নিজ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, নিজের ব্রহ্মাত্মভাব, ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্ব,—যাহা মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বেও ব্রহ্মেতে নিত্যরূপে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু অবিদ্যাপ্রভাবে পরিজ্ঞাত হয় নাই—তাহাই এখন অনুভব করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে। এই নির্ম্মল জীবভাব প্রাকৃতিক মলিন জীবভাব হইতে এত ভিন্ন যে অনেক সাধকই ইহাকে জীবভাব বলিতে ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহার অস্তিত্ব একান্তই স্বীকার্য্য। অবিদ্যামূলক স্থূল ভেদ দিব্য জ্ঞান প্রভাবে বিনষ্ট হইলেও ঐশী শক্তিকৃত বিচিত্র সম্বন্ধ—এবং সম্বন্ধে যদি একপ্রকার ভেদ বুঝায়, তবে ভেদ—অবিনাশী। ঐশী শক্তি নির্ম্মল জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিতা, অবিদ্যামুক্তা। তাহার কৃত সূক্ষ্ম ভেদ অবিদ্যানাশের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হওয়া অসম্ভব। জীবসৃষ্টি অবধি জীবের মোক্ষলাভ ও ব্রাহ্মী স্থিতির পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ চিরকাল, এই ভেদ অব্যাহত থাকে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। প্রথমতঃ, জীবসৃষ্টি ব্যাপারেই এই ভেদ বর্ত্তমান, অথচ এই ভেদ অবিদ্যামূলক নহে, কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিদ্যা থাকে না, জীব-সৃষ্টির পরে, জীবের অসম্যক্ দৃষ্টি হইতে, অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে অনন্ত মহাপ্রকাশ, অব্যাহত

জ্ঞানৈশ্বর্য্য; কিন্তু সৃষ্টিব্যাপারে প্রতিহত জ্ঞানৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট অনুপ্রকাশ,—বৃহৎ অনন্তের ভিতরে রহস্যপূর্ণ ক্ষুদ্রতার বেষ্টন। জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য ব্রহ্মের জ্ঞানৈশ্বর্য্য ব্যতীত কিছুই নহে; জীব ব্রহ্মেরই অনুপ্রকাশ, সন্দেহ নাই; কিন্তু মূল একতায় এই অবান্তর ভেদ,—মূল প্রকাশ ও অনুপ্রকাশের ভেদ—তিরোহিত হয় না। তার পর, জীবনব্যাপী মোক্ষসাধনার প্রত্যেক পাদক্ষেপেই এই ভেদ বর্ত্তমান। মোক্ষের সাধক অবিদ্যা নহে, অবিদ্যাক্রান্ত জীববস্তু, আত্মবস্তুই মোক্ষের সাধক। সাধক জানেন আমার অবিদ্যা সাধনাপ্রভাবে দূর হইবে, আমি অবিদ্যামুক্ত হইব, নির্ম্মল হইব, নিজ শুদ্ধ স্বভাব লাভ করিব। সুতরাং সাধক অবিদ্যা নহে, কোন অবিদ্যা-কল্পিত বস্তুও নহে, ব্রহ্মের অনুপ্রকাশরূপী প্রকৃত বস্তু জীবই সাধক। তিনি নিজ স্বরূপ যতদূর বুঝুন্ আর নাই বুঝুন্, নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে যতই কল্পনার অধীন হউন্, তিনি মূলে কল্পনা-জাত নহেন, তিনি প্রকৃত বস্তু। তার পর, যখন তিনি অবিদ্যা-মুক্ত হন, মোক্ষলাভ করেন, কল্পিত ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তখনও কোন শক্তি তাঁহার ব্রহ্মমূলক বস্তুত্ব বিনাশ করিতে পারে না, এবং নির্ম্মলতম একত্ব-জ্ঞানও সাধ্য-সাধকের সম্বন্ধমূলক ভেদ দূর করিতে পারে না। পরন্তু মোক্ষ ব্যাপারের মূলেই সেই ভেদ বিদ্যমান। সাধক অনুভব করেন ব্রহ্ম আমার আত্মা, আমি ব্রহ্মের সহিত এক,—সোঽহং, অর্থাৎ যে 'অহং'কে এত দিন 'সঃ' হইতে ভিন্ন ভাবিতেছিলাম সেই 'অহং' বস্তুতঃ 'সঃ' হইতে ভিন্ন নহে, 'অহং' আর 'সঃ' একই। সাধকের এই অনুভব যথার্থ, সত্যমূলক, সন্দেহ নাই, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে দেখুন্, এই অনুভব সাধ্যের নহে, সাধকের; উপাস্যের নহে, উপাসকের। এই অনুভব ব্রহ্মশক্তির লীলা সন্দেহ নাই; জীবের এমন কিছুই নাই যাহা ব্রহ্মশক্তির লীলা নহে; কিন্তু এই অনুভব ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্গত নহে; ব্রহ্মের অনন্তত্বের দিক্‌কার ব্যাপার নহে। অনন্ত, অবিকৃত নিত্যস্বরূপে অবিদ্যাবন্ধনের ক্লেশবোধ নাই, মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা নাই, মোক্ষের সাধনা নাই, সুতরাং মোক্ষপ্রাপ্তি ও তজ্জনিত আনন্দ এবং কৃতকৃতার্থতাও নাই। তাহাতে 'সঃ' ও 'অহমের' ভেদবুদ্ধি নাই, ভেদাপগম নাই, সুতরাং "সোঽহং" এই মহাবাক্যের সাধনা নাই, সিদ্ধিও নাই। কিন্তু ব্রহ্মের অনুপ্রকাশরূপী, ব্রহ্মশক্তির লীলারূপী জীবে এই সমস্তই বর্ত্তমান। সুতরাং মোক্ষের অবস্থায়ও,
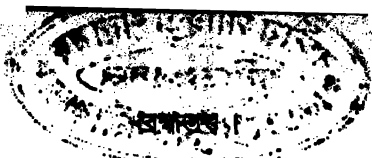
সিদ্ধির অবস্থায়ও, জীব অনন্ত হইতে ভিন্ন,—মূলে এক হইয়াও ঐশী লীলা-প্রভাবে অবান্তরে ভিন্ন,—সিদ্ধি ও মোক্ষের ভাগী বলিয়াই ভিন্ন, কারণ সিদ্ধি ও মোক্ষ ব্রহ্মের নহে, জীবের। সুতরাং 'অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে জীবও বিনষ্ট হয়, জীবরূপ বস্তু বিনষ্ট হয়.' এই কথা সত্য নহে। অবিদ্যানাশে অবিদ্যা-কল্পিত মিথ্যা জীব বিনষ্ট হয়, ব্রহ্মালোক সাগরে ছায়াময় জীব লীন হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত, ব্রহ্মের অঙ্গীভূত,বস্তুরূপী জীব বিনষ্ট হয় না ; পরন্তু ব্রহ্মকৃপাবলে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক হইয়া, ব্রহ্মসারূপ্য, ব্রহ্মৈকত্ব লাভ করিয়া, অনন্ত কালের জন্য ব্রহ্মের "অখিল লীলারসে" নিমগ্ন হয়।

এতক্ষণ নিজ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা, এবং যুক্তি ও প্রমাণের কথা বলিলাম। এখন শাস্ত্রের কথা কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহার সময় নাই। কেবল একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। কোন শাস্ত্রের জন্য আমার অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব নাই, কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে অযৌক্তিক বিদ্বেষও নাই। শাস্ত্রের বিচার জ্ঞানদ্বারা, শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞানের বিচার নহে। কিন্তু আমি আর্য্য সন্তান বলিয়া, হিন্দুজাতির অঙ্গীভূত বলিয়া, আমার পক্ষে একটা বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, বন্ধন ও মোক্ষের যে ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সমক্ষে * বিবৃত করিলাম, তাহা আমাদের দেশীয় উপনিষদ্-মূলক মোক্ষশাস্ত্রের অনুমোদিত। আমি শাস্ত্রার্থ যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হয় আমার ব্যাখ্যাত মত উপনিষদুক্ত মোক্ষতত্ত্বের সহিত এক, ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতার সহিত এক, এবং—স্থানে স্থানে আপাতবিরোধ সত্ত্বেও—মূলে শঙ্করের অভিপ্রায়ের সহিতও এক। সুতরাং সুসভ্য সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্মের বহুল নিন্দা শুনিয়াও যেমন সাধু পল বলিয়াছিলেন, "আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য লজ্জিত নহি", (ইংরেজি অনুবাদ—I am not ashamed of the gospel of Christ) তেমনি বেদান্ত মতের বহুল ভ্রান্ত ব্যাখা ও অসংখ্য নিন্দা শুনিয়াও আমি বলি—'আমি আমাকে বৈদান্তিক বলিতে লজ্জিত নহি, 'I am not ashamed of the Vedanta.'

---

* তত্ত্ববিদ্যাসভার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে।
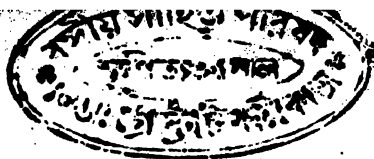
মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যকৃত ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উপক্রমণিকা।

ওঁ অব্যক্তাতীত নারায়ণ। অব্যক্ত হইতে অণ্ডের উৎপত্তি। এই সমুদায় লোক এবং সপ্তদ্বীপা মেদিনী অণ্ডের অন্তর্ভূত।

সেই ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং তাহার স্থিতির জন্য ইচ্ছুক হইয়া, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতির সৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তিরূপ বেদোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। তৎপর সনক সনন্দ প্রভৃতিকে উৎপাদন করিয়া জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপ নিবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন।

বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। জগৎ রক্ষার একমাত্র কারণ এবং প্রাণিদিগের অভ্যুদয় (অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি) ও মুক্তির সাক্ষাৎ হেতু যাহা, তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও আশ্রমিগণ শ্রেয়োলাভের অভিপ্রায়ে বহুদিন হইতে অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। অনুষ্ঠাতৃদিগের কামোদ্ভব-বশতঃ বিবেক-বিজ্ঞান হীন হইলে পর তজ্জনিত অধর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম অভিভূত হওয়াতে এবং অধর্ম্ম প্রবর্দ্ধিত হওয়াতে জগতের স্থিতি রক্ষণে ইচ্ছুক হইয়া আদিকর্ত্তা নারায়ণ নামক বিষ্ণু পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষণার্থ বসুদেবের ঔরসে এবং দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণরূপে আংশিকভাবে সম্ভূত হইয়াছিলেন; যেহেতু ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার দ্বারাই বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষিত হয়, কারণ বর্ণাশ্রমভেদ সমূহ তাহারই অধীন।

জ্ঞানৈশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য, তেজ প্রভৃতির দ্বারা নিত্যযুক্ত সেই ভগবান্ আপনার ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়ারূপিণী মূলপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, অজ, অব্যয়, ভূতসমূহের ঈশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব হইলেও, নিজ মায়া-দ্বারা দেহবানের ন্যায়, জাত-ব্যক্তির ন্যায়, লোকানুগ্রহ করিতেছেন বলিয়া লক্ষিত হন। তিনি নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও জীবসমূহকে অনুগ্রহ করিবার

ইচ্ছায় শোকমোহরূপ মহাসাগরে নিমগ্ন অর্জ্জুনকে বৈদিক ধর্ম্মদ্বয় উপদেশ করিয়াছিলেন। এরূপ উপদেশের উদ্দেশ্য এই যে সমধিক গুণযুক্ত ব্যক্তি-গণকর্ত্তৃক ধর্ম্ম গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হইলে ইহা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। ভগবান্ যেরূপে সেই ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতা-নামক সপ্তশত শ্লোকের আকারে ইহাকে সেইরূপে গ্রথিত করিয়াছেন।

সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহস্বরূপ এই গীতাশাস্ত্রের অর্থ সহজে বুঝা যায় না। অনেকে ইহার অর্থ প্রকাশের জন্য ইহার পদ, পদার্থ, বাক্যার্থ ও যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও লোকে ইহাকে অনেক প্রকার বিরুদ্ধ অর্থে গ্রহণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি বিশেষ বিচারানুসারে ইহার অর্থ নির্দ্ধারণা-ভিপ্রায়ে সংক্ষেপে ইহার ব্যাখ্যা করিব।

সংক্ষেপে এই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন বলিতেছি ;—ইহার প্রয়োজন পরম মোক্ষ অর্থাৎ সংসারের হেতু যে অবিদ্যা, সেই অবিদ্যাসহ সংসারের সম্পূর্ণ উপ-রম। এই মোক্ষ সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতে জন্মে। গীতার লক্ষ্যরূপ এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান্ অনুগীতাতে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মপদলাভই সুপর্য্যাপ্ত ধর্ম্ম।" উক্ত গ্রন্থেই আরো বলিয়াছেন,—"যিনি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া নীরবে একাসনে লীন আছেন, তিনি ধর্ম্মীও নহেন, অধর্ম্মীও নহেন, শুভাশুভ ভাগীও নহেন।" আরো, জ্ঞান সন্ন্যাস-লক্ষণ, ইহাও বলিয়াছেন। এই গীতার অন্তভাগে তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকে আশ্রয় কর" (১৮।৬৬)। সাংসারিক উন্নতির জন্য বর্ণাশ্রম-সমূহের উদ্দেশে যে প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহা দেবাদিস্থান প্রাপ্তির হেতু হইলেও যদি তাহা ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হয় এবং ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। আর, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞান-নিষ্ঠা বিষয়ে যোগ্যতা প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি হয়, এইরূপে উক্ত কর্ম্ম মুক্তিরও কারণ হয়। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ পরে বলিবেন—"সংযতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে কর্ম্মসমূহ সমর্পণ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্মকরেন" (৫।১০,১১)। মুক্তিসাধনরূপ এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম, এবং গীতার অভিধেয়রূপ পরমার্থতত্ত্ব বাসুদেব নামক পরব্রহ্মের সম্বন্ধে বিশেষরূপে বলিয়া, এই যে বিশিষ্ট প্রয়োজন

সম্বন্ধ এবং অভিধেয়যুক্ত গীতাশাস্ত্র *, ইহার ব্যাখ্যায় যত্ন করিতেছি, যেহেতু ইহার অর্থ-পরিজ্ঞানে সমস্ত পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। ইহাতে, ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' ইত্যাদি।

সমুচ্চয়বাদ-খণ্ডন।

(প্রথমাধ্যায় হইতে দ্বিতীয়াধ্যায় ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত)।

"দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্" হইতে আরম্ভ করিয়া "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ" পর্য্যন্ত গ্রন্থাংশের ব্যাখ্যা এই যে প্রাণিদিগের সংসার দুঃখের বীজস্বরূপ শোক মোহ প্রভৃতি দোষসমূহের উদ্ভব-হেতু প্রদর্শন করা ইহার উদ্দেশ্য। যথা অর্জ্জুন রাজ্য, গুরু, পুত্র, মিত্র, সুহৃদ্, স্বজন, সম্বন্ধী এবং বান্ধব-সমূহে "আমি ইঁহাদের, ইঁহারা আমার" এরূপ ভ্রান্ত প্রত্যয়জনিত স্নেহবিচ্ছেদাদি বশতঃ আপনার শোকমোহ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বতঃই ক্ষত্রধর্ম্মরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও, শোকমোহে তাঁহার বিবেক-বিজ্ঞান অভিভূত হওয়াতে, তিনি সেই যুদ্ধ হইতে উপরত হইলেন এবং পরধর্ম্মরূপ ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। শোক মোহাদি দোষে যাহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, সেরূপ প্রাণিগণের এইরূপে স্বভাবতঃই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের সেবা ঘটিয়া থাকে। স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদের বাক্য, মন, শরীরাদির প্রবৃত্তি ফলাকাঙ্ক্ষা ও অহংকারযুক্ত হয়। এরূপ হওয়াতে, ধর্ম্মাধর্ম্ম-সঞ্চয়বশতঃ শুভাশুভ জন্ম এবং সুখ দুঃখাদি প্রাপ্তিরূপ সংসার উপরত হয় না। অতএব শোক ও মোহ সংসারের বীজ, এবং সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে শোক মোহের নিবৃত্তি হয় না,—এই উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হইয়া সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থ অর্জ্জুনকে নিমিত্ত স্বরূপ করিয়া ভগবান্ বাসুদেব বলিলেন,—"অশোচ্যান্" ইত্যাদি।

উক্ত বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, কেবল সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা

---

* কোন গ্রন্থব্যাখ্যার প্রারম্ভেই ইহার প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অভিধেয়ের বিষয় বলিতে হয়, তাই ভাষ্যকার তাহা বলিলেন। 'প্রয়োজন' অর্থ উদ্দেশ্য। 'অভিধেয়' অর্থ যাহার বিষয় গ্রন্থে বলা হইবে। 'সম্বন্ধ' অর্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত প্রতিপাদক গ্রন্থের যোগ।

দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্তি হয় না। তবে কি? না—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত কর্ম্মসহ জ্ঞানদ্বারা কৈবল্য প্রাপ্তি হয়—সমুদায় গীতাতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। ইহারা এই অভিপ্রায়ের জ্ঞাপক অর্থাৎ প্রমাণরূপে এই সকল গীতা-বচনের উল্লেখ করেন—"অথচেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি" (যদি তুমি এই ধর্ম্মসম্মত সংগ্রাম না কর, ২।৩৩), "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" (কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, ২।৪৭) "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎত্বম্" (অতএব তুমি কর্ম্মই কর, ৪।১৫) ইত্যাদি। বৈদিক কর্ম্ম হিংসাদিযুক্ত বলিয়া অধর্ম্মের হেতু—এই আশঙ্কা করাও উচিত নহে, কারণ, গুরু, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতির হিংসারূপ অত্যন্ত নিষ্ঠুর যুদ্ধও স্বধর্ম্ম, সুতরাং তাহা করাতে অধর্ম্ম নাই, তাহা না করাতে "ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি" (তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি নাশ করিয়া তুমি পাপভাগী হইবে, ২।৩৩) এই কথা বলিয়া ভগবান্ পূর্ব্বেই সুনিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন যে "যাবজ্জীবং" প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা বিহিত স্বকর্ম্ম এবং পশ্বাদি হিংসারূপ কর্ম্ম অধর্ম্ম নহে।

উপরি-উক্ত মত সত্য নহে, যেহেতু (গীতাতে সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি এই) দ্বিবিধ বুদ্ধির আশ্রিত জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার বিভাগ উক্ত হইয়াছে। "অশোচ্যান্" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থাংশদ্বারা যে পরমার্থ আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা সাংখ্য। তদ্বিষয়া বুদ্ধি,—'জন্মাদি ষড়বিক্রিয়ার অভাববশতঃ আত্মা অকর্ত্তা', এইরূপে উক্ত প্রকরণের অর্থ-নিরূপণদ্বারা যে বুদ্ধি জন্মে সেই বুদ্ধি—সাংখ্যবুদ্ধি। যে জ্ঞানিদিগের পক্ষে সে বুদ্ধি বিহিতা, তাঁহারা সাংখ্য। এই বুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বে, দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির অপেক্ষায়, (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিতে বিশ্বাস রাখিয়া) ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক যে মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান-নিরূপণ, তাহার নাম যোগ। তদ্বিষয়া বুদ্ধি যোগবুদ্ধি। তাহা যে-সকল কর্ম্মীর জন্য বিহিত, তাঁহারা যোগী। তৎপর, ভগবৎবিভক্ত বুদ্ধিদ্বয় এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" (সাংখ্য বিষয়ে এই বুদ্ধি তোমাকে বলা হইল, এখন যোগবিষয়ে এই বুদ্ধি শ্রবণ কর, ২৩৯)। এই দুয়ের মধ্যে সাংখ্যদিগের সাংখ্যবুদ্ধির আশ্রিত জ্ঞানযোগসহ

নিষ্ঠা বিভাগপূর্ব্বক "পূর্ব্বে আমি বেদরূপে বলিয়াছি" এই বচনদ্বারা বলিবেন; আর যোগবুদ্ধির আশ্রিত কর্ম্মযোগসহ নিষ্ঠাও বিভাগ-পূর্ব্বক "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" (কর্ম্মযোগসহ যোগিদিগের, ৩।৩) এই বচনদ্বারা বলিবেন। এইরূপে ভগবান্ স্বয়ং সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক নিষ্ঠাদ্বয় বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন; কারণ তিনি দেখিয়াছেন, কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব, একত্ব ও অনেকত্ব,এই দ্বিবিধ বুদ্ধির আশ্রিত জ্ঞান ও কর্ম্ম এক পুরুষের দ্বারা অবলম্বিত হওয়া অসম্ভব। এই বিভাগ-কথনের ন্যায় শতপথ ব্রাহ্মণে প্রদর্শিত হই-য়াছে—"প্রব্রাজিদিগের এই লোক পাইতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণেরা প্রব্রজ্যা করেন।" এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসের বিধানপূর্ব্বক তৎফলরূপে কথিত হইয়াছে,—"আমরা এই আত্মাকে, এই লোককে পাইয়াছি, আমরা সন্তান লইয়া কি করিব?" তাহাতে আরো বলা হইয়াছে,—"দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে পুরুষ আত্মা প্রাকৃত ছিল। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উত্তর কালে সে লোকত্রয় লাভের সাধনস্বরূপ পুত্র এবং মানবীয় ও দৈব এই দুই প্রকার বিত্ত কামনা করিল। তন্মধ্যে মানবীয় বিত্ত কর্ম্মরূপ; ইহা পিতৃলোক প্রাপ্তির সাধন। বিদ্যা দৈব বিত্ত; ইহা দেবলোক প্রাপ্তির সাধন।" শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত কর্ম্মসমূহ কেবল অবিদ্যাকামীর জন্য, ইহা দর্শিত হইয়াছে। "এই সমুদায় অতিক্রম করিয়া প্রব্রজ্যা করেন", এতদ্দ্বারা আত্মলোককামী অকামীর জন্য সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে। যদি জ্ঞান এবং শ্রুতিবিহিত কর্ম্মের সমুচ্চয় ভগবানের অভিপ্রেত হইত, তবে এই বিভাগোক্তি অপ্রমাণ হইত।

আর তাহা হইলে অর্জ্জুনের "জ্যায়সীচেৎ কর্ম্মণস্তে" (যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, ৩।১) ইত্যাদি প্রশ্ন অনর্থক হয়। যদি ভগবান্ পূর্ব্বে এই কথা না বলিয়া থাকিবেন যে জ্ঞান ও কর্ম্ম এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না, তবে "জ্যায়সীচেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ" এই বলিয়া অর্জ্জুন কেন অনর্থক,—না শুনিয়া—ভগবানের উপর কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বরূপ মত আরোপ করিবেন? আর, যদি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সকলের জন্য বলা হইয়া থাকে, তবে অবশ্য অর্জ্জুনের জন্যও তাহা উক্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু, উভয়ের উপদেশ হইয়া থাকিলে তিনি "যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্", (এই দুয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া

বল, ৩।২) এই বলিয়া কেন অন্ততরের প্রশ্ন করিলেন ? পিত্ত-দমনার্থী বৈদ্য "মধুর ও শীতল দ্রব্য ভোজন করিবে" এরূপ উপদেশ দিলে, আর "এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী পিত্ত-দমনকারী, তাহা বলুন্" এরূপ প্রশ্ন সম্ভব নহে। যদি বল অর্জ্জুন ভগবদুক্ত বচন ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা হইলে ভগবানের পক্ষে প্রশ্নানুরূপ এই উত্তর দেওয়াই উচিত হইত,—"আমি জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় বলিয়াছি, কেন তুমি এরূপ ভ্রম করিতেছ ?—পরন্তু"আমি পূর্ব্বে দুটী নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি, (৩।৩)" এরূপ উত্তর দেওয়া উচিত হইত না—প্রশ্নের অসদৃশ ও বিরুদ্ধই হইত। আর,স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় অভিপ্রেত হইলে সমুদয় বিভাগোক্তি অনর্থক হইয়া যায়। আরও, যিনি জানেন যে যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্মৃতি-বিহিত কর্ম্ম, তাঁহার পক্ষে "তবে কেন আমাকে ঘোর কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ ?" (৩।১) এরূপ আপত্তিও যুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব গীতাশাস্ত্রে জ্ঞান এবং শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত কর্ম্মের ঈষন্মাত্রও সমুচ্চয় কেহ দেখাইতে পারিবেন না।

পরন্তু, অজ্ঞানবশতঃ বা বিষয়াসক্তি প্রভৃতি বশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া যজ্ঞ, দান বা তপস্যাদ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, ও পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে এই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে যে একমাত্র ব্রহ্মই এই সমস্ত, এবং তিনি অকর্ত্তা, তাঁহার কর্ম্ম ও কর্ম্ম-প্রয়োজন নিবৃত্ত হইলেও তিনি জগৎরক্ষার্থ যত্নপূর্ব্বক যথাপ্রবৃত্তি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহার এই দৃশ্যমান প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে সেরূপ কর্ম্ম নহে যাহার সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হইতে পারে। যেমন, ভগবান্ বাসুদেবের অনুষ্ঠিত ক্ষত্রধর্ম্ম পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য জ্ঞানের সহিত সমুচ্চিত হয় নাই। সেরূপ জ্ঞানিদিগের কর্ম্ম সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য, কারণ ফলাকাঙ্ক্ষা ও অহংকারের অভাব বিষয়ে তাঁহাদের কর্ম্ম ভগবানের কর্ম্মের তুল্য। তত্ত্ববিৎ মনে করেন, "আমি করি না" এবং তিনি কর্ম্মফলও আকাঙ্ক্ষা করেন না। আর, স্বর্গাদি লাভাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মরূপ অনুষ্ঠানের জন্য অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক সকামভাবে কাম্য অগ্নিহোত্রাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া যদি কামনা বিনষ্ট হইলেও সেই অগ্নিহোত্রাদিরই অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তবে সেই অগ্নিহোত্রাদিকে যেমন কাম্য বলা যায় না তেমনি ভগবান্‌ও "কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে (কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন

না, ৫।৭) এই বচনে এই কথা দেখাইতেছেন। এই বিষয়ে "পূর্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং" (যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বতর মহাত্মাগণকর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে,৪।১৫), "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" (জনকাদি কর্ম্মদ্বারাই সংসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ৩।২০) প্রভৃতি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বিভাগ করিয়া বুঝিতে হইবে। কিরূপে?—যদি বল জনক প্রভৃতি প্রাচীনগণ তত্ত্ববিৎ হইয়াও "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" (গুণসমূহ গুণসমূহে থাকে, ৩।২৮) এইভাবে জগৎরক্ষার জন্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তবে বলিতে হইবে তাঁহারা জ্ঞানদ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অবস্থা উপস্থিত হইলেও কর্ম্মসহই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কর্ম্মসন্ন্যাস করেন নাই,—ইহাই অর্থ। যদি বল যে তাঁহারা তত্ত্ববিৎ ছিলেন না, তবে উক্ত বচনের এই ব্যাখ্যা হইবে যে জনক প্রভৃতি ঈশ্বরে সমর্পিত কর্ম্মরূপ সাধনদ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি বা জ্ঞানোৎপত্তিরূপ সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। "অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন"—ইত্যাকার বাক্যে ভগবান্ এই বিষয়ই বলিবেন। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (মানব নিজ কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে, ১৮।৪৬) এই বলিয়া "সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম" (সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপে ব্রহ্ম লাভ করেন, ১৮।৫০) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পুনর্ব্বার সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞাননিষ্ঠার কথা বলিবেন। অতএব, কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, কর্ম্ম-সমুচ্চিত জ্ঞানদ্বারা নহে,—এই সত্যই গীতা-বচনসমূহে নিশ্চিতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাই যে গীতার মর্ম্ম, তাহা আমরা প্রকরণানুসারে বিভাগপূর্ব্বক সেই সেই স্থানে দেখাইব।

ইহাতে (অর্থাৎ আখ্যায়িকায়), এইরূপে ধর্ম্মবিষয়ে বিমূঢ়চিত্ত, মিথ্যাজ্ঞানবান্ এবং মহা মোহসাগরে নিমগ্ন অর্জ্জুনের আত্মজ্ঞান ব্যতীত উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া, ভগবান্ বাসুদেব সেই অর্জ্জুনকে মোহসাগর হইতে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে "অশোচ্যান্" ইত্যাদি বচনসহ আরম্ভ করিলেন। "অশোচ্যাঃ", অর্থ যাঁহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, অর্থাৎ ভীষ্মদ্রোণাদি; কেননা তাঁহারা সদাচারী এবং পরমার্থ ভাবে নিত্য। সেই অশোচ্যদিগের জন্য তুমি "অন্বশোচঃ" অনুশোচনা করিতেছ। তাঁহারা আমার নিমিত্তে মরিয়া যাইবেন, আমি তদ্বিহীন হইয়া রাজ্যসুখাদি-

দ্বারা কি করিব ?—তুমি এরূপ প্রজ্ঞাবানের উচিত, বুদ্ধিমানের উচিত, ‘প্রজ্ঞাবাদ’ অর্থাৎ বাক্যও বলিতেছ। অভিপ্রায় এই যে তুমি এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় আপনাতে পাণ্ডিত্যবিরুদ্ধ মূঢ়তা দেখাইতেছ, কারণ, ‘গতাসূন্’ অর্থাৎ গতপ্রাণ, মৃত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে, এবং ‘অগতাসূন্’ অর্থাৎ অগতপ্রাণ, জীবিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ‘পণ্ডিতাঃ’ অর্থাৎ আত্মজ্ঞগণ অনুশোচনা করেন না। ‘পণ্ডা’ অর্থাৎ আত্মবিষয়া বুদ্ধি যাঁহাদের আছে তাঁহারাই পণ্ডিত, কারণ শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যকে) বলিয়াছেন—“পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া (বালকের ন্যায় থাকিবে)” ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে পরমার্থতঃ নিত্য, এবং অশোচ্য ব্যক্তিদিগের জন্য তুমি শোক করিতেছ, অতএব তুমি মূঢ়।

১২শ শ্লোক। তাঁহারা কেন অশোচ্য ? যেহেতু তাঁহারা নিত্য। কিরূপে ? না—‘জাতু’ অর্থাৎ কদাচিৎ আমি যে ছিলাম না, তাহা নহে, কিন্তু ছিলামই। অভিপ্রায় এই যে ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশাদি হইয়া গেলেও যেমন আকাশ থাকে, তেমনি দেহের উৎপত্তি বিনাশাদি হইয়া গেলেও নিত্যই আমি থাকি। তেমনি, তুমি যে ছিলে না, তাহা নহে; কিন্তু ছিলেই। তেমনি, এই রাজগণ যে ছিলেন না, তাহা নহে; কিন্তু ছিলেনই। তেমনি, আমরা সকলে যে ‘অতঃপরম্’ অর্থাৎ এই দেহ বিনাশের পরবর্ত্তী কালে, হইব না, তাহা নহে; কিন্তু হইবই। অর্থাৎ আমরা আত্মস্বরূপে তিন কালেই নিত্য। দেহ-ভেদানুসারেই বহুবচন প্রয়োগ হইল, আত্ম-ভেদাভিপ্রায়ে নহে। (ক্রমশঃ)

ওঁ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

দ্বিতীয় ভাগ। চতুর্থ সংখ্যা।

ব্রহ্মতত্ত্ব।

১। জর্ম্মণ্ ঋষি ফিক্টে।

যোহন্ গটলিয়েব্ ফিক্টে এক জন অতি প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় দার্শনিক। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে, জর্ম্মণ্ দেশে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সমগ্র জীবন অধ্যাপনা ও সাহিত্য-চর্চ্চায় যাপন করেন। তদীয় চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ও উৎসাহময় ছিল। দেশীয় সর্ব্ব সাধারণের নিকট তিনি দার্শনিক অপেক্ষা দেশহিতৈষী বক্তা বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার দর্শন কেবল অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক জ্ঞানীরই বোধগম্য। ১৮১৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "বিসেন্ চাফ্‌লিয়ার" (জ্ঞানতত্ত্ব)। ফিক্টের দার্শনিক মত বুঝিতে গেলে পূর্ব্বে মহাজ্ঞানী কাণ্টের মতের কিছু আভাস পাওয়া আবশ্যক। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে তাহাই দিতেছি।

কাণ্টের মতে, দার্শনিক সত্যে উপনীত হইতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান-ক্রিয়ার পরীক্ষা করা আবশ্যক। সমুদয় সত্যই যখন জ্ঞানের বিষয়, তখন জ্ঞানের প্রকৃতি কি, প্রণালী কি, জ্ঞানে কি কি বস্তু অবশ্যম্ভাবিরূপে অন্ত-র্নিবিষ্ট, এই সকল বিষয় নির্দ্ধারিত না হইলে সত্য সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। কাণ্ট্ জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন, জ্ঞানের দুটি দিক্,—উপকরণ ও প্রকরণ। এই দুই দিকের সম্মিলন ব্যতীত

জ্ঞান সম্ভব নহে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়যোগে আনীত অগঠিত বিজ্ঞানসমূহ—মানস-বিকারসমূহ—জ্ঞানের উপকরণ। আর, যে সমস্ত মূলতত্ত্বদ্বারা এই সমস্ত গঠিত হইয়া প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানের বিষয়রূপে পরিণত হয়, সে সমস্ত মূলতত্ত্বই জ্ঞানের প্রকরণ। মূলতত্ত্ব সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-ঘটিত মূলতত্ত্ব,—দেশ ও কাল; (২) বুদ্ধিঘটিত মূলতত্ত্ব, যথা (ক) একত্ব, (খ) বহুত্ব, (গ) সমষ্টি, (ঘ) সীমা, (ঙ) অনস্তিত্ব, (চ) অস্তিত্ব, (ছ) বস্তুত্ব ও গুণ, (জ) কারণ ও কার্য্য, (ঝ) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, (ঞ), সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা, (ট) সত্তা ও অসত্তা, (ঠ) অবশ্যম্ভাবিতা ও আগন্তুকত্ব; (৩) প্রজ্ঞা-ঘটিত মূলতত্ত্ব—(ক) আত্মা, (খ) জগৎ, (গ) ঈশ্বর। কাণ্ট্ দেখাইলেন যে জ্ঞানের এই সমস্ত প্রকরণ অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফল নহে, অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের মূল। জ্ঞানক্রিয়ার মূলে যে এই সমস্ত তত্ত্ব প্রকরণরূপে নিহিত রহিয়াছে, বিশ্লেষণদ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। কাণ্ট্ ইহাও দেখাইলেন যে জ্ঞানের গভীরতম তত্ত্ব আত্মজ্ঞান। মূলতত্ত্বসমূহ আত্মজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। এই পর্য্যন্ত কাণ্টের ভাবাত্মক কার্য্য,—গঠন কার্য্য। এই ভিত্তির উপর অদ্বৈত ব্রহ্মবাদরূপ দর্শনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। কিন্তু কাণ্ট্ তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন না। কেন করিলেন না, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত মত গুলি দেখিলে বুঝা যাইবে।

১। বুদ্ধির কেবল গঠনশক্তি আছে, উৎপাদন শক্তি নাই। উৎপাদনকারিণী বুদ্ধি যে থাকিতে পারে না, তাহা নহে। ঐশী বুদ্ধি সেইরূপই হইবে, কিন্তু মানব বুদ্ধির উৎপাদনকারিণী শক্তি নাই। বাহির হইতে উপকরণ না পাইলে ইহা জ্ঞানের বিষয় গড়িতে পারে না। সুতরাং উপকরণ উৎপাদনের একটী আত্মাতিরিক্ত কারণ আছে। সেই কারণের প্রকৃতি আমরা জানি না, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব মানা আবশ্যক। কার্য্য জ্ঞানের ভিতরে—কেন না সেই সমস্ত মানস ব্যাপার মাত্র,—অথচ কারণ বাহিরে; এই মত যে কাণ্টের একটী মূলসূত্র-বিরোধী তাহা তিনি দেখিলেন না। কাণ্ট্ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে বুদ্ধির মূলতত্ত্বসমূহ কেবল জ্ঞানের অভ্যন্তরস্থ বিষয়েই প্রযোজ্য, জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়ে অপ্রযোজ্য; অথচ তিনি বুদ্ধিঘটিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ মানস ব্যাপার ও একটী অনির্দ্দিষ্ট অজ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে স্থাপন করিতেছে

প্রয়াস পাইলেন। যাহা হউক, এই এক দিকে কাণ্ট্ একটী অনাত্ম বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নিজ দর্শনতন্ত্রে অদ্বৈতবাদের প্রবেশকে বাধা দিয়াছিলেন।

২। বুদ্ধিঘটিত মূলতত্ত্বসমূহ বাহির হইতে উপকরণ পাওয়াতে জ্ঞানের বিষয় গঠনে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু প্রজ্ঞাঘটিত মূলতত্ত্বসমূহ কোন প্রকৃত বস্তুর পরিচায়ক নহে, কেবল জ্ঞানের নিয়ামক মূলসূত্র মাত্র। জ্ঞানক্রিয়ায় পূর্ণতার পক্ষে এই সকল মূলসূত্র ব্যবহার করা আবশ্যক, সন্দেহ নাই। আমরা চিন্তা করিতে যাইয়া অবশ্যম্ভাবিরূপেই চিন্তা করি যে সমুদয় মানস ব্যাপারের একটী স্থায়ী আধার আছে, সে আধার আত্মা; সমুদয় বাহ্য অর্থাৎ দেশগত বিষয়ের একটী স্থায়ী আধার আছে; সে আধার জগৎ। এবং অন্তর বাহির সমুদয় ব্যাপারের একটী সাধারণ আধার ও ঐক্যস্থল আছে, তাহা পরমাত্মা। কিন্তু এই সকল ধারণার বিষয়ীভূত প্রকৃত বস্তু আছে কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার আমাদের কোন উপায় নাই। বিশুদ্ধ, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের ভূমির উপর দাঁড়াইয়া এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা অসম্ভব। তবে নৈতিক ব্যাবহারিক জ্ঞানে এই সকল বস্তুর এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই আর একটী দিক্, যে দিক্ দিয়া কাণ্টের দর্শনে কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ নহে, সাধারণ ঈশ্বরবাদও বাধাপ্রাপ্ত হইল। আত্মজ্ঞান সমুদয় জ্ঞানের মূল, এই সত্য উচ্চারণ করিয়াও তিনি ইহার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, আত্মজ্ঞান তাঁহাকে এক সর্ব্বাধার আত্মার পরিচয় দিল না।

৩। কাণ্ট্ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে যাহা পাইলেন না, নৈতিক ব্যাবহারিক জ্ঞানের উপর তাহাই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন। সম্পূর্ণরূপে ফলাফলভাবনাশূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, এই ব্যাবহারিক মূলসূত্রকে কাণ্ট্ একটী অনতিক্রমণীয় মূলতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিলেন, আর দেখিলেন এই মূল সূত্রানুসারে কার্য্য করিতে হইলে, কর্ম্মকর্ত্তারূপী স্বাধীন আত্মা, কর্ম্মক্ষেত্ররূপ জগৎ এবং কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর, এমন কি পুণ্য ও সুখের পূর্ণ মিলনস্থল পরলোকও স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সুতরাং প্রজ্ঞাঘটিত মূলতত্ত্বসমূহ কাণ্ট্ দর্শনে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও নীতি-

ঘটিত ব্যাবহারিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। যাহা হউক, এখন আমরা ফিক্টের দার্শনিক মত সম্বন্ধে বলিব।

কাণ্টের প্রতিবাদ। ফিক্টে প্রথমেই কাণ্টের কল্পিত বাহ্যবস্তু-বাদের—অনাত্মবস্তুবাদের—প্রতিবাদ করিলেন। জ্ঞান কেবল জ্ঞানের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধেই বলিতে পারে, জ্ঞানের বাহিরের বস্তু সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। তাহা যে আছে, তাহাও বলিতে পারে না। জ্ঞানের অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা বিজ্ঞান মাত্র, তাহা জড়পদার্থ নহে। আর জড়-পদার্থ বিজ্ঞান উৎপাদন করিবে, ইহাও অসম্ভব। কাণ্ট্ অনাত্ম বস্তুর উপর যে কার্য্য আরোপ করিয়াছেন, তাহা আত্মারই কার্য্য। আত্মা মৌলিক নিরপেক্ষ বস্তু। কাণ্ট্ যে ইহাকে আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয় সুতরাং পর-সাপেক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহা সম্পূর্ণরূপেই ক্রিয়াশীল, এবং বিজ্ঞানোৎপাদনে সক্ষম। জ্ঞানের উপকরণের জন্য ইহাকে পরাপেক্ষী হইতে হয় না। জ্ঞানের উপকরণ ও প্রকরণ উভয়ই আত্মার কার্য্যকারিতার ফল। এই সর্ব্বাত্মার সর্ব্বকারণ আত্মা কোন সসীম ব্যক্তিগত বস্তু নহে। আত্মা বলিতে ফিক্টে পরমাত্মাই বুঝেন।

জ্ঞানের মৌলিক প্রণালী। মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়া ফিক্টে সমুদায় জ্ঞানের মূল প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। এই প্রণালী পূর্ব্ব-প্রচলিত বিশ্লেষণ ও একীকরণের মিলন। ফিক্টে, দেখাইলেন এই প্রণা-লীতেই সমস্ত জ্ঞান বিকাশিত হয়। এই প্রণালীতে জ্ঞানের সমস্ত মূলতত্ত্ব একটী আদিম তত্ত্ব হইতে নিষ্কাশিত করা যায়। এই প্রণালীর নাম—স্থাপন, খণ্ডন ও সমঞ্জসীকরণ। ক=ক, এই হইল স্থাপন। "ক" যাহাই হউক না কেন, বস্তু যাহাই হউক না কেন, সেই বস্তু যে সেই বস্তুই, ইহা সমুদয় জ্ঞানের মূলতত্ত্ব। এই তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণাতীত, সমুদায় প্রমাণের ভিত্তি। যাহা "অ-ক", তাহা "ক" নহে, এই হইল খণ্ডন। "ক" যাহাই হউক,—বস্তু যাহাই হউক,—ইহা যে ইহার বিপরীত বস্তু নহে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ মূলতত্ত্ব। এখন দ্রষ্টব্য এই যে "ক" এবং "অ-ক" পরস্পর বিপরীত বটে, কিন্তু "ক" ব্যতীত "অ-ক" অভাবনীয়, এবং "অ-ক" ব্যতীত "ক" অভাবনীয়। উভয়েই এক অখণ্ড জ্ঞানব্যাপারের অন্তর্গত হওয়াতে পরস্পরের সম্পূর্ণ

পার্থক্য অসম্ভব। ইহাদের বৈপরীত্যের মধ্যেও একত্ব আছে, সুতরাং উপরি-উক্ত দুই মূলতত্ত্ব হইতে অবশ্যম্ভাবিরূপে এই মূলতত্ত্ব নিষ্কাশিত হইতেছে যে ক=অ-ক, অথবা অ-ক=ক। ক আর অ-ক যে সর্ব্বাংশে এক, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে যখন বৈপরীত্য রহিয়াছে, তখন সর্ব্বাঙ্গীন একত্ব অসম্ভব। কিন্তু আংশিক একত্ব আছে, ইহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং তৃতীয় মূলতত্ত্বের প্রকৃত আকৃতি এইরূপ—ক=কিয়দংশে অ-ক, বা অ-ক=কিয়দংশে ক। ইহার নাম সমঞ্জসীকরণ। এই মূলতত্ত্বের অর্থ এই যে বস্তু যাহাই হউক না কেন, ইহার বিপরীতের সহিত ইহার ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে।

অদ্বৈত মত স্থাপন। এখন দেখা যাক্ এই প্রণালীতে কিরূপে অদ্বৈত মত স্থাপিত হয়, এবং সেই অদ্বৈত মত কিরূপ। আত্মা নিজ ক্রিয়াশীলতার দ্বারা নিজ অস্তিত্ব স্থাপন করে, নিজ অস্তিত্ব অবগত হয়। আত্মা বলে, "আমি আছি," "আমি=আমি"। কিন্তু আত্মা আপনাকে আপনি জানিতে যাইয়া অবশ্যম্ভাবিরূপেই অনাত্মাকে ভাবে,—অনাত্মা হইতে আপনাকে ভিন্ন করে। "আমি=আমি" এই স্থাপন হইতে "আমি=আমি-না" অর্থাৎ "আত্মা=অনাত্মা" এই খণ্ডন আসে। কিন্তু এই অনাত্মা আত্মার জ্ঞানান্তর্গত বিষয়, আত্মার চিন্তা, আত্মার স্বাভাবিক কার্য্যকারিতার ফল-ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাঁহারা ইহাকে মানস ব্যাপারের বাহ্য কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারাও প্রকৃত পক্ষে ইহাকে জ্ঞানের অন্তর্গত, চিন্তার অন্তর্গত, বলিয়াই ভাবেন; কারণ, জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুই ভাবা যায় না। সুতরাং উক্ত খণ্ডনক্রিয়া নিরপেক্ষ খণ্ডনক্রিয়া নহে, আপেক্ষিক খণ্ডন মাত্র। আত্মা অনাত্মার ভেদ নিরপেক্ষ নহে, আপেক্ষিক মাত্র। অতএব স্থাপন ও খণ্ডনের সমঞ্জসীকরণে পাওয়া যাইতেছে—আত্মা=অনাত্মা এবং অনাত্মা=আত্মা, অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মা দুটী বস্তু নহে, ভেদাভেদযুক্ত একই বস্তু। আত্মার নিজ শক্তিতেই অনাত্মার উৎপত্তি হয়। আত্মা যে অনাত্মাদ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, এই আপাত সীমা ও নিষ্ক্রিয় ভাব আত্মা নিজ কার্য্যকারিতা দ্বারাই উৎপাদন করে। ইহার নিষ্ক্রিয় ভাব নিজ শক্তির খর্ব্বীকরণ মাত্র। এইরূপে ফিক্টে দেখাইলেন যে, যে বিষয়-জগৎকে আপাততঃ আত্মাতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়, যদ্দারা আত্মা সীমাবদ্ধ, খণ্ডীকৃত বলিয়া বোধ

হয়, সেই জগৎ আত্ম-শক্তির কার্য্য মাত্র। আত্মা ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করিতে যাইয়াই আপাততঃ বিষয়-বিষয়িভেদে ভিন্ন হন,—সসীমরূপে প্রতীয়মান হন; প্রকৃতপক্ষে তিনি সসীম নহেন, ভিন্ন নহেন, ব্যক্তিগত নহেন; তিনি অসীম, অখণ্ড, অদ্বিতীয়। কিন্তু ফিক্টের মতে এই অসীম আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহেন। জ্ঞান কেবল বিষয়-বিষয়ী ভেদের অবস্থায়ই উৎপন্ন হয়, জ্ঞান সসীম ব্যাপার। সুতরাং ফিক্টের অনন্ত আত্মা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরপদবাচ্য নহেন, তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যের নিয়ন্তা বা সজ্ঞান উপাসনার বিষয় নহেন। ফিক্টের উপর নাস্তিকতা দোষ আরোপিত হইলে তিনি সে দোষ অস্বীকার করেন, এবং জগতে যে একটী ধর্ম্মশাসন বর্ত্তমান, সেই ধর্ম্মশাসনকেই ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করেন। যাহা হউক ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার মত জীবনের শেষ ভাগে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা যথাস্থানে সেই পরিবর্ত্তন উল্লেখ করিব।

নৈতিক জীবনের আদর্শ। অনাত্মাদ্বারা আত্মশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে একটি সংগ্রাম উপস্থিত হয়। আত্মা অনাত্ম-প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে চায়, অনাত্ম-প্রভাবকে বিনাশ করিয়া, অনাত্মার অস্তিত্বকে কার্য্যতঃ বিলুপ্ত করিয়া, নিজ একাধিপত্য স্থাপন করিতে চায়। আত্মার অজ্ঞান সজ্ঞান সকল প্রবৃত্তিই এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত, আত্মা অনাত্মার দ্বৈত ভাব বিনাশ করিতে উদ্‌যোগী, কিন্তু সজ্ঞান প্রবৃত্তিকেই প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বলা যায়। আত্ম-প্রভাব বিস্তার—প্রকৃত স্বাধীন ভাব প্রাপ্তি—এই উচ্চ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কর্ত্তব্যবোধে যাহা করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। কর্ত্তব্যজ্ঞান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকে ফিক্টে নানা প্রকারে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন এবং নিজ জীবনে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, তিনি বলিয়াছেন, অনন্তের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা—ইহাই আমাদের সমুদয় কার্য্যের লক্ষ্য, কিন্তু পূর্ণরূপে সেই মুক্ত-ভাব লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা কোন কালেই তাহা পূর্ণ-রূপে লাভ করিতে পারিব না। তবে, যে পরিমাণে আমরা সেই মুক্ত ভাব লাভ করি, তাহাই আমাদের মঙ্গল। সুতরাং ক্রমশঃ মুক্তাবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া, অনন্তকে ক্রমশঃই অধিকতররূপে নিজ জীবনে প্রকাশিত হইতে দেওয়া, ক্রমশঃই অনন্তের সহিত গভীরতর একতায় একীভূত হওয়া—

ইহাই আমাদের দৈনন্দিন প্রয়াসের বিষয় হওয়া উচিত। ইহাই জীবনের পরম লক্ষ্য ও পরমানন্দের নিদান।

আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। জীবনের শেষ ভাগে ফিক্টে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনের দিকে আকৃষ্ট হন। তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মমত খৃষ্টীয় অদ্বৈতবাদের রূপ ধারণ করে। পূর্ব্ব জীবনের কঠোর নৈতিক উৎসাহ কোমল প্রেম ভক্তিতে পরিণত হয়। তিনি বলিলেন, যিশুখৃষ্টে যেমন ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি যে কেহ ঈশ্বরের সহিত একত্বানুভব করে, অন্তরস্থ দৈবাদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করে, তাহাতেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হন,—মানবশরীরী হইয়া প্রকাশিত হন। যে আপন ব্যক্তিগত প্রভাব প্রকাশে প্রয়াসী, সে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঈশ্বরপ্রাপ্তির পক্ষে মানবত্বের বিনাশ আবশুক। যাঁহার অহঙ্কার সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, তিনি অদ্বিতীয় সর্ব্বেসর্ব্বা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। ঈশ্বর তাঁহার প্রাণরূপী হন, এবং তাঁহার সমুদয় কার্য্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হন। তিনি অজ্ঞান-মুক্ত হইয়া, বন্ধনমুক্ত হইয়া, ঈশ্বরের সহিত এক হন ও অমর জীবন লাভ করেন। "পবিত্র জীবনের পথ" নামক পুস্তকে ফিক্টে তদীয় শেষ জীবনের ধর্ম্ম-মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তক এতদ্দেশীয় আধুনিক চিন্তাকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইদানী-ন্তন ধর্ম্মাচার্য্যদিগের গ্রন্থাদিতে ইহার কতিপয় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ফিক্টের কৃত "মানবের গম্যস্থান" নামক গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে নিম্নলিখিত স্থলটী ভাষান্তরিত হইল। ইহাতে তাঁহার অমরত্বে বিশ্বাস স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইয়াছে;—"নিজের পক্ষে আমার মরণ নাই, যাহারা পশ্চাতে থাকিবে, তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, তাহাদের পক্ষেই আমার মৃত্যু হইবে। আমার পক্ষে যে মুহূর্ত্তে মরণ, সেই মুহূর্ত্তেই নব ও উচ্চতর রাজ্যে জন্ম হইবে। আমার হৃদয় হইতে একবার পার্থিব ইচ্ছা দূর হউক, তাহা হইলেই জগৎ আমার সম্মুখে মহিমান্বিত আকারে উপ-স্থিত হইবে। আকাশ-ব্যাপ্ত স্থূল নির্জ্জীব জড়রাশি অদৃশ্য হইল; উহার স্থলে অনন্ত আধার হইতে উজ্জ্বল, অক্ষয় প্রাণ ও শক্তি-স্রোত প্রবা-হিত হইতেছে। হে সর্ব্বশক্তিমন্ পিতঃ! সমুদয় প্রাণই তোমার

প্রাপ। কেবল আধ্যাত্মিক চক্ষুই সত্য ও সৌন্দর্য্যের রাজ্য দর্শন করিতে পারে।"

২। রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত 'বেদান্ত-গ্রন্থ'।

অর্থাৎ বেদান্তসূত্র-ভাষ্য।

মূল বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম ও বেদ সম্বন্ধে রাজা যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। রাজা তাঁহার শিষ্য বাবু চন্দ্রশেখর দেবের নিকট বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চন্দ্রশেখর বাবু তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় ইংরেজী ভাষায় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। উহা হইতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার মত স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

"The Hindus seem to have made greater progress in sacred learning than the Jews, at least at the time when the *Upanishads* were written. 'The Self-existing alone was living, and he willed, the world came into existence" seems to me to give a more sublime idea of the creation than the words of the first chapter of the Bible, 'God said, let there be light &c.' There appears a degree of childishness in this latter representation.

"If religion consists in the blessing of self-knowledge and of improved notions of God and His attributes, and a system of morality hold a subordinate place, I certainly prefer the Vedas. But the moral precepts of Jesus are something most extraordinary. The Vedas contain the same lessons of morality, but in a scattered form, and Hinduism is a religion of toleration and peace which Christ indeed also taught his apostles and disciples, but which his followers soon forgot. It is a pity

that the ministers of religion should foment quarrels amongst the several nations of the world. In religious discussions we should always respect the ideas and feelings of our antagonists. The Vedas teach the only religion which considers toleration to be a duty of man".

অর্থাৎ—ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে হিন্দুজাতি, যে সময়ে উপনিষদ্‌সমূহ লিখিত হইয়াছিল, অন্ততঃ সেই সময়ে, য়িহুদি জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এরূপ প্রতীতি হয়। "ঈশ্বর বলিলেন, 'আলোক প্রকাশিত হউক', আর অমনি আলোক প্রকাশিত হইল" বাইবেলের প্রথম অধ্যায়োক্ত এই কথাগুলি অপেক্ষা "একমাত্র স্বয়ম্ভু সনাতন পরব্রহ্মই ছিলেন, এবং তাঁহার ইচ্ছা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে" এই মতে (১) সৃষ্টি সম্বন্ধে অধিকতর উচ্চ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাইবেলের উল্লিখিত বর্ণনাতে কতক পরিমাণে বালকত্ব প্রকাশ পায়। আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্ম ও তাঁহার স্বরূপ বিষয়ক উন্নতজ্ঞান যদি ধর্ম্মের ভিত্তি ভূমি হয়, এবং নীতি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান অধিকার করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বেদকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিই। কিন্তু খৃষ্টের নীতি উপদেশ সকল অতি অসাধারণ। ঠিক এই সকল নীতি উপদেশ বেদেও আছে, কিন্তু তথায় উহা বিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম শান্তি ও উদারতার ধর্ম্ম, এই শান্তি এবং উদারতা খৃষ্টও তাঁহার শিষ্য এবং প্রচারকবর্গকে শিক্ষা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ অল্পকাল মধ্যেই উহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচারকগণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্ম্মবিদ্বেষ উদ্দীপন করেন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মত ও বিশ্বাসের প্রতি আমাদের সর্ব্বদাই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। পর-ধর্ম্মে উদারতা প্রদর্শন মানবের কর্ত্তব্য—একমাত্র বেদই এই শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে রাজা রামমোহন রায় সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ও ব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্ব বিষয়ে উপনিষদ্‌কে

(১) ইহাই বেদান্তের মত।

অতি উচ্চ আসন প্রদান করিতেছেন, এবং এই সকল বিষয়ে তিনি বেদকে বাইবেল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। আর যে ধর্ম্ম বিষয়ক উদারতাকে তিনি আদর্শস্থানীয় মনে করেন, তাহার উপদেশ একমাত্র বেদেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিতেছেন। সুতরাং প্রধানতঃ এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্যই যে তিনি বেদান্ত গ্রন্থ ও উপনিষদ্ সমূহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

নিম্নে রাজার আরও কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। এই সকল উক্তি হইতে হিন্দুধর্ম্মের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ এবং তাঁহার হিন্দুশাস্ত্র সকল প্রকাশের উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে;—

(ক) শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচারে রাজা বলিয়াছিলেন, "আমি নূতন কোন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি না। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে যে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ আছে এবং তাহাই যে মুক্তির একমাত্র কারণ, শাস্ত্রাবলম্বন করিয়া তাহাই প্রচার করিতেছি।"

(খ) স্বলিখিত জীবন-চরিতে তিনি বলিয়াছেন, "ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচারে আমি কখনও হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। হিন্দুধর্ম্ম নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, আমি তাহাকেই আক্রমণ করিয়াছি।" (মূল— "The ground which I took in all my controversies was not that of opposition to Brahmanism, but to a perversion of it.

—Rammohan Ray's Autobiography.)

(গ) জনৈক ইংরেজ-লিখিত ডফ্ সাহেবের জীবনচরিত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, একদা রাজা ডফ্ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে লুথার যাহা করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি তাহাই করিতে চাই, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করাই আমার উদ্দেশ্য।" উপনিষদ্ ও বেদান্ত-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনার গুরুত্ব রাজার এই সকল উক্তি হইতে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে রাজার প্রকাশিত বেদান্তগ্রন্থ অর্থাৎ বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বেদ প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞান-

ভাণ্ডার। অতি প্রাচীন কাল হইতে বহু বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতীয় ঋষিগণ প্রকৃতির নিকট হইতে যে সকল শিক্ষা পাইয়া আসিতেছিলেন তাহা উহাতে সঞ্চিত রহিয়াছে। উহা কোন এক ব্যক্তির বা এক সময়ের লিখিত গ্রন্থ নহে। মানবপ্রকৃতি-নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব কিরূপে ক্রমশঃ ফুটিয়া অতি উন্নত অবস্থা লাভ করে, বেদ তাহার এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস। যে ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া ঋষিগণ প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সময়ে অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি স্থূল জড় পদার্থ গুলিকেই অন্তরালস্থ পরম,দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন, ক্রমবিকাশের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুসারে সেই ধর্ম্মভাবই উত্ত-রোত্তর বিকাশমান হইয়া উন্নত ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল। সেই জন্ম বেদের প্রথম ভাগে প্রকৃতির পূজা ও শেষ ভাগে ব্রহ্মোপাসনা। এই শেষ অর্থাৎ অন্তভাগের নাম বেদান্ত অথবা উপনিষৎ। এই উপনিষদুক্ত শ্রুতি সকলের মধ্যে স্থানে স্থানে আপাত-বিরোধ লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল পরস্পর আপাত-বিরুদ্ধ শ্রুতি সকলের সমন্বয় এবং ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনের বিরুদ্ধ মত সকলের খণ্ডন করিয়া একমাত্র সদ্রূপ পরব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য এবং তাঁহার উপাসনাতেই মানবের পরম পুরুষার্থ, ইহা প্রদর্শনের জন্ম মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা অন্য কোন আচার্য্য প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫৮টী অতি সংক্ষিপ্ত সূত্র রচনা করিয়া যান। এই সকল সূত্রের নাম বেদান্ত-সূত্র। মহর্ষি বেদব্যাসের বহু কাল পরে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ও পূজ্যপাদ রামানুজ প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ এই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য জ্ঞাপন উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই সমধিক প্রসিদ্ধ ও মান্য। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে বঙ্গ ভাষায় "বেদান্ত গ্রন্থ" নামে এই সকল বেদান্ত-সূত্রের এক ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্রের অন্য নাম 'ব্রহ্মসূত্র', 'বেদান্ত দর্শন', 'শারীরক মীমাংসা', 'শারীরক সূত্র' ইত্যাদি। রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত 'বেদান্ত গ্রন্থ' অথবা বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য তিন অংশে বিভক্ত,—ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও মূল গ্রন্থ। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় রাজা যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে

প্রদত্ত হইল *—"সংস্কৃত শব্দ সকল প্রায়শঃ বিশেষ বিশেষ ধাতু ও প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই সকল ধাতু ও প্রত্যয় অনেকার্থ-বাচক। সেইজন্য ব্যুৎপত্তি-বলে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', 'ভূমা' প্রভৃতি বেদের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাচক শব্দগুলি কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে বুঝায়, এরূপ প্রতিপন্ন করা কোন ক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ এইরূপে ব্যুৎপত্তি-বলে সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্যান্তর্গত 'রাম', 'দুর্গা', 'কালী', 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি শব্দেরও অনেক প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ করিলে ঐ সকল কাব্য এবং শাস্ত্রের অর্থের কোন প্রকার স্থিরতা থাকে না। অধিকন্তু রূপগুণ-বিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যই যদি বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন, তাহা হইলে উহার কোন স্থানে সেই দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নাম কিম্বা রূপের বর্ণনা অবশ্যই থাকিত। কিন্তু বেদান্তের ৫৫৮টী সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের উল্লেখ দেখা যায় না। যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণ-বিশিষ্ট দেবতা এবং মনুষ্যকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, অতএব তাহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য; ইহার উত্তর এই যে, বেদের এরূপ বর্ণনাদ্বারা ঐ সকল দেবতা এবং মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ বেদে যেমন কোন কোন দেবতা এবং মনুষ্যের ব্রহ্মরূপে বর্ণনা দেখা যায়, সেইরূপ আকাশ, মন এবং অণু প্রভৃতিরও ব্রহ্মত্ব কথিত হইয়াছে। এই সকলকে ব্রহ্ম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম সর্ব্বময়, তাঁহার অধ্যাস (১) করিয়া আর সকলকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, পৃথক পৃথক বস্তুকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা বেদের তাৎপর্য্য নহে। বেদ আপনিও অনেক স্থানে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তথাপি কি বিবেচনায় লোকে পশু, পক্ষী, মৃত্তিকা, পাষাণ প্রভৃতিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া থাকেন বুঝা যায় না। এরূপ কল্পনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিবন্ধন স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের

---

* লেখক রাজার তৎকালীন বাঙ্গালা আধুনিক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া রাজার গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ন সুগম করিয়াছেন। ব্রঃ তঃ-সম্পাদক।

(১) "এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হওয়া অধ্যাস কহেন"।—বেদান্তগ্রন্থ, ২২ পৃষ্ঠা।

প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ হইয়া এবং পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারবশতঃ অনেক সুবোধ লোকে এরূপ কল্পনায় মগ্ন আছেন। তাঁহাদের এই ভ্রম দূরীকরণ মানসে আমি বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ যথাসাধ্য বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করিলাম। ইহাতে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিচারে, জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বরই উপাস্য, অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময়, এইরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয়।"

এখানে ব্রহ্মোপাসনার দুইটী সোপান কথিত হইতেছে, এবং যদিও ঈশ্বর ও ব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শক্তি ও স্বরূপ ভেদে উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। শক্ত্যধিষ্ঠিত ব্রহ্মই ঈশ্বর, এই ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা প্রভৃতি রূপে উপাসনা করা ব্রহ্মোপাসনার প্রথম সোপান, এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে সমাধিস্থ হইয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখা ব্রহ্মোপাসনার দ্বিতীয় সোপান। সকলেই প্রথমে সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন নহেন। যাঁহারা প্রথমে সমাধি বিষয়ে অক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে প্রথমে উপাসনাই কর্ত্তব্য।

অতঃপর রাজা ব্রহ্মোপাসনা-বিরোধী নিম্নলিখিত চারিটী আপত্তি এই রূপে খণ্ডন করিয়াছেন :—

"১ম আপত্তি। এই যে ব্রহ্ম, যাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বল, তিনি বাক্য মনের অগোচর, সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব। এই নিমিত্ত রূপগুণ-বিশিষ্ট কোন বস্তুকে জগতের কর্ত্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে উপাসনা নির্ব্বাহ হয় না।

"উত্তর। কোন ব্যক্তি বাল্যকালে শত্রুগ্রস্ত এবং দেশান্তরিত হইয়া যদি আপন পিতার নিরূপণ কিছু না জানে, তবে সে যুবা হইয়া যে কোন বস্তু সম্মুখে পাইবে তাহাকে পিতারূপে গ্রহণ করিবে এমত নহে, বরং সেই ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময় যিনি জন্মদাতা তাঁহার শ্রেয় হউক এরূপ প্রার্থনা করিবেক। সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় না হইলেও জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তারূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে হয়, কোন নশ্বর নামরূপে তাঁহার কল্পনা করা যাইতে পারে না। চন্দ্র সূর্য্যাদি যে সকল বস্তু আমরা

সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাদেরও যথার্থস্বরূপ জানিতে পারি না, সুতরাং অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের স্বরূপ কিরূপে জানিব? কিন্তু জগতের রচনা কৌশল ও নিয়মাদি দৃষ্টে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব নিশ্চিত হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আর, একটু মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারা যায় নানা প্রকার রচনাবিশিষ্ট এই আশ্চর্য্য জগতের কর্ত্তা অবশ্য ইহা হইতে ব্যাপক এবং শক্তিমান্, সুতরাং ইহার অংশ কোন বস্তু কখনও ইহার কর্ত্তা হইতে পারে না।"

"২য় আপত্তি। পিতা, পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ কর্ত্তব্য নহে।

"উত্তর। সর্ব্বদা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করা পশুজাতির ধর্ম্ম। সদসৎ বিচারের অধিকারী মানব ক্রিয়ার দোষ গুণ বিচার না করিয়া স্ববর্গে করেন এই প্রমাণে, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে না। এই মত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে প্রচলিত থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ মত এ পর্য্যন্ত হইত না। বিশেষতঃ দেখা যায় একজন বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শাক্ত হইতেছেন, ও অপর একজন শাক্তকুলে জন্মিয়া বৈষ্ণব হইতেছেন, আর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের পর হইতে স্নান, দান, ব্রতোপবাস প্রভৃতি যাবতীয় পরমার্থ কর্ম্ম পূর্ব্বমত হইতে ভিন্ন প্রকারে হইতেছে এবং ব্রাহ্মণের যবনাদির দাসত্ব করা, এবং যবনের শাস্ত্র পাঠ করা ও যবনকে শাস্ত্র পাঠ করান, যাহা পূর্ব্বে কখনও প্রচলিত ছিল না, তাহা এখন অনায়াসে হইতেছে। সুতরাং স্ববর্গের উপাসনা ও ব্যবহারের বিরোধী বলিয়া উত্তম পারমার্থিক পথ কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নহে।"

প্রাগুক্ত দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন ব্রহ্মোপাসকের সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় বলিয়া তাঁহার ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, দুর্গন্ধি ও সুগন্ধি এবং অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান লোপ পায় এই মনে করিয়া সচরাচর লোকে যে আপত্তি করিয়া থাকেন, সেই আপত্তি রাজা নিম্নে এইরূপে খণ্ডন করিয়াছেন :—

"তৃতীয় আপত্তি। ব্রহ্মোপাসনা করিলে লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, দুর্গন্ধি ও সুগন্ধি এবং অগ্নি ও জলের পৃথক্ জ্ঞান থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা গৃহস্থ লোকের অকর্ত্তব্য।

"উত্তর। যাঁহারা এরূপ বলিয়া থাকেন তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করেন, নারদ, জনক, সনৎকুমারাদি ও শুক, বশিষ্ঠ, ব্যাস, কপিল প্রভৃতি সকলে ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, অথচ তাঁহারা অগ্নিকে অগ্নি ও জলকে জলরূপে ব্যবহার করিতেন এবং রাজকার্য্য ও গার্হস্থ্য কর্ম্ম এবং শিষ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ যথা-যোগ্য করিতেন। তবে কিরূপে বিশ্বাস করা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি কিছুই জ্ঞান থাকে না ?

"বিশেষতঃ ঈশ্বরের উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান থাকে আর ব্রহ্মোপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান লোপ পায়, এরূপ বিশ্বাস যে লোকের জন্মিতে পারে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি বল, সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান করিলে ভেদ আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেন থাকিবে ? তাহার উত্তর এই যে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির দ্বারা চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম্ম এবং পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য ও পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য অবশ্য পালন করিতে হইবে, যেহেতু ব্রহ্ম এ সকল নিয়মের কর্ত্তা। দশ জন ভ্রমবিশিষ্ট লোকের মধ্যে একজন অভ্রান্ত লোককে কালক্ষেপ করিতে হইলে, ভ্রান্ত লোকগণের অভিপ্রায়ে দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ তাহাকে লৌকিক আচরণ করিতে হয়।"

"চতুর্থ আপত্তি। পুরাণ তন্ত্রাদিতে নানা প্রকার সাকার উপাসনার বিধি আছে, সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য।"

"উত্তর। পুরাণ তন্ত্রাদিতে যেমন সাকার উপাসনার বিধি আছে, সেইরূপ উহার জ্ঞান প্রকরণে ইহাও কথিত হইয়াছে যে এ সমস্ত ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা করিয়া যে রূপের উপাসনা করা যায়, মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইলে, সেই রূপ বিনষ্ট হয় এবং হস্তের নির্ম্মিত রূপ হস্তাদির দ্বারা কালে কালে নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং নামরূপবিশিষ্ট কোন নশ্বর বস্তু উপাস্য হইতে পারে না, একমাত্র ব্রহ্মই উপাস্য। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, পুরাণ তন্ত্রাদিতে যে সাকার উপাসনার বর্ণনা রহিয়াছে তাহা দুর্ব্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের জন্য। যাহারা বেদান্ত-প্রতিপাদিত পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপের কল্পনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন, না হয় অপর কাহাকেও ঈশ্বর মানিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিরূপে ঐ সকল

বস্তুর পূজাদি করিয়া থাকেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ঐ সকল বস্তুকে তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিতে পারেন না, কারণ উহারা নশ্বর ও প্রায় তাঁহাদের হস্তনির্ম্মিত অথবা বশীভূত। যে বস্তু নশ্বর ও কৃত্রিম তাহার ঈশ্বরত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়? আর ঐ সকল বস্তুকে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বলিতেও সাহসী হইবেন না। কারণ যিনি ঈশ্বর তিনি অপরিমিত ও অতীন্দ্রিয়, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পরিমিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি বল, ব্রহ্ম সর্ব্বময়, অতএব ঐ সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হয়, সুতরাং ঐ সকল বস্তুর উপাসনা কর্ত্তব্য, তাহার উত্তর এই যে, যদি ব্রহ্ম সর্ব্বময় হন, তবে বিশেষ বিশেষ রূপের উপাসনার তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে যদি বল, যে রূপেতে ঈশ্বরের অধিক আবির্ভাব, তাহার উপাসনা করা যায়, তাহার উত্তর এই, যে ন্যূনাধিক্য ও হ্রাস বৃদ্ধিদ্বারা পরিমিত হইল, সে ঈশ্বর নামের যোগ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর কোন স্থানে অধিক আর কোন স্থানে অল্প আছেন এরূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই সকল রূপে আবির্ভাবের কোন অলৌকিক আধিক্য দেখা যায় না।”

তৎপরে বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অপ্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য কেহ কেহ সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, বেদান্তগ্রন্থের “অনুষ্ঠানে” রাজা সেই সকল আপত্তির উত্তর প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

“১ম আপত্তি। বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে ও শুনাতে পাপ আছে, এবং শূদ্রের এই ভাষা শুনিলে পাতক হয়।

“উত্তর। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, জৈমিনি-সূত্র, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রদিগকে পাঠ করান, তখন ভাষাতে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন কি না, আর ছাত্রেরা সেই ব্যাখ্যা শুনেন কি না, এবং মহাভারত, যাহাকে পঞ্চম বেদ ও সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায়, তাহার শ্লোক সকল শূদ্রগণের নিকট পাঠ করিয়া তাহার অর্থ তাহাদিগকে বুঝান কি না, এবং শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রের নিকট ঐ সকল শ্লোক উচ্চারণ করেন কি না। যদি তাঁহারা সর্ব্বদা এরূপ করিয়া থাকেন, তবে বেদান্তের এই বিবরণ ভাষায় প্রকাশ করাতে কি দোষ আছে?

"২য় আপত্তি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি রাজপ্রাপ্তির ন্যায়। যেমন দ্বারীর উপাসনা ব্যতীত রাজপ্রাপ্তি হয় না, সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্ট পদার্থের উপাসনা ব্যতীত ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না।

"উত্তর। যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তির জন্য দ্বারীর উপাসনা করে, সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না। কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি, কারণ রূপগুণবিশিষ্ট পদার্থকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজা অপেক্ষা রাজার দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ, সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু এখানে তাহার অন্যথা দেখা যায়। কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, আর যাহাকে তাঁহার দ্বারী বল, তাহা মনের কল্পিত অথবা হস্তের নির্ম্মিত, উহা কখন দূরস্থ, কখন নিকটস্থ, কখন উহার স্থিতি আছে, কখন নাই। সুতরাং এমত বস্তুকে কিরূপে অন্তর্যামী ও সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে অধিক নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন বলা যাইতে পারে? তৃতীয়তঃ চৈতন্যাদি-রহিত বস্তু কিরূপে এইরূপ মহৎ সহায়তা বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইতে পারে?

"তৃতীয় আপত্তি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পৃথিবীর সকল লোকের যে মত তাহা পরিত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির মত কে গ্রাহ্য করে? আর পূর্ব্বে কি কোন পণ্ডিত ছিলেন না কিংবা এখনও সংসারে কি অন্য কোন পণ্ডিত নাই যিনি এই মত জানেন এবং উপদেশ করেন?

"উত্তর। প্রথমতঃ, এ কাল পর্য্যন্ত আমরা পৃথিবীর যে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছি, এই ভারতবর্ষ তাহার বিংশতি অংশের এক অংশও নহে। এই ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের অধিক স্থানে লোকে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং এই ভারতবর্ষেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদায় এবং নানক, দাদূ ও শিবনারায়ণী প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ কি গৃহস্থ কি বিরক্ত অনেকে কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। তবে এই ব্রহ্মোপাসনার মত কিরূপে সমস্ত পৃথিবীর বহির্ভূত হইল? আর পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা কেহ যদি এই মতকে না জানিতেন এবং ইহার উপদেশ না করিতেন, তাহা হইলে ভগবান্ বেদব্যাস কি করিয়া এই সকল সূত্র (১) লোকের উপ-

(১) বেদান্ত-সূত্র।

কারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং কি করিয়া বাদরি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এইরূপ ব্রহ্মোপদেশপূর্ণ প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন, এবং আধুনিকদের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা রহিয়াছেন।”

অতঃপর রাজা এই বলিয়া “অনুষ্ঠানের” উপসংহার করিয়াছেন:—“আমাদিগের উচিত যে সর্ব্বথা শাস্ত্র এবং বুদ্ধি এতদুভয়-নির্দ্ধারিত পথের অনুসরণ করি এবং তাহা অবলম্বন করিয়া ইহলোক ও পরলোকে কৃতার্থ হই।”

তৎপরে মূল গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে তিনি উহার একটা সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল:—

“বেদের শ্রুতি সকলের মধ্যে স্থানে স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, এক শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আর এক শ্রুতিতে আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে এবং এক শ্রুতিতে ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ ও অন্য শ্রুতিতে সূর্য্য কিম্বা বায়ুর উপাসনার উপদেশ রহিয়াছে। এই জন্য পরম কারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস ৫৫৮টী সূত্র-ঘটিত বেদান্ত-শাস্ত্রদ্বারা সকল শ্রুতির সমন্বয় অর্থাৎ উহার অর্থ ও তাৎপর্য্যের ঐক্য করিয়াছেন এবং বিশেষ বিবরণদ্বারা কেবল ব্রহ্ম সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এবং ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের দ্বারা উক্ত শাস্ত্রকে লোকশিক্ষার সুগম করিয়াছেন। এই বেদান্তশাস্ত্রের উদ্দেশ্য মোক্ষ এবং ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিশ্ব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। সুতরাং এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এবং এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোলোকচন্দ্র দাস।

৩। মহাত্মা কেশবচন্দ্র ও বেদান্ত-ধর্ম্ম।

(উক্ত মহাত্মার বিগত জন্মোৎসবে তত্ত্ববিদ্যা-সভায় পঠিত।)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন তাহার পূর্ব্বে "বেদান্তধর্ম্ম-বর্জ্জন" রূপ ব্রাহ্মসমাজালোড়নকারী একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সহিত বেদান্তধর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে বেদান্তাশ্রিত হিন্দুসমাজের লোকদ্বারা পুষ্ট ব্রাহ্মসমাজে কেন এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইল এবং এই ঘটনার পূর্ব্বেই বা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বেদান্তের কি সম্বন্ধ ছিল, পরেই বা কি সম্বন্ধ রহিল, তাহা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং বর্ত্তমান বিষয় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনকই হইবে। সেই জন্য আমি এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অদ্য সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করিব।

রাজর্ষি রামমোহন ব্রাহ্মসমাজকে বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এদেশীয় চিরন্তন প্রথানুসারে তিনি বেদান্তকে অবলম্বন করিয়াই একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং বিরোধীদের কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বেদান্তানুযায়ী ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি এক পদও বিচলিত হন নাই।

তৎপরে যখন স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সমাজের আচার্য্য ছিলেন, তখনও সম্পূর্ণরূপে রামমোহন-প্রবর্ত্তিত পথেই ব্রাহ্মসমাজ বিচরণ করিতেছিলেন। কাশী হইতে চারি জন ব্রাহ্মণের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত এই রূপ ভাবেই কার্য্য চলিতেছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম 'বেদান্ত-প্রতিপাদিত সত্য ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইত। এই সময়ে "Vedantic Doctrines Vindicated" প্রচলিত করিয়াই ব্রাহ্মসমাজ স্বীয় ধর্ম্মমত বহিরাক্রমণ হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোধ হয় বেদান্ত এ সময়ে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়াই গৃহীত হইত, তাহার কারণ ইহা নহে যে বেদান্ত অভ্রান্ত শাস্ত্র, সুতরাং ইহাতে ভুল নাই, কিন্তু কারণ এই যে, বেদান্তে যে ভুল আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন এমন লোক ছিলেন না, সুতরাং ভ্রান্ততা ও অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও প্রশ্নই উঠে নাই। বেদান্ত অপ্রতিহত ভাবে ব্রাহ্মসমাজের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া

আসিতেছিলেন। বেদান্তের অভ্রান্ততা অজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, জ্ঞানের উপরে নহে। কেননা মহর্ষিপ্রেরিত চারি জন ব্রাহ্মণ কাশী হইতে প্রত্যাগত হইয়া যখন বেদের অনেক ভ্রম দেখাইয়া দিলেন, তখনই অবিলম্বে বেদান্ত-বর্জ্জন রূপ অভিনয় হইল। ইহাতে বেদান্ত-ভ্রান্তিই অপনীত হইল, বেদান্তধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল না। বেদান্ত-প্রতিপাদিত সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে আখ্যাত হইল। ব্রহ্ম বেদান্তেরই উপাস্য, সুতরাং বেদান্ত-প্রভাব দূর হইল না, হইতেও পারে না। "ব্রহ্ম" শব্দের সঙ্গে বেদান্তের এমনি অচ্ছেদ্য যোগ, যে একটীকে গ্রহণ করিয়া অন্যটীকে পরিত্যাগ করা অসম্ভব। এদেশীয় শাক্ত বৈষ্ণবেরাও বেদান্ত-বর্জ্জন করেন না। তাঁহারা করিলেও করিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের উপাস্যের সঙ্গে বেদান্তের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এদেশের ব্রহ্মবাদীদের সেরূপ করা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অসম্ভব। তবে এরূপ ঘটনা ঘটিল কেন? আমার উত্তর এই যে, এখানে "কাণা ছেলের পদ্মলোচন নাম" রাখা হইয়াছে। কেননা, বেদান্তের ভুল ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিতে যাইয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে যাহাতে বেদান্তই পরিত্যক্ত হইল বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, এবং প্রকৃত পক্ষে তাহা হয়ও নাই। বেদান্তের প্রভাব চিরকালই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহার প্রমাণ। প্রধানাচার্য্য মহর্ষি যে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন—যে গ্রন্থকে তিনি ঈশ্বরানুপ্রাণিত গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন—তাহা প্রধানতঃ বেদান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত শ্রুতি বেদান্তদর্শনের সম্বল, তাহাই আবার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের ব্যাখ্যানের ভিত্তি। বিশেষতঃ মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন,—বৈদান্তিক সাধন-প্রণালী যোগবৃক্ষের অত্যুৎকৃষ্ট ফল। আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহার প্রমাণ স্বরূপ কেশবচন্দ্রকেই সাক্ষী মানিতেছি। তিনি তাঁহার "Brahma Somaj Vindicated" নামক বক্তৃতায় বলিয়াছেন।

"Though the Vedas were no longer regarded as the basis of Brahmoism, and their errors and absurdities were abjured, the good things in the superstructure were retained and continue to this day; and the Brahmo Dharma book of the present

day contains the truths of the Vedanta with natural reason for their basis". (P. 43)

যাহা হউক, এই ঘটনার পরে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এখন আমরা দেখিব কেশবচন্দ্রের জীবনে বেদান্তধর্ম্ম কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বেদান্তের উপর কেশবচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার প্রথম জীবনে যখন খৃষ্টান মিশনারিরা একেশ্বরবাদীদিগকে শুষ্ক নীতিবাদী বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি বৈদান্তিক ঋষিদিগকেই তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ রূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন। বেদান্ত ও বৈদান্তিক ঋষিদিগের প্রতি তিনি সর্ব্বদাই গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন, এ দেশীয় ব্রহ্মবাদকেই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মবাদ মনে করিতেন, এবং যে ঋষিদিগের নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল ও যাঁহাদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা এই অমূল্য ধন লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদাই মস্তক অবনত করিতেন ও কৃতজ্ঞতা দেখাইতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার "Our Faith and our Experiences" নামক বক্তৃতা হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। বাঙ্গালা প্রবন্ধে ইংরেজী লেখা উদ্ধৃত করা অসুবিধাজনক হইলেও আমরা সে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিতেছি না। যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি সমগ্র বক্তৃতাটী পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন। আমরা অতি সামান্যই উদ্ধৃত করিতে পারিব। তিনি বলিতেছেন :—

"India sang the glory of the Eternal Spirit in the remotest period of history. Long has our nation been familiar with the Param Atma, the Supreme Spirit, and the light wherewith thousands of cultivated Brahmins recognise Him and adore Him throughout India is all their own, drawn from their own Scriptures and their own sages. If you search the ancient Scriptures of the Hindus, you will find their most sublime and beautiful conceptions of the Great Spirit; you will meet with sparkling texts pointing to Him Unseen. In India,

more than in any other country, in the Hindu Scriptures more than in any other scriptures, have the attributes of their Spiritual Divinity been elaborately and minutely depicted."

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন যে প্রাচীন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, উহা শুষ্ক দার্শনিক মত মাত্র, ইহা জ্ঞানমার্গাবলম্বী-দিগের জ্ঞানচর্চ্চার একটী দার্শনিক উপকরণ, কিন্তু সাধকদিগের উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয় নহে, এবং সেরূপে সাধিতও হয় নাই। বৈদান্তিক ঋষিদিগের পক্ষসমর্থনার্থ এই শ্রেণীর লোকদিগের প্রতিবাদ করিয়াই যেন ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন :—

"Richer far than gold and silver is the doctrine of the Spirit-God they have bequeathed unto us as a heavenly legacy. Ye venerable rishis and devotees of ancient India ! at your holy feet modern India lays her humble tribute of gratitude for this priceless legacy. Gentlemen, was the God of our forefathers a mere metaphysical abstraction, a prolongation as it were into the outward universe of men's intellectual consciousnesss. Was their Deity nothing but thin air or a romantic fancy ? I emphatically say, no. It was the reality of Godhead that our ancestors sought and worshipped. In their prayers and addresses to the Deity, in their daily meditations and in their manifold spiritual exercises, we find neither fancy nor frenzy, neither abstract metaphysics nor lifeless theories, but a thrilling and direct intercourse with a burning Reality. They did not dream, but they saw. They imagined not, but they handled the Great Spirit. The Deity is represented both as father and mother of mankind. "ত্বং হি নঃ পিতা" &c. Let none then say that the ancient Hindus worshipped an abstract Deity.

এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা না বলিয়া আসল বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, যখন কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তখন এখানে বেদান্ত সম্বন্ধে একটী প্রতিক্রিয়া চলিতেছিল। সুতরাং প্রথমতঃ তিনি যে প্রত্যক্ষভাবে বেদান্তানুশীলনের দ্বারা পরিচালিত হন নাই তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মহর্ষির প্রভাবেই হউক অথবা জাতীয় ধর্ম্মভাবের প্রভাবেই হউক, অজ্ঞাতসারে বেদান্তধর্ম্ম তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রথমে যাহা অন্তঃসলিলবাহিনী স্রোতস্বতীরূপে তাঁহাকে পরিচালিত করিতেছিল, আমরা দেখিতে পাইব পরে তাহা উৎসাকারে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় নদীরূপে তাহা দেশকে ভাসাইবার সময় পায় নাই।

যাহা হউক, আমরা এ কথা বলিতে চাই না যে, কেশবচন্দ্র বেদান্ত-দর্শনালোচনা করিয়া বেদান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ বেদান্ত-দর্শনালোচনা করেন নাই। তিনি দার্শনিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন। এ দেশে দার্শনিক ও সাধক বিভিন্ন পদার্থ নহে *। যাহা হউক, কেশবচন্দ্র বেদান্তের দেশে জন্মিয়াছিলেন, বেদান্ত-রক্ত তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছিল, সুতরাং তিনি সাধনার দ্বারাই বেদান্তমার্গে উপনীত হইয়াছিলেন। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না, গভীর যোগভক্তি-পরায়ণ হিন্দু সাধকের পক্ষে বৈদান্তিক অদ্বৈত ভাবে উপনীত না হওয়া একরূপ অসম্ভব। সেই জন্যই কেশবচন্দ্রের উপর বেদান্তধর্ম্ম এত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বে তিনি

---

* যতগুলি দার্শনিক মত আছে তত্তদনুযায়ী ততগুলি সাধনপ্রণালী বর্ত্তমান। দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে এমন এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাঁহারা সাধনকে দর্শন হইতে পৃথক করিতে চাহেন, যাঁহারা জ্ঞানালোচনার কষ্ট স্বীকার না করিয়াও উচ্চ সাধনাকাঙ্ক্ষী। আবার অন্য দিকে আর এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা দর্শনকে সাধন হইতে পৃথক করেন, দর্শনালোচনাতীত কোনও সাধনার আবশ্যকতা দেখেন না। ইঁহারা আরাধনা, ধ্যান প্রভৃতি হইতে আপনাদিগকে বিমুখ করিয়াছেন। এই উভয় শ্রেণীর লোকই একদেশদর্শী, এবং উভয়েই প্রাচীন আর্য্য ঋষি-প্রবর্ত্তিত সনাতন প্রথার বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন।

ইহা বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, পরে তাহা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্যই "বেদান্তে প্রত্যাবর্ত্তন" ঘোষিত হইয়াছিল। সে সকল পরে বলা যাইবে, এখন তিনি কিরূপ বৈদান্তিক ছিলেন তাহাই নির্ণয় করা যাক্। এ কার্য্যে তাঁহার গ্রন্থাবলীই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বেদান্তধর্ম্মের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে যাইয়া আমরা বেদান্তধর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিব, প্রথম, দর্শনের দিক, দ্বিতীয়, সাধনের দিক।

(ক) দর্শনের দিক তিন ভাগে বিভক্ত—

(১) ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ,

(২) " " জীবের সম্বন্ধ, ও

(৩) বৈদান্তিক অবতারবাদ

(খ) সাধনের দিক—যোগ বৈদান্তিক সাধন, ধ্যান তাহার উপায়।

এই সকল সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বেদান্তধর্ম্মের এমন সাদৃশ্য যে, তাঁহাকে বৈদান্তিক ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। প্রথমতঃ ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধের বিষয় দেখা যাক্। বেদান্ত বলেন ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, তিনিই একমাত্র সত্তা, আর সকল তাঁহার প্রকাশ। তিনিই আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। তাঁহারই শক্তি ও জ্ঞান সর্ব্বত্রই প্রকাশিত। তিনিই জগৎরূপে প্রতিভাত, তিনি সর্ব্বরূপী। আমরা সংক্ষেপে জগৎ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কেশবচন্দ্র নানা আকারে, নানা ভাষায়, নানা স্থানে অসংখ্য বার এই কথা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে পাঠ করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা এই বিষয়ে তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব না। যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি "God-vision in the Nineteenth Century" নামক বক্তৃতা ও "Yoga : Subjective and Objective" নামক পুস্তিকা পাঠ করুন, তাহা হইলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থেও এইরূপ উক্তি যথেষ্ট রহিয়াছে। যোগদৃষ্টিতে যে সমুদয় বস্তু ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা তিনি স্বীয় উজ্জ্বল ভাষায় এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন :—

"তাহার পর যখন সময় হইবে, তখন সাকারে নিরাকার দেখিতে হইবে। তুমি মুখ ফিরাও নাই। যেমন দৃষ্টান্ত দিলাম পৃথিবী গোল। তুমি সংসার ছাড়িয়া ভিতরে গেলে, তার পর চলিতে চলিতে সংসারে আসিলে। যে ভিতর দিয়া না গিয়াছে সে দেখে সাকারে সাকার, আর যে নিরাকারের ভিতর দিয়া আসিল সে জড়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাব দেখে,...চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সেই জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না, বজ্রাঘাতে সেই শক্তির শক্তি, আপনার শরীরে সেই আত্মা স্থাপিত, শরীরের ভিতরে সেই পরমাত্মা, চক্ষুর ভিতরে তিনি চক্ষু, কাণের ভিতরে তিনি কাণ, প্রাণের ভিতরে তিনি প্রাণ। যখন ভিতরে যোগ করিয়া বাহিরে আসিলে তখন ধর জড়, কিন্তু ধরিতেছ নিরাকার। শুন্‌ছ, দেখ্‌ছ জড়, কিন্তু তাহা নহে, নিরাকার। মায়াবাদীর মতের এখানে অর্থ। এ সব ছাড়া যে যোগী সে নিকৃষ্ট যোগী"। অন্যত্র—"এরা সাকারে সাকার দেখে, তিনি (যোগী) সাকারে নিরাকার দেখেন। তাঁহার চক্ষে সকলই ব্রহ্মময়, আকাশময় ব্রহ্ম, জ্যোতির ভিতরে ব্রহ্ম। পুনশ্চ অভ্যাসেতে এ সকল এমন সহজ হইয়া যায় যে, যোগী যখন নিরাকার জগৎ হইতে বাহিরে আসেন, তখন তিনি সংসারের ভিতর যে ঈশ্বর বাস করেন, বাহ্য তাবৎ পদার্থে কেবল তাঁহাকেই দর্শন করেন"। "ভিতরে সাধন করিয়া যখন বাহিরে আসিবে, তখন যে ফুল হাতে লইবে, যে জল স্পর্শ করিবে, প্রত্যেক জড়বস্তু সেই নিরাকার অন্তরাত্মাকে দেখাইয়া দিবে"। "যোগী বাহিরের সমুদায় পদার্থ ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মকে দর্শন করেন"। "যোগী সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে দেখেন যিনি আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য এ সকল করিয়াছিলেন। যোগী যাহাকে দেখেন তাহারই ভিতর ঈশ্বরকে দেখেন। সংসারীর পক্ষে সংসারের নানা প্রকার কার্য্য নিকৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যোগীর পক্ষে সমুদায়ই ব্রহ্মের ব্যাপার। সমুদয় ঈশ্বরের হস্তরচিত, সকল স্থান ব্রহ্মের সত্তায় পূর্ণ"। (ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, ৫১-৫২ ও ৬১,৬২, ৬৩ পৃঃ)। "অধিক সাধন করি নাই; চক্ষু খুলিয়া সাধন করিলাম। তাকাইলাম চারিদিকে, দেখিলাম প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর বাস করিতেছেন।" "জলের ভিতরে ব্রহ্ম; পর্ব্বতের মধ্যে পাহাড়ে ব্রহ্ম। জল দেখিলাম, স্পষ্ট ব্রহ্ম ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন, দেখিতে পাই। ফুলের পাপড়ির মধ্যে ব্রহ্ম চুপ করিয়া বসিয়া

আছেন। ফুলে ফলে ব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঝোপের দিকে যাই তাকাইলাম, গা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলাম আমার দিকে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, আমাকে ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম, আবার বলিলেন "আয় কাছে আয়"। খুব নিকটস্থ হইলাম, বলিলাম ব্রহ্ম পাইয়াছি। যোগ হইল। যোগ কি? অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে প্রতিবস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎ সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শন লাভ। কাঠ আর কাঠ মনে হইবে না, আকাশ আর আকাশ থাকিবে না। আকাশে চিদাকাশ দেখা যাইবে। সর্ব্বত্র এক জ্ঞান ঝক্ ঝক্ করিতেছে, সর্ব্বত্র এক শক্তি টন্ টন্ করিতেছে—এই অনুভব হইবে।" (জীবন বেদ, ৯০-৯১ পৃঃ।)

এখন আমরা জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিব। বেদান্তের মতে আত্মা অখণ্ড চিৎ বস্তু। একই আত্মা সর্ব্ব ঘটে বিরাজিত। এই আত্মা উপাধিবিশিষ্ট হইলেই জীবরূপে প্রতিভাত হন। মূলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোনও পার্থক্য নাই। মোহ বশতঃই জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, এই মোহ কাটিলেই সে ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্ব বুঝিতে পারে। যোগচক্ষু খুলিয়া গেলে জীব আর আপনাকে খুঁজিয়া পায় না, আপনার সকলই ব্রহ্মের দ্বারা অধিকৃত হয়। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, "ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক। দুই থাকিব কেন?" (জীবন বেদ, ৮৮) "ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইতে না পারিলে মানব জন্মের সফলতা হইবে না।" (ঐ, ৮৯) জীবশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি যে ভিন্ন নহে তাহা তিনি স্বীয় কবিত্বপূর্ণ ভাষায় এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন;—"যে শক্তি আকাশের চন্দ্র সূর্য্যকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই শক্তিই আমাদের বাহুতে বাহুবল, চক্ষে দৃষ্টিশক্তি, কর্ণে শ্রবণশক্তি। তুমি অবিশ্বাসী হইয়া মনে কর এ সমুদয় তোমার শক্তি, তুমি মনে কর তোমার বলে তুমি ধন ধান্য উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা নিজ বলে নিজ চেষ্টায় আপনার পুষ্টিসাধন কর। শক্তিকল্পনা পরিহার কর। তুমি কি এক মিনিট আপনাকে রক্ষা করিতে পার? তোমার নিজের একটীও মূলশক্তি নাই। যে সৃজনী শক্তি তোমাকে সৃজন করিয়াছে, তাহাই তোমার সংরক্ষণী শক্তি।

সেই আদ্যাশক্তি, সেই অনন্ত কালের মহাশক্তি ভিন্ন তুমি এক মুহূর্ত্ত কাল বাঁচিতে পার না। যে শক্তিতে তুমি বাঁচিয়া আছ, তুমি চলিতেছ, বলিতেছ, চিন্তা করিতেছ, ধর্ম্ম সাধন করিতেছ, সে শক্তি সামান্য নহে, ইহার ভিতর স্বর্গীয় শক্তি রহিয়াছে। ইহা অদ্যকার শক্তি নহে। অনন্ত কালের শক্তি, অনন্ত কালের ঘনীভূত শক্তি। তিনি শক্তিরূপে তোমার শারীরিক ও মানসিক তাবৎ শক্তির মধ্যে বাস করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মকে আর দূর ভাবিও না। অপরের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়া কে কোথায় সুখী হইয়াছে? ছাড় পরকে, ভাব আপনাকে। তোমার অত্যন্ত নিকটস্থ আত্মীয়, আপনার সহোদরের ভিতরেও ঈশ্বরকে দেখিতে বলিতেছি না, একবারে তোমার দেহ মনের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতে বলিতেছি। তোমার নিজের জীবনের মধ্যে তোমার হরিকে দেখাইয়া দিতেছি। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ং ঈশ্বর তোমার শরীর মনের মধ্যে শক্তি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন, যদি শক্তিমূর্ত্তি, কালীমূর্ত্তির পূজা করিবে, প্রজ্ঞাবলে হৃদয় কপাট উন্মুক্ত কর এবং আপনার জীবনী শক্তি মধ্যে তাহাকে দর্শন কর। সেই শক্তির অন্তর্ধানে তোমার শরীরের নিপাত। মহাশক্তির তিরো-ভাবে জীবের নিশ্চিত প্রলয়। সেই শক্তি ভিন্ন কিছুই জন্মে না, কিছুই স্থিতি করিতে পারে না।" (সেবকের নিবেদন, ১ম ও ২য় খণ্ড, ৪১, ৪২, ৪৩ পৃঃ।)

জীবাত্মা পরমাত্মার একত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন;—"যাহাকে জীবাত্মা বলি, তাহাকে পরমাত্মা বলি। বলপূর্ব্বক বলিতেছি, কেহ পৃথক্ করিতে পারে না।" "জীবব্রহ্ম একত্র বাস। নরের সাধ্য নাই যে জীবাত্মা পর-মাত্মাকে ভেদ করে।" "যোগ শাস্ত্র মিথ্যা হইবে যদি বিযুক্ত করিতে পার। আমি এই সভ্যতার সময়ে বলি, যে বলিল জীবাত্মা আছে, সেই বলিল পরমাত্মা আছে। এই জন্য নাস্তিকতা অসম্ভব।" "এক বস্তু, যাহাকে তুমি মনুষ্য বলিতেছ তাহারই মধ্যে ঈশ্বর এমনি ভাবে রহিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না ঐ দিকে হরি, এই দিকে আমি। কোন্‌টী আমি কোন্‌টী তিনি চিনিতে পারে কে? যোগানন্দে ডুবিয়া গিয়া এরূপ হয়।" "মনুষ্য স্বতন্ত্র করে না যেন তাহা, যাহা ঈশ্বর একত্র করিয়াছেন"। পুনরায় বেদান্তের ভাষাতেই বলিতেছেন, "ভিন্ন ভিন্ন ঘটে ব্রহ্ম অধিবাস করেন।

ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মপুণ্য, ব্রহ্মানন্দ। তুমি নূতন মানুষ। নরহরির প্রকাণ্ড যোগ। সেই যে লৌহ সুবর্ণের যোগ দেখিয়াছি, এখন লৌহ কোথায়? উপাধি কেবল লৌহ, ভিতরে কেবল সোণা। এখন তোমার কথা তোমার কথা, যখন এই যোগের অবস্থায় যাইবে তখন দেখিবে সমস্ত ব্রহ্মের। আকার তোমার, নিরাকার জ্ঞান পদার্থ ঈশ্বরের।" "পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতরে। লৌহ সোণা এক।" "জীবাত্মা পরমাত্মা আর স্বতন্ত্র করা যায় না, দুইয়ের মধ্যে রেখা দেখা যায় না।" "যে বলে জীব ব্রহ্ম ভিন্ন, তুমি জানিবে, সে বিয়োগে আছে। নাস্তিক বিয়োগ, সেখানে এক হয় না"। (ব্র, গী, দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ৮৯, ৯১, ৯২, এবং ১১২, ১১৩, ও ১১৪ পৃঃ)।

"যোগীর পক্ষে একটা উপাসনার অবস্থা, একটা পৃথিবীর ব্যাপার, তাহা নহে; সকলই ব্রহ্মস্থ ব্যাপার। বাহিরে ব্রহ্ম ভিতরে ব্রহ্ম।" সুতরাং এরূপ ব্রহ্মস্থ যোগীর পক্ষে পাপ পুণ্য কিছুই থাকে না। তাই কেশবচন্দ্র বলিতেছেন;—"আর কি আমার পাপ হইতে পারে? ব্রহ্ম কি পাপ করিতে পারেন? তুমি বেড়াইতেছ? পরীক্ষা কর, হে ভাবী যোগি, আমি আর নাই। ইচ্ছা নাই বলিবার, ব্রহ্ম শক্তি তোমার ঘট পূর্ণ করিয়াছে।"

আমরা যত দূর আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখা যাইবে যে কেশবচন্দ্র ঘোরতর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী। কিন্তু তিনি কখনও আপনাকে অদ্বৈতবাদী বলেন নাই। বরং সর্ব্বদাই 'অদ্বৈতবাদ' কথাটীকে ঘৃণার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং বৈদান্তিক ভাষা প্রায়ই ব্যবহার করিতেন না। এরূপ করা স্বাভাবিক। বেদান্ত ধর্ম্ম এদেশে স্থানে স্থানে যেরূপ বিকৃত দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া লোকে ইহার যেরূপ অপব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে প্রকৃত ধার্ম্মিকের পক্ষে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভয় পাওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তথাপি তিনি যেরূপে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে মূলতঃ অদ্বৈতবাদ এবং লোকে উহাকে অদ্বৈতবাদ বলিয়াই গ্রহণ করিবে তাহা বুঝিতে আর তাঁহার বাকি ছিল না। কেন না তিনি বলিয়াছেন;—

"এমন হয়ত অনেক আছেন, যাঁহারা বলেন, জলে আগুনে কেমন

করিয়া ব্রহ্মকে দেখিব? এ যে অদ্বৈতবাদ হ'ল। ব্রহ্মকে ইয়ার ভাবিয়া হাফেজের ন্যায় কি, 'হে ব্রহ্ম এত কাছে রহিয়াছ, ফুলের ভিতরে রহিয়াছ, বুকের ভিতরে রহিয়াছ', এরূপ কথা বলা যায়? প্রত্যক্ষ দেখা হইয়াছে। এখন আমি আছি কি না, এ বিষয়ে পাঁচ জনের সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসে সন্দেহ হইতে পারে না। আমার সঙ্গে ঈশ্বর এখন একত্র গাঁথা রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে দেখ নাই। আর প্রমাণ দিতে হবে না। আমাকে দেখিলেই হইবে। এক পদার্থে দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে।" (জীবনবেদ, ৯৩, ৯৪ পৃঃ)।

আমরা এখন কিরূপে "এক পদার্থে দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে" তাহার আলোচনা করিব। বৈদান্তিক অবতারবাদের কথা বলিব। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি বেদান্তের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলতঃ এক। ব্রহ্ম উপাধিযুক্ত হইয়াই জীবরূপে প্রতিভাত হন। জীব মোহ বশতঃ আপ-আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে। ব্রহ্মই যখন জীবরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, তখন এক অর্থে মনুষ্য মাত্রই ব্রহ্মের অবতার। বৈদান্তিক অবতারবাদের আর একটী অর্থ আছে। জীব যখন জ্ঞানযোগে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বুঝিতে পারে এবং নিত্য এই ভাবে অবস্থিত থাকে, তখনই বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে অবতার বলেন। শঙ্কর প্রভৃতি বৈদান্তিকেরা এই অর্থেই অবতার মানিতেন। যে, যে পরিমাণে আদর্শের নিকটবর্ত্তী, সে সেই পরিমাণেই অবতার। রাজর্ষি রামমোহন তাঁহার দীপ ও আবরণের দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র এই ভাবেই প্রত্যেক মানবকে এবং বিশেষ ভাবে মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াছেন। একই চিদ্বস্তু ঘটে ঘটে বিরাজিত থাকিয়া জীবের জীবত্ব বিধান করিতেছে, ইহা জানিয়াই তিনি প্রত্যেক মানবকে ঈশ্বরের অবতার বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার এই বৈদান্তিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলেন। একমাত্র বেদান্ত দ্বারাই খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের জ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব। খৃষ্টধর্ম্মে অবতারবাদ প্রথমে বৈদান্তিকদিগের দ্বারাই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আমি নিওপ্লেতনিকদিগকে বৈদান্তিক বলিয়া

নির্দ্দেশ করিতেছি। কালে সেই মত কলুষিত হইলেও, এই বেদান্তের দেশে আসিয়া তাহা পূর্ব্বাকারেই গৃহীত হইল। আর্য্যজাতি কখনও অন্তের নিকট হইতে কোনও জিনিষ স্বীয় ভাবের দ্বারা পরিবর্ত্তিত না করিয়া গ্রহণ করে না, তাই কেশবচন্দ্র "India asks : Who is Christ ?" প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন আমি খৃষ্টকে জাতীয় ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিলাম। তিনি বৈদান্তিকের ন্যায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে খৃষ্ট যদি আপনাকে পিতার সহিত এক বলিয়া ঘোষণা না করিতেন, তবে তাঁহাকে আমি এত সম্মান করিতাম না। এই জন্যই তিনি যীশুকে যোগি-শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং তাঁহাতে হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণতা দেখিয়াছেন। ইহা বলা অনাবশ্যক যে কেশবচন্দ্র পৌরাণিক অবতার বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং পিতা পুত্রের এই একত্বে তিনি বৈদান্তিক অবতার তত্ত্বই দেখিয়াছিলেন এবং খৃষ্টানদিগকে পৌরাণিক অবতারবাদ পরিত্যাগ করিয়া এই বৈদান্তিক অবতারবাদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি তাঁহার গ্রন্থই নির্দ্দেশ করিতেছি,—(*Great Men*, P. 48, 49, 50. *India asks : Who is Christ ?* P. 286, 288, 290, 291. *That Marvellous Mystery : The Trinity*, P. 407, 408, 409-411, 412).

সাধন-প্রণালী সম্বন্ধেও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বেদান্তের খুব একত্ব দেখা যায়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান বিনাশ করিয়া জীবের ব্রহ্মের সহিত একত্বে অব-স্থিতিই বৈদান্তিক সাধন-প্রণালীর উদ্দেশ্য। যোগই বৈদান্তিক সাধন। এই ভ্রান্ত "আমিকে",—জীবের এই অহঙ্কারকে—দূর করিতে না পারিলে এই যোগ সাধিত হয় না। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই আমি-কে দূর করিয়া পরমাত্মাদ্বারা সে স্থান পূর্ণ করিতে হইবে। যখন 'আমি'র স্থানে পরমাত্মা অধিষ্ঠিত হইবেন তখনই যোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। কেশব-চন্দ্র পূর্ণমাত্রায় এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষকে ধ্যানভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সকলকে ধ্যানপ্রিয় হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন,—"যথার্থ বৌদ্ধজীবন ধারণ কর, সমস্ত নির্ব্বাণ কর,

কিছুই যেন মনেতে না থাকে। শেষে আপনি থাকিবে, তাহাকেও হাত ধরিয়া বিদায় করিয়া দিবে"। "যদি 'ঈশ্বর আছেন' যোগের এই কথা সিদ্ধান্ত করিতে চাও, তবে 'আমি নাই' ইহা সিদ্ধান্ত কর। জীবাত্মার বিয়োগ, পরমাত্মার আবির্ভাব"। "আমি রূপ মূল কাট। সমুদায় পাপের মূল 'আমি' যদি থাকে, এই অহং আগুন ফোঁশ ফোঁশ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অতএব মূল কাটিয়া ফেল"। "উদাসীন হইয়া সন্ন্যাস অস্ত্রে এই অহংকে খণ্ড খণ্ড কর। সমুদয় সামগ্রী এবং সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ কর, বিবস্ত্র শূন্য অহং রহিল, এবার এইটীকে এক কোপে কাট, এই মূল অগ্নি নির্ব্বাণ কর"। (ব্রঃ গীঃ—১০৬-১০৮)।

আমরা বাহুল্য ভয়ে কেবল মাত্র বাঙ্গালাই উদ্ধৃত করিলাম। যোগ সম্বন্ধে তাঁহার মত তাঁহার ইংরাজী "যোগ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে অতি বিষদ ভাবে ব্যাখ্যাত আছে। আমরা সকলকে সেই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমরা কেশবচন্দ্রের সহিত বেদান্তের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাঁহাকে বৈদান্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। যদিও স্কচ্ দার্শনিক Reid ও Hamiltonএর প্রভাব তাঁহার মধ্যে সময়ে সময় দেখা যায়, তথাপি কেহই বেদান্ত-প্রভাবকে ম্লান করিতে পারেন নাই। তাহা অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইয়া পরজীবনে প্রবল নদীতে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি আপনাকে আর বৈদান্তিক বলিয়া ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বেদান্তে পুনরাবর্ত্তন বিঘোষিত হইল। হিন্দু ব্রাহ্মের পক্ষে এরূপ ঘোষণা প্রয়োজন হইবার কারণ ছিল। যদিও কার্য্যতঃ বেদান্তের প্রভাব ব্রাহ্ম সমাজ হইতে চলিয়া যায় নাই, কিন্তু বাক্যে বেদান্ত বর্জ্জিত হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দও এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "The Brahmo Samaj bade farewell to Vedantism." সেই জন্যই ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ "Our Return to the Vedanta" ঘোষণা করা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ১৮৮৫ খৃঃ ৭ই জুন তারিখের *Liberal* পত্রে "Our Return to the Vedanta" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল:—"We need not say very much upon our return to the Vedanta. This is a known fact. The foundation of Brahmoism

was laid upon the Upanishads. Although we have advanced, the foundation remains the same".

কেশবচন্দ্রের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই এই লেখা বাহির হয়, তাহাতে, এবং লেখাটীর ভাবেই বুঝা যায়, এই ঘোষণা তাঁহার অনুমোদিত। যাহা হউক, শেষ জীবনে ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্মের অতি উচ্চতম আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সমাজে আদর্শ প্রতিফলিত করিবার পূর্ব্বেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। অকালে দীপ নির্ব্বাপিত হইল। অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই যে, তাঁহার এই পরিণত জীবনের ধর্ম্মাভিজ্ঞতার প্রভাব হইতে ব্রাহ্মসমাজ আপনিই আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। অথবা বিধাতার বিধান অনতিক্রমণীয়।

এখন কেহ বলিতে পারেন, যিনি বেদ, বাইবেল, কোরাণ, একত্রিত করিয়াছিলেন, সকল বিধান সমানরূপে মান্য করিতেন, তাঁহাকে বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে না। আমি কেশবচন্দ্রকে 'কেবল বৈদান্তিক' বলি না। কেন না, আমি নিও-প্লেতনিকদিগকেও বৈদান্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কেশবচন্দ্র আরও কিছু ছিলেন। আমি বলি তিনি বৈদান্তিক হিন্দু ছিলেন। এ বিষয়ে আর বাক্ বিতণ্ডা না করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মানন্দকেই আমি সাক্ষীরূপে উপনীত করিতেছি। আপনারা তাঁহার মুখে শুনিয়াই আমার কথার বিচার করুন্।

"আমরা আর্য্য ঋষিদিগের নিকট ঋণী। আর্য্য রক্ত যতদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকিবে ততদিন আমরা প্রাণপণে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিব এবং বিজাতীয় হইব না। আমি এ কথা বলিতেছি না যে স্বজাতির পক্ষপাতী হইয়া আমরা স্বজাতীয় ভ্রম কুসংস্কার, অধর্ম্ম দুর্নীতি পোষণ করিব। আমি কেবল এই বলিতেছি যে, যখন আমাদের নববিধান বৃক্ষ ভারত ভূমিতে রোপিত, তখন এই বৃক্ষ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষীয় থাকিবে এবং হিন্দু বৃক্ষ বলিয়া পরিচিত হইবে; জাতির বিকার কদাপি হইবে না। পশ্চিম দেশ এবং ইংলণ্ড আমাদিগকে প্রকৃত সভ্যতা ভূষণে ভূষিত করিবে, কিন্তু আমাদিগের হিন্দু স্বভাব ও চরিত্রের উপরে অন্য কোন জাতির অধিকার নাই। আর্য্যজাতি-সম্ভূত এই বিধান বৃক্ষে জাতীয় মিষ্টতার সঞ্চার হইতেছে। আমরা যদি এই

মিষ্টতা গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমরা হিন্দু জাতি ও বিধান উভয়েরই বিরোধী হইব। সমুদয় জাতি হইতে আমরা ঈশ্বরের সত্য গ্রহণ করিব, প্রত্যেক জাতির সাধু ভক্তদিগকে আমরা ভক্তি করিব, কিন্তু আমরা কদাচ বিজাতীয় হইব না। কোথায় মুষা, কোথায় সক্রেতিন্, কোথায় ঈশা, কোথায় মহম্মদ, ইহারা বিদেশী হইয়াও আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আমাদের নব বিধান য়িহুদী, গ্রীক্ কিম্বা মহম্মদীয় বিধান হইতে পারে না, ইহা মূলেতে হিন্দু বিধান থাকিবে। আমাদের নব বিধান এক দিকে যেমন সার্ব্বভৌমিক, আর এক দিকে তেমনই জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত। ইহা একদিকে সমুদয় সাধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক গোত্র, এক জাতি, এক বর্ণ হইয়া গিয়াছে, আবার ইহা আপনার বিশেষ বিশেষ ভাব প্রচার করিবার জন্য আপনার জাতীয় স্বভাব, জাতীয় লক্ষণ রক্ষা করিতেছে। ইহা দেশীয় বিদেশীয় সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে স্কন্ধে রাখিয়া তাঁহাদের যশঃকীর্ত্তন করে, কিন্তু ইহার বক্ষে হিন্দু শোণিত প্রবাহিত। অপর ধর্ম্মের বিজাতীয় বেশ পরিধান করাইয়া ঈশ্বর এই নব বিধানকে প্রেরণ করেন নাই, ইহাকে তিনি জাতীয় বেশে সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। ঈশ্বরদত্ত এই বেশ আমরা চির দিন রক্ষা করিব। আমরা ঈশা, মুষা, মহম্মদ সকলেরই প্রণত ভক্ত, কিন্তু জাতিতে আমরা চির দিন হিন্দু থাকিব। যিনি নব বিধানের ব্রাহ্ম, তিনিই প্রকৃত হিন্দু। ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুবিরোধী জাতিচ্যুত বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করা সঙ্গত নহে, সত্য নহে। বাস্তবিক ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত হিন্দু। ("সেবকের নিবেদন," প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ১১২ পৃঃ—'জাতীয় বিধান')

আমরা কেশবচন্দ্রকে হিন্দু বলিলাম এবং তাঁহারই কথার দ্বারা আমাদের মত সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম। আমরা তাঁহাকে বৈদান্তিক বলিয়াছি এবং বেদান্তের সঙ্গে তাঁহার মতের সৌসাদৃশ্য দেখাইয়াছি। এখন আর একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ব্রহ্মানন্দ বৈদান্তিক যোগী ছিলেন। যোগে ব্রহ্মৈকত্ব লাভ করিলে যোগীর কি অবস্থা হয় তাহা তিনি বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন ও জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বৈদান্তিক মহা বাক্যের সার্থকতা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

'সেবকের নিবেদনে' 'যোগী-অক্ষয় ও অপার' নামক উপদেশে তিনি বলিতেছেন:—"জীবাত্মা যখন যোগপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন আর তাহার অন্তজ্ঞান থাকে না, তাহার ক্ষুদ্রতাবোধ থাকে না। তখন সে অনন্তের সঙ্গে একাত্মা হইয়া আপনাকে আপনি অনন্ত মনে করে, তাহার আর স্বতন্ত্রতা ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি থাকে না। এই অসীমতা জীবের নহে, পরমাত্মার। জীব যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া পরমাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন সে এ অসীমতা বুঝিতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র নদী যতক্ষণ আপনার দুই দিকে তট দেখিতে দেখিতে চলিতেছিল, ততক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ জানিতেছিল; কিন্তু যখন অকূল সাগরে ঝাঁপ দিল, তখন অনন্ত সাগরে মগ্ন হইয়া আর আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতে পারিল না, সেইরূপে ক্ষুদ্র জীবাত্মা যতক্ষণ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়; কিন্তু যখনই সে অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে ডুবিয়া যায়, তখন আর আপনার ক্ষুদ্রত্ব দেখিতে পায় না। ক্ষুদ্র নদীর জল অসীম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে অনন্ত ও অকূল মনে করে; সেইরূপ ক্ষুদ্র জীব যোগবলে ভূমা মহান্ বিরাট্ ঈশ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে ব্রহ্মময় জ্ঞান করে"। ব্রহ্মানন্দ বৈদান্তিক যোগী ছিলেন, এখন বোধ হয় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। এই বৈদান্তিক যোগীর উপদেশ শুনিতে শুনিতে একটি প্রসিদ্ধ বেদান্ত-শ্রুতি স্বতঃই স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়। তাহা এই:—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৮।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যকৃত ভগবদ্‌গীতা-ভাষ্যের

বঙ্গানুবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক। আত্মা কি প্রকারে নিত্য, "দেহিনঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন? দেহ যাহার আছে তাহাকে দেহী বলে। সেই 'দেহীর' অর্থাৎ দেহবানের বা আত্মার যেমন এই বর্ত্তমান দেহে 'কৌমার' কুমার ভাব, বাল্যাবস্থা, 'যৌবন' যুবকের ভাব অর্থাৎ মধ্যমাবস্থা, 'জরা' অর্থাৎ বয়োহানি, জীর্ণাবস্থা, এই তিন প্রকার পরস্পর বিভিন্নাবস্থা দৃষ্ট হয়; তাহাদের মধ্যে প্রথমাবস্থার নাশে আত্মার নাশ এবং দ্বিতীয়াবস্থার উৎপত্তিতে আত্মার উৎপত্তি হয় না; তবে কি হয়? না— অবিক্রিয় আত্মারই যেমন দ্বিতীয়া তৃতীয়াবস্থা প্রাপ্তি দৃষ্ট হয়; সেই প্রকার অবিক্রিয় আত্মারই 'দেহান্তর প্রাপ্তি' অর্থাৎ এক দেহ হইতে অন্য দেহ প্রাপ্তি দৃষ্ট হয়। এই প্রকার হওয়াতে এই বিষয়ে অর্থাৎ আত্মবিষয়ে 'ধীর' অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি 'ন মুহ্যতি' মোহ প্রাপ্ত হন না।

১৪শ শ্লোক। আত্মা নিত্য, এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যদিও আত্মবিনাশ নিমিত্ত মোহ সম্ভব নহে, তথাপি শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ প্রাপ্তি-নিমিত্ত মোহ সংসারে দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুখবিয়োগ বশতঃ মোহ হয় এবং দুঃখ সংযোগাদি বশতঃ শোক হয়,—অর্জ্জুনের এরূপ বাক্য আশঙ্কা করিয়া "মাত্রাস্পর্শা" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন। 'মাত্রা' অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা শব্দাদি বিষয় সকল আমাদের জ্ঞানগোচর হয় সেই সকল চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়; শব্দাদি বিষয়ের সহিত মাত্রাদিগের 'স্পর্শ' অর্থাৎ সংযোগ; এই সংযোগ সমূহই 'শীতোষ্ণ সুখদুঃখদ',—অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ দান করে। অথবা স্পর্শ করা যায় যাহাদিগকে তাহারা স্পর্শ অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়। মাত্রা এবং স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ই শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ দান করে। শীত কখনও সুখ-কর, কখনও দুঃখকর, সেই প্রকার উষ্ণও অনিয়তস্বরূপ, অর্থাৎ চঞ্চল— (কখনও সুখকর কখনও দুঃখকর)। পক্ষান্তরে সুখ দুঃখ নিয়তরূপ অর্থাৎ

অচঞ্চল, স্থিরস্বভাব, যেহেতু ইহাদের ব্যতিক্রম হয় না। সেই জন্য ইহারা শীতোষ্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যে হেতু মাত্রাস্পর্শাদি 'আগমাপায়ী' অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল, সেই হেতু অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীলতা প্রযুক্ত তাহারা অনিত্য। অতএব সেই সমুদয় শীতোষ্ণাদি সহন করিবে; তাহাদের জন্য হর্ষবিষাদ করিবে না।

১৫শ শ্লোক। যিনি শীতোষ্ণাদি সহন করেন তাঁহার কি হয়, "যং হি" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। যে ব্যক্তির পক্ষে সুখ দুঃখ সমান—যিনি 'সমদুঃখসুখ' অর্থাৎ সুখ দুঃখের প্রাপ্তিতে হর্ষ বিষাদরহিত, 'ধীর' অর্থাৎ ধীমান, যাহাকে এই সমুদয় শীতোষ্ণাদি ব্যথা দিতে পারে না, অর্থাৎ বিচলিত করিতে পারে না, কারণ তিনি নিত্য আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন; সেই নিত্যানিত্যস্বরূপ-দর্শননিষ্ঠ, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ব্যক্তি 'অমৃতত্ব', অমৃত ভাব, অর্থাৎ মোক্ষ লাভে 'কল্পিত' অর্থাৎ সমর্থ হন।

১৬শ শ্লোক। এই হেতুও শোক-মোহাদি না করিয়া শীতোষ্ণাদি সহন করা উচিত, যেহেতু "নাসত ইতি" ইত্যাদি। 'অসৎ' অর্থাৎ অবিদ্যমান সকারণ শীতোষ্ণাদির ভাব, ভবন, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই; প্রমাণের দ্বারা নিরূপ্যমাণ শীতোষ্ণাদি সকারণ বস্তু কখনও সৎ হইতে পারে না। সেই বস্তু বিকার; বিকারের পরিবর্ত্তন হয়। যে প্রকার চক্ষুদ্বারা নিরূপ্যমাণ ঘটাদি সংস্থান মৃত্তিকা ব্যতীত উপলব্ধ না হওয়া বশতঃ অসৎ, সেই প্রকার সমুদয় বিকার তাহাদের কারণ ব্যতীত উপলব্ধ না হওয়াতে অসৎ। মৃদাদি কারণযুক্ত ঘটাদি কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং বিনাশের পরে উপলব্ধ না হওয়া বশতঃ এবং তাহাদের কারণও তৎকারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধ না হওয়া বশতঃ তাহারা অসৎ। যদি বল যে তাহাদের অসত্তাতে সর্ব্বাভাব প্রসঙ্গ হয়, তদুত্তরে বলি—না (তাহা হইতে পারে না), যেহেতু সকল স্থলেই দুই প্রকার বুদ্ধি উপলব্ধি হয়, সদ্‌বুদ্ধি ও অসদ্‌বুদ্ধি। যে বিষয় সম্বন্ধীয় বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা সৎ, আর যদ্বিষয়া বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হয়, তাহা অসৎ। বুদ্ধি প্রণালীর মধ্যে সৎ অসৎ এই দুই বিভাগ থাকাতে, সকল স্থলেই সকলে সামানাধিকরণ্যে নীলোৎপলের ন্যায়, দুই প্রকার বুদ্ধি উপলব্ধি করিয়া থাকে। ঘট আছে, পট আছে, হস্তী আছে, এই প্রকার সকল বিষয়েই। এই দুই

প্রকার বুদ্ধির মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সদ্‌বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হয় না। অতএব ব্যভিচার হেতু ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় অসৎ। কিন্তু অব্যভিচার হেতু সদ্‌বুদ্ধির বিষয় অসৎ নহে। যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইয়া গেলে, ঘটবুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হইলে, সদ্‌বুদ্ধিও পরিবর্ত্তিত হয়; তবে বলি—না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু পটাদিতেও সদ্‌বুদ্ধি দেখা যায়। সেই সদ্‌বুদ্ধি বিশেষণ-বিষয়া, সেই জন্য ইহার বিনাশ হয় না। যদি বল সদ্‌বুদ্ধির ন্যায় ঘটবুদ্ধিও ঘটান্তরে দেখা যায়, তবে বলি—না, যেহেতু পটাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। যদি বল যে ঘট নষ্ট হইলে সদ্‌বুদ্ধি অদৃষ্ট হয়, তবে বলি—না, তাহা হয় না, যেহেতু সে স্থলে বিশেষ্যের অভাব। যেহেতু সদ্‌বুদ্ধি বিশেষণবিষয়া, সেই জন্য বিশেষ্যের অভাবে বিশেষণেরও অপ্রমাণ হওয়াতে সদ্‌বুদ্ধি কোন্ বিষয়ের হইবে? যদি বল যে বিষয়ের অভাববশতঃ, ঘটাদি বিশেষ্যের অভাব হেতু, সদ্‌বুদ্ধির একাধিকরণত্বই যুক্তিযুক্ত হয়, তবে বলি—তাহা হইতে পারে না, যেহেতু মরীচিকাদিতে জলের অভাবেও 'এই জল সত্য' এরূপ সামানাধিকরণ্য দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা বলি সকারণ, অসৎ দেহাদি দ্বন্দ্বের 'ভাব' অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই। সেই প্রকার সর্ব্বত্র অব্যভিচার হেতু সৎ আত্মারও 'অভাব' অর্থাৎ অবিদ্যমানতা নাই। এই প্রকারে ইহাদের অর্থাৎ উল্লিখিত আত্মা ও অনাত্মার, সৎ ও অসতের 'অন্ত' অর্থাৎ নির্ণয়—যাহা সৎ তাহা সৎই, যাহা অসৎ তাহা অসৎই—এইরূপে তত্ত্বদর্শিগণকর্ত্তৃক 'দৃষ্ট' অর্থাৎ উপলব্ধ হইয়াছে। 'তৎ' সর্ব্বনাম, আর সর্ব্ব ব্রহ্ম, তাহার নাম 'তৎ'; তাঁহার ভাব 'তত্ত্ব' অর্থাৎ ব্রহ্মের যাথাত্ম্য; তাহা দেখা যাহাদের অভ্যাস, তাঁহারা তত্ত্বদর্শী, সেই তত্ত্বদর্শিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে—তুমি তত্ত্বদর্শিগণের দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, শোক মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, 'শীতোষ্ণাদি নিয়তানিয়তরূপ দ্বন্দ্বসমূহ মিথ্যা বিকারমাত্র, মরীচিকাবৎ এই সমুদয় মিথ্যা প্রকাশ পাইতেছে', এই প্রকার মনে ধারণা করিয়া ইহাদিগকে সহ্য কর। (ক্রমশঃ)

রামমোহনরায়-চতুষ্পাঠ্যাঃ কশ্চিচ্ছাত্রস্য।

THEISTIC INSIGHT. *

I.

THEISM, wherever and whenever preached, has always been characterized, even in its popular forms, by one grand ideal—that of a direct knowledge of God and things divine, a knowledge not derived from prophets and scriptures, however great, but acquired by every individual thinker through the immediate contact of his knowing powers with divine realities. This ideal alone distinguishes Theism from all other religious systems, ancient and modern. We are, indeed, far from thinking that this ideal of a direct knowledge of God is, in its truest sense, realised in the lives of all professed Theists. In the case of comparatively unthinking and unspiritual persons professing to be Theists, a direct knowledge of God means little more than a number of beliefs imbibed from the theological atmosphere around them and entertained without any exercise of thought worth the name,—mere floating ideas come down perhaps from some Theistic preacher of eminence and commending themselves by their novelty, loftiness or attractiveness to busy minds which nevertheless have the instinct of religion in them. On the other hand, in men of a more or less purely speculative turn of mind, a direct knowledge of religious truth has come up to little more than a number of inferences concerning a Divine Architect, based on the marks of superhuman intelligence and goodness in Nature, and on the comfort and utility of religious faith and worship. The great superiority, however, of even these lower forms of Theism to systems based on external anthority,—on the authority of some shastra or prophet—lies in this, that while in the former the gates of real, saving knowledge of

* Contributed by the editor of the *Brahmatattva* to the *Indian Messenger*.

God—of deep insight into things divine,—are kept open, and the soul, as it progresses in spirituality, hankers more and more after such knowledge, and is blessed by more and more of it, the latter seem to shut the door effectively against such life-giving knowledge. They discourage all direct attempts to know God, and seek to keep the soul satisfied with superinduced beliefs and ideas. To them, direct attempts to know God and things divine are mere intellectual gymnastics, and systems of faith based on rational insight are mere 'philosophies.' When, under such a freezing system of spiritual servitude, the normal warmth of the soul is once repressed, its natural cravings for direct insight mercilessly starved, and its natural lights,—its God-given powers of acquiring religious truth—once discredited and put out, there is no knowing to what depths of blindness and torpitude it will not sink. Far more healthy and promising seems the condition of a soul which perhaps has at first very vague and crude notions of God and things divine, but which has nevertheless the faith, essential to all real spiritual progress, that God has given it the power of knowing him and will surely reveal himself to his spiritual sight if he only makes a good use of the powers with which he has been endowed.

The history of the gradual development of spiritual insight is not perhaps the same in all persons, and must vary according to natural endowments and external circumstances. But as people resemble, as well as differ from, one another, the experiences of one may, to a large extent, agree with those of another. The following sketch, therefore, of the transition from the religion of mere belief to that of insight may represent, to a certain extent, the actual experiences of many a Theist.

Faith in an omnipresent and ever-active God is wonderfully transformed and deepened by the clearing of the idea of 'force,' an idea which controls both popular and scientific

thought. The transformation, when it takes place really and completely, is nothing less than a transition from the religion of blind faith to that of insight. To him who believes the world to be led by innumerable unconscious forces, even though it be under the supervision of an all-seeing Being, the omnipresence and ceaseless activity of God has very little meaning. The apparently all-sufficing agency of material forces, even if it does not satisfy his spiritual instinct, cannot but constantly obscure his faith and present a practical difficulty to the realization of its full ideal. To think of all things which we ascribe to God and for which we thank him in our prayers, as constantly done for him by unconscious powers instead of by him immediately, cannot but have a repressing influence on faith and keep down the soul to a sort of practical materialism. Before this materialistic incubus is removed, faith cannot rise to vividness and life. This is done when the insight is gained, through processes which may vary in different individuals, that all activity is and must be conscious, and that something which, by its conception, is unconscious, cannot be credited with activity even in the smallest things. This insight into the spirituality of force was, it seems, more clear and vivid in primitive times, when men peopled the whole world with conscious divine powers, than in these days of scientific progress and precision of thought, when people see nothing but superstition in such a wholesale spiritualization of natural forces. Not that there is no superstitious error in such thinking, but, what is to be regretted is, that in giving up that error, men have also given up the truth that lay in it, and from believing in a number of embodied divine spirits directing the changes in Nature, have come to relegate these changes to what are no better than abstractions. Scientific thought, which might be expected to do better, has in this respect helped the obscuring of primitive insight and has led to that practical materialism in which even the

majority of reflective men are at present to be found. Happily, the teachings of a sound philosophy are now helping us in regaining the insight into the spirituality of force and thus realising, perhaps far more clearly and deeply than men of old, the ever-active presence of God in all departments of nature, —in the pulsations of our own hearts no less than in the movements of the heavenly bodies. We need not stop to describe the wonderful change which the clear and complete attainment of this insight, which is a gradual process rather than an event, affects in our spiritual life. But we must remember that, even when this experience is gained, we are still on the threshold of the religion of insight, and as yet very far from that complete spiritualization and unification of the world which is the goal of true religion.

The insight into the spirituality of force,—into the truth that all change is due to Will,—is the result of the deeper self-consciousness which growth in religion necessarily brings with it. Having seen what activity is within, having learnt the meaning of activity where alone it can be learnt, the soul necessarily sees an active Will without, and finds it impossible to relapse into that practical materialism which was its creed in its unspiritual condition. But if its growth is not impeded by untoward circumstances, it can never stop here. The same deeper self-consciousness that reveals to it the truth that all change is spiritually determined, must also reveal to it the cognate truth that all *existence* is spiritually determined,—that the reign of spirit is universal: it reigns both in the world of change and that of permanent existence. It is really the vision of all things in God and God in all things. In ordinary experience, unenlightened by spiritual insight, the world of things and the world of thought present themselves in an unresolvable distinction and separation; and even to ordinary religious minds, the bridging of the two,—any real unification of the two, seems to be the union of things diametrically

opposed, and any attempt to do so appears to be an impiety,—almost as much so as the materialistic attempt to merge spirit into matter. But the religious conciousness, at a certain stage of its growth, really effects this union, and establishes the universal supremacy of mind over matter, of thought over things. Having surrendered all activity to spirit, it cannot, when it goes a step further, stop short of surrendering all existence also to it. It is interesting to see how what seems something like the jealousy of the worldly spirit in us, struggles long and persistently against this gradual extension of the domain of spirit,—these encroachments, as they seem, upon what appear to belong properly to matter,—and strives to keep a charmed circle of existence which spirit may not claim for itself. There are whole systems of religion where these struggles and strivings of the worldly spirit have succeeded in arresting the growth of the religious consciousness,—where a compromise has been effected and the supremacy of the world divided, once for all, between God and matter. But such a compromise is impossible where the soul is healthy and vigorous. When once it attains to true self-consciousness—to a true vision of Thought, the Thought that is in it and makes it what it is, it sees that Thought is the very key to the world of existence,—its very light and life,—that every thing is for it and in it, and nothing without it and apart from it.

But here also, the true vision of the soul may be blurred by modes of thought habitual to ordinary worldly experience and we may stop short of the deepest, truest insight. The Thought which makes us what we are, and which enables us to see as we see, and which constitutes what we know, may be conceived in the ordinary individualistic fashion, and the highest, the universal Thought may seem to be beyond our thought, and an object of mere inferential knowledge or of mere blind instinct. Even when given its rightful supremacy over things, even when recognised as entering into the very